বাংলাদেশের নদীভিত্তিক উপন্যাস

এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
400537

মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নদীভিত্তিক উপন্যাস

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

গবেষক মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ
(নিবন্ধন সংখ্যা : ৬১/৯২-৯৩)

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর

400637

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

480637

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নদীভিত্তিক উপন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
৩০.১২.২০০২

প্রত্যয়ন-পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলা বিভাগের এম.ফিল. গবেষক মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ (নিবন্ধন সংখ্যা-৬১/৯২-৯৩) আমার তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের নদীভিত্তিক উপন্যাস' বিষয়ে এম.ফিল. উপাধির জন্যে গবেষণা সমাপ্ত করে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপিত করছে। সে তার নিজস্ব মেধা, অধ্যয়ন ও শ্রমে এই গবেষণাকর্ম সুসম্পন্ন করেছে। অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব রচনা এবং এর কোন অংশ মুদ্রিত হয় নি অথবা কোন উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কোন উপাধির জন্যে পেশ করা হয় নি।

মোহাম্মদ আবু জাফর ৩০/১২/০২

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
এবং
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বাংলাদেশের নদীভিত্তিক উপন্যাস' সম্পর্কিত গবেষণায় নিয়োজিত হয়ে আমি বুঝতে সক্ষম হই বাঙালী জাতির জীবনে নদীর প্রভাব কত গভীর। নদী তীরবর্তী মানুষ ও তাদের জীবন যুদ্ধের প্রতি আমার কৌতূহল সামান্য হলেও বাস্তব রূপ পেল বর্তমান অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে। এ জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফরের সর্বক্ষণিক মূলবান উপদেশ, নির্দেশ ও সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে কাজটি করা সম্ভব হতো না। এ জন্যে তাঁর কাছে আমি ঋণী। আমার গবেষণার প্রথম পর্বের অন্যতম শিক্ষক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক আমাকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে সহায়তা করেছেন। বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ: ড. সনজীদা খাতুন, ড. আনিসুজ্জামান, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড.আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ড. ওয়াকিল আহমদ, ড. সাঈদ-উর রহমান, ড. এস.এম. লুৎফর রহমান, জনাব আহমদ কবির, ড. সৈয়দ আকরম হোসেন, ড. রফিকুল্লাহ খান, ড. ভীস্মদেব চৌধুরী এবং ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বিভিন্ন সময় আমাকে সহায়তা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে করেছেন উৎসাহিত। এ জন্যে আমি তাঁদের সকলে প্রতি নিবেদন করি আমার গভীর শ্রদ্ধা। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু তালেব এবং বর্তমান কর্মচারীবৃন্দ : সর্বজনাব মোঃ আবদুল ওয়ারিস, মোঃ সাইদুর রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান এবং রীনা পারভীন আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। সে জন্যে তাঁরা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিউদ্‌দীন, কথা শিল্পী ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং নাট্যকার অধ্যাপক মমতাউদ্দিন আহমদ, তেজগাঁও কলেজের বাংলার প্রভাষক ড. গীতারানী কর্মকার এবং স্বরূপকাঠি শহীদ স্মৃতি কলেজের অধ্যক্ষ শাহ আলম হাওলাদার , অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইয়াসীন আলী ও মোহাম্মদ শাহ আলম বাহাদুর প্রমুখ বিভিন্ন সময় আমাকে যে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়েছেন সে জন্যে তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগার এবং মুহম্মদ আবদুল হাই স্মৃতি পাঠকক্ষ, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার এবং কেন্দ্রীয় গণ গ্রন্থগারের বইপত্র ব্যবহার করেছি। এ সব গ্রন্থাগারের যথাক্রমে সর্বজনাব রতন কুমার দাস, মরহুম আবুল খায়ের খোন্দকার এবং আমান উল্লাহ, সাঈদা

Dhaka University Institutional Repository

খানম এবং ফেরদৌসী বেগম, সুব্রত বড়ুয়া এবং আমিরুল মোমেনিন, মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান এবং মোহাম্মদ কচির উদ্দিন প্রমুখ আমাকে দান করেছেন অকুণ্ঠ সহায়তা। এ সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা কাজটি করার সময় নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুবর্গ: সর্বজনাব অরূপকুমার বড়ুয়া, নাসির আহমদ, আবু হেনা আব্দুল আউয়াল, রুহল গণি জ্যোতি, মজিদ মাহমুদ, আবুল কালাম আজাদ, গোলাম মুর্তুজা, আইরীন আনসারী রুবা, মনির জামান, হুমায়ুন কবির, মাহফিজুর রহমান ফাগুন, রিয়াজ আহমেদ, মীর আব্দুল আলীম, জাকারিয়া খান স্বপন এবং শাহনাজ জুয়েল প্রমুখের কাছ থেকে। এঁদের সবাইকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

অভিসন্দর্ভটির অক্ষরবিন্যাসক, কম্পিউটার চালক সর্বজনাব নজরুল ইসলাম, শেখ আকবর হোসেন, নুরুন নবী তানভীর এবং রেজোয়ান কামাল মিলনের আন্তরিক পরিশ্রম পাণ্ডুলিপিটির বর্তমান রূপ দানে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। প্রুফ সংশোধনে মোস্তফা সরোয়ার এবং অন্যান্য কাজে মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের সহায়তা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

আমার মা, ভাই বোন এবং মামা জনাব আব্দুল কুদ্দুস আকন ও ভগ্নিপতি আব্দুল লতিফ সাগর, চাচাতো ভাই মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বাদশা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের কাছ থেকে পেয়েছি অশেষ মমতা ও অনুপ্রেরণা। তাঁদের ঋণ অপ্রতিশোধ্য।

আমার এই গবেষণা শেষ হওয়ার আগে আমার পিতার মৃত্যু আমার জন্যে মর্মান্তিক বেদনা ও আক্ষেপের বিষয় হয়ে থাকবে।

'বাংলাদেশের নদীভিত্তিক উপন্যাস' নিয়ে কোন ব্যাপক গবেষণা আমার চোখে পড়ে নি। আমার অনুসন্ধিৎসার ফলে সৃষ্ট বর্তমান অভিসন্দর্ভটি গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের কৌতূহল কিছুটা মেটাতে পারলে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নদীভিত্তিক উপন্যাস

সূচীপত্র

ভূমিকা		৬
প্রথম অধ্যায়	বাংলাদেশের নদী এবং বিভিন্ন উপন্যাসে বিধৃত সাধারণ চিত্র	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	জীবনচিত্র ও শিল্পসাফল্য : পদ্মানদীর মাঝি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫
তৃতীয় অধ্যায়	জীবনচিত্র ও শিল্পসাফল্য : নদী ও নারী : হুমায়ুন কবির	৯৬
চতুর্থ অধ্যায়	জীবনচিত্র ও শিল্পসাফল্য : তিতাস একটি নদীর নাম : অদ্বৈত মল্লবর্মণ	১৪২
পঞ্চম অধ্যায়	উপসংহার	২১৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বাঙালীর জীবনে নদী একটি অপরিহার্য উপাদান। পেশা ও ব্যবসায়, যাতায়াত ব্যবস্থা ও দেশী-বিদেশী বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও রোগ-বালাই, শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে নদীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। হাজার হাজার বছর ধরে এ দেশের মানুষের নিত্য সঙ্গী এ দেশেরই নদনদী। নদীতীরে গড়ে উঠেছে মানব বসতি, গড়ে উঠেছে সভ্যতা। নিকট অতীতে পর্যন্ত, অপর্যাপ্ত রাস্তাঘাটের কারণে, নদীই ছিলো ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। অসংখ্য ধর্মীয় পীঠস্থান স্থাপিত হয় বিভিন্ন নদনদীর তীরেই। এ দেশের মানুষের ধর্মে ও কর্মে নদনদী সম্পৃক্ত থেকেছে অব্যাহত ভাবে। অন্য দিকে প্রায় প্রতি বছরই নদনদীগুলো প্লাবিত হয়ে যায় মারাত্মক বন্যায়। ফলে, নিহত ও আহত হয় অসংখ্য নরনারী ; ধ্বংস হয় অগণিত গবাদি পশু, বিনষ্ট হয় ফসল ও ধন সম্পদ, ঘরবাড়ি ও গাছপালা। বন্যা চলে গেলে ধেয়ে আসে রোগশোক, মহামারী। একই সঙ্গে প্রায় প্রতি বছরই আঘাত হানে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস। তার আক্রমনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় জনজীবন। কিন্তু বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস আবার জমিতে ফেলে যায় প্রচুর পলি মাটি, জমি করে উর্বর অকৃপণ হস্তে। তখন জমিতে সোনা ফলে যেন। তা দেখে কৃষকের মুখে ফোটে হাসি, আনন্দের অনাবিল হাসি। নদী তাই বাঙালীর জীবনে সুখেরও সঙ্গী, দুঃখের সঙ্গী।

বাঙালী জাতির দৈনন্দিন জীবন, সুখ-দুঃখ ও মন-মানসিকতার ওপর বাঙলার নদনদীর অব্যাহত প্রভাবের প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর। বিষয়টি রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক মনে হওয়ায় তাঁরই পরামর্শে আমি বাংলাদেশের তিনটি নদীভিত্তিক উপন্যাস নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করি। নানা পারিবারিক ও অন্যান্য কারণে মাঝে মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ায় অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে কিছুটা অনভিপ্রেত বিলম্ব ঘটেছে। তার পরও কাজটি যে শেষ করতে পারলাম এতে আমি অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করছি। বলা বাহুল্য, আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের ক্রমাগত তাগিদ ব্যতিরেকে এটি সম্ভব হতো না। এই সুযোগে আমি আবারও তাঁর প্রতি নিবেদন করি আমার অশেষ শ্রদ্ধা।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের নদনদী সম্পর্কিত কিছু তথ্য। একই সঙ্গে সেখানে উপস্থিত করা হয়েছে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, মঙ্গলকাব্য, ময়মনসিংহগীতিকা প্রভৃতিতে এবং প্যারীচাঁদ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখের উপন্যাসে অঙ্কিত নদনদী সম্পর্কিত চিত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র জীবনচিত্র ও শিল্পসাফল্য সম্পর্কিত আলোচনা ; অন্য দিকে হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী'র জীবনচিত্র ও শিল্পোত্তীর্ণতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। একই নিরিখে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। পঞ্চম অধ্যায়ে টানা হয়েছে সমগ্র আলোচনাটির একটি উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নদী এবং বিভিন্ন উপন্যাসে বিধৃত সাধারণ চিত্র

বাঙালী জাতি ও বাঙলার নদ নদী যেন একই সূত্রে গাঁথা। বাঙালীর জীবন ও জীবিকা, প্রকৃতি ও স্বভাব সব কিছুই যেন গড়ে উঠেছে বাঙলার প্রকৃতি ও নদ নদীর প্রভাবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলেও সমগ্র দেশটি আজও রয়ে গেছে প্রধানত নদীমাতৃক, কৃষিভিত্তিক। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও খরা প্রায় প্রতি বছরই আঘাত হানে সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। এর ফলে, প্রায় প্রতি বছরই পাল্টে যায় ভূমি ও মানুষের অবস্থা। নদী সিকস্তিতে আক্রান্ত হয় অসংখ্য পরিবার। আবার নতুন পলিতে জেগে ওঠা চরগুলোতে শুরু হয় জীবনের নব যাত্রা। যারা অব্যাহতভাবে শহরবাসী, তাদেরও খাদ্যের যোগান আসে নদী-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে, নদীর ভালো মন্দের সঙ্গে তাদের জীবনও সম্পৃক্ত। বস্তুত, বহু শতাব্দীর একটি বাস্তবতা এই যে, বাঙালী জাতির অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও পেশা বাংলাদেশের নদীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নদী তাদের জীবনে যেন এক নিয়ামক শক্তি। সঙ্গত কারণেই, বহু খ্যাতনামা বাঙালী লেখকের রচনায় বাংলাদেশের নদী এবং নদীভিত্তিক বাঙালী জাতির কথা ও অভিজ্ঞতা তাৎপর্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। একই সঙ্গে, সাধারণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের নানা চিত্র। যাঁরা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন এদেশের প্রকৃতি ও মানুষের অবস্থা ও ভূমিকা, তাঁরা সহজেই অনুধাবন করেছেন যে, বাংলাদেশের নদী ও মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল। তাঁদের এই অনুধাবনের উপস্থাপন ঘটেছে তাঁদের রচনাসমূহে। সে সবের মধ্য দিয়ে তাই বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি ও তাদের জীবনের নানা চিত্র ও পরিচয় অবলোকন করা সম্ভব।

বাংলাদেশের নদী-ভিত্তিক কয়েকটি বিশিষ্ট উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা অনুধাবনে বাংলাদেশের নদনদীর একটি পরিচয়, সংক্ষিপ্ত হলেও, জানা আবশ্যক বলে মনে করা যেতে পারে। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য নদ, নদী, শাখা নদী ও উপনদীর সংখ্যা আড়াইশ-রও বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলী, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী বাংলাদেশের প্রধান নদ নদী : অন্যান্য নদী এদের শাখানদী বা উপনদী।[১]

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

ব্রহ্মপুত্র : কৈলাস শৃঙ্গে উৎপন্ন হয়ে এই নদী আসাম উপত্যকায় প্রথমে ডিংহা এবং পরে ব্রহ্মপুত্র নামে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে বাঁক নিয়ে রংপুর জেলার সীমানা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এর পর এটি যমুনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত স্রোত প্রথমে পদ্মা নামে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে এবং পরে উক্ত ত্রিধারার মিলিত স্রোত মেঘনা নামে বঙ্গোসগারের পতিত হয়েছে। এর প্রধান উপনদীগুলো হচ্ছে তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, সুবর্ণশ্রী। শাখানদীর মধ্যে ধলেশ্বরী এবং প্রশাখা নদীর মধ্যে বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা উল্লেখযোগ্য। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও ঢাকার বিশাল অংশ নিয়ে যমুনার অববাহিকা গঠিত।

পদ্মা : হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে পদ্মার উৎপত্তি। গঙ্গোত্রী হিমবাহের দুটি ধারা, একটি ভাগীরথী ও অন্যটি অলকানন্দ। পদ্মার উপনদীর মধ্যে মহানন্দ ও পুনর্ভবা। পদ্মা শাখা নদীর মধ্যে ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, কুমার, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ এবং প্রশাখা নদীর মধ্যে মধুমতী, পশুর ও কপোতাক্ষ উল্লেখযোগ্য।

মেঘনা : এই নদী আসামের পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে এসে সিলেটের ভৈরব বাজারের কাছে পুরানো ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামেই বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মেঘনার প্রধান উপনদীর মধ্যে গোমেশ্বরী, কংশ, গোমতী এবং শাখা নদীর মধ্যে তিতাস ও ডাকাতিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

কর্ণফুলী : আসামের লুসাই পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে কর্ণফুলী পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছে। পরবর্তীতে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে চট্টগ্রাম জেলার ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ নদীর উপনদী কাসালং, মাইনী, চিংড়ী ও বানখিয়াং।

সাঙ্গু : মায়ানমার ও বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত আরাকান পাহাড় থেকে সাঙ্গু নদীর উৎপত্তি। এ নদী পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে পাহাড় শ্রেণীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে উত্তর পশ্চিমে অনেক দূর প্রবাহিত হবার পর বান্দারবানের কাছে দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রাম জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

মাতামহুরী : পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মায়ানমার সীমান্তে এ নদীর উৎপত্তি। পরবর্তীতে নদীটি পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে চিংড়ির কাছে চট্টগ্রামের সমতলে নেমে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে হুগলী নদী ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ-উপকূলীয় সুন্দরবন, বরিশাল, পটুয়াখালী, মাদারীপুর এবং নোয়াখালী, হাতিয়া ও সন্দীপ নিয়ে গড়ে ওঠা এলাকায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় নদীগুলো অবস্থিত। উপকূলবর্তী অঞ্চলের ছোট ছোট নদীর মধ্যে কালিন্দী, যমুনা, সিপসা, পুমর, শিলা, ভোলা, বিশখালী, বুড়িশ্বর, লোহানিয়া, তেতুঁলিয়া, শাহবাজপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। (মাগফারুল ইসলাম, বাংলাদেশের নদী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২২-৩০)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর অধিকাংশই ভারতসহ অন্যান্য দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের নদীগুলোর উৎস বাংলাদেশের বাইরে ; সবগুলো নদীই বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বাংলাদেশের নদ নদী প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের একটি বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

'বাঙলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাঙলার ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাঙলার প্রাণ ; ইহারাই বাঙলাকে গড়িয়াছে, বাঙলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদনদীগুলিই বাঙলার আশীবাদ ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধহয় বাঙলার অভিশাপও। এই সব নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের ব-দ্বীপের নিম্নভূমিগুলি গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে ; সেই হেতু বদ্বীপ-বঙ্গের ভূমি কোমল, নরম ও কমনীয় ; এবং পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্টভূমি (new alluvium)। এই কোমল, নরম ও নমনীয় ভূমি লইয়া বাঙলার নদ-নদীগুলি ঐতিহাসিক কালে কত খেলাই না খেলিয়াছে ; উদ্দাম প্রাণলীলায় কতবার যে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, নূতন খাত ছাড়িয়া আবার নূতনতর খাতে বর্ষা ও বন্যার বিপুল জলধারাকে দুরন্ত অশ্বের মতো, মত্ত ঐরাবতের মতো ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সহসা খাত পরিবর্তনে কত সুরম্য নগর, কত বাজার-বন্দর, কত বৃক্ষশ্যামল গ্রাম, শস্যশ্যামল প্রান্তর, কত মঠ ও মন্দির, মানুষের কত কীর্তি ধ্বংস করিয়াছে, আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কত দেশখণ্ডের চেহারা ও সুখ-সমৃদ্ধি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে তাহার হিসাবও ইতিহাস সর্বত্র রাখিতে পারে নাই। প্রকৃতির এই দুরন্ত লীলার সঙ্গে মানুষ সর্বদা আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, অনেক সময়ই হার মানিয়াছে ; তাহার উপর আবার দূরদৃষ্টিহীন মানুষের দুর্বুদ্ধি সাময়িক লোভ ও লাভের হিসাব বড় করিয়া দেখিতে গিয়া জল-নিকাশের এবং প্রবাহের এই সব স্বাভাবিক পথগুলির সঙ্গে যথেচ্ছচারের ত্রুটি করে নাই ; এখনও তাহার বিরাম নাই। তাহার ফলে এই সব নদনদী বন্যায় মহামারীতে দেশকে ক্ষণে ক্ষণে উজাড় করিয়া দিয়া, অথবা সুবিস্তৃত দেশখণ্ডকে শস্যহীন শ্মশানে পরিণত করিয়া মানুষের উপর প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করে নাই। প্রাচীনকালে এই নদনদীগুলির প্রবাহপথের এবং দুরন্ত প্রাণলীলার সঠিক এবং

Dhaka University Institutional Repository

সুস্পষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে উপস্থিত নাই ; পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক হইতে নদনদীগুলির ইতিহাস যতটা সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় নানা দেশী-বিদেশী বিবরণের এবং নক্‌শার সাহায্যে, প্রাচীন বাঙলা সম্বন্ধে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে নদনদীগুলির প্রবাহপথের যে চেহারা, তাহাদের যে আকৃতি-প্রকৃতি এখন আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধি-গোচর, প্রাচীন বাঙলায় সেই চেহারা, সেই আকৃতি-প্রকৃতি অনেকেরই ছিল না। অনেক পুরাতন পথ মরিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত খরতোয়া নদী সংকীর্ণা ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে ; অনেক নদী নূতন খাতে নূতনতর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাতন নামও হারাইয়া গিয়াছে, নদীও হারাইয়া গিয়াছে ; নূতন নদীর নূতন নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এইসব নদনদীর ইতিহাসই বাঙলার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মানুষ-সৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা ; মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মকর্ম সবকিছুর বিকাশ। বাঙলার শস্যসম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। উচ্ছলিত উচ্ছ্বসিত উদ্দাম বন্যায় মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙিয়া যায়, মানুষ গৃহহীন পশুহীন হয় ; আবার এই বন্যাই তাহার মাঠে মাঠে সোনা ফলায় পলি ছড়াইয়া : এই পলিই সোনার সারমাটি। বাঙালী তাই এই নদীগুলিকে ভয়ভক্তি যেমন করিয়াছে, ভালোও তেমনই বাসিয়াছে ; রাক্ষসী কীর্তিনাশা বলিয়া গাল যেমন দিয়াছে, তেমনই ভালোবাসিয়া নাম দিয়াছে ইছামতী, ময়ূরাক্ষী, কবতাক্ষ (কপোতাক্ষ), চূর্ণী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদর, অজয়, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, মেঘনা (মেঘনাদ বা মেঘানন্দ), সুরমা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র)। বস্তুত, বাঙলার, শুধু বাঙলারই বা কেন, ভারতবর্ষের নদীগুলির নাম কী সুন্দর অর্থ ও ব্যঞ্জনাময়।

বাঙলার এই নদীগুলি সমগ্র পূর্ব-ভারতের দায় ও দায়িত্ব বহন করে। উত্তর ভারতের প্রধানতম দুইটি নদীর—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের—বিপুল নদীজলধারা, পলিপ্রবাহ, এবং পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের বৃষ্টিপাতপ্রবাহ বহন করিয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবার দায়িত্ব বহন করিতে হয় বাঙলার কমনীয় মাটিকে। সেই মাটি সর্বত্র এই সুবিপুল জলপ্রবাহ বহন করিবার উপযুক্ত নয়। এই জলপ্রবাহ নূতন ভূমি যেমন গড়ে, মাঠে যেমন শস্য ফলায়, তেমনই ভূমি ভাঙেও, শস্য বিনাশও করে। বাঙালী ক্রোধভরে পদ্মাকে বলিয়াছে কীর্তিনাশা, পদ্মা বাঙালীর অনেক কীর্তিই নষ্ট করিয়াছে সত্য- করিবে না-ই বা কেন ?

Dhaka University Institutional Repository

> গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সুবিপুল জলধারা নিম্নতম প্রবাহে সে একা বহন করে, তাহাতে আসিয়া নামে প্রচুর বৃষ্টিপ্রবাহ, নিম্নভূমির সাগর প্রমাণ বিল-হাওরের অগাধ জলরাশি। দুর্দম মত্ততার অধিকার তাহার না থাকিলে থাকিবে কাহার? এবং, সেই মত্ততা নরম নমনীয় নূতন মাটির উপর! ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে। অথচ, এ মেঘনা-পদ্মাই তো আবার স্বর্ণশস্যের আকর ; এই পদ্মার দুই তীরেই তো বাঙলার ঘনতম মনুষ্য বসতি, সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যের লীলা। মানুষ যদি পদ্মা-মেঘনাকে বশে আনিতে না পারিয়া থাকে, সে যদি আপন দুর্বুদ্ধিবশে ইহাদের মত্ততাকে আরও নির্মম আরও দুরন্ত করিয়া থাকে, তবে সেই দোষ পদ্মা-মেঘনার নয়।[২]

বৃষ্টি-বন্যা-জোয়ার-ভাটার ও পলিমাটির দেশ এই বাংলাদেশের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়:

> 'বঙ্গ—যা বাঙ্গালা' দেশের নাম—শব্দটি মূলে ছিল চীন-তিব্বতী গোষ্ঠীর শব্দ। আর এই 'বঙ্গ' শব্দে 'অং' অংশের সাথে গঙ্গা, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ইত্যাদি নদীর নামের সম্বন্ধ ধরে তাঁরা অনুমান করেছেন যে শব্দটির মৌলিক অর্থ জলাভূমি।[৩]

এ তথ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে নদীর সম্পর্কটি স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তুলনায় বয়সে নবীন এই বাঙলা পলিমাটি দিয়ে গঠিত। নদী ও জলের আধিক্যের কারণেই বাঙালীরা অতীতে নৌশিল্প গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়। ব্যবসা প্রসারের ক্ষেত্রেও বাংলার নদী ও সমুদ্রের ছিলো এবং আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নদী ও খালবিলের প্রাচুর্যে পূর্ণ বাঙালীর জীবনকে নদী ছাড়া ভাবা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে :

> বাংলার জীবন রয়েছে তার নদীতে আর তার নদীর 'ব'- প্রদেশে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে উঠছে আর পড়ছে। জলের সঙ্গে স্থলের বিপ্লব ও পরিবর্তন তাই বাঙালী জীবনের একটি প্রধান সমস্যা।[৪]

ভৌগোলিক অবস্থা অনুসারে স্থলভাগের তুলনায় নদীবেষ্টিত বাংলাদেশের অনেকাংশই জলভাগ। ঐতিহাসিক কাল থেকেই বাঙলার নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছে বহু সংখ্যক জনপদ, শহর , বন্দর, নগর। নদীতীরেই আছে সোনালী ফসলের বিস্তৃত মাঠ, নদীতেই রয়েছে বাঙালীর অন্যতম খাদ্য মাছ। তবু এত উপকারী নদী কখনও কখনও মানুষের জীবনে চরম দুর্ভোগ এনেছে, নদীর ভাঙনে মানুষ হয়েছে সর্বস্বান্ত। কিন্তু সব হারিয়েও আবার নতুন উদ্দীপনায় বাঙালীরা

২. নীহারঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, কলকাতা, ১৪০০, পৃ. ৭২-৭৩
৩. অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১
৪. প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, বাঙালী, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

গড়েছে ঘরবাড়ি, জাগিয়েছে জীবনের নতুন জোয়ার। এমনি করে বহু শতাব্দী ধরে প্রায় নিত্য ভাঙা-গড়ার মধ্যেই নদী তীরবর্তী জনগণ অব্যাহত রেখেছে নিজেদের অস্তিত্ব।

বাঙালী-মানস বাংলাদেশের নদী ও প্রকৃতি প্রভাবিত। বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ার যেন বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে বাঙালীর আর্দ্র, ভাবপ্রবণ, উচ্ছ্বাসময় ও আবেগসর্বস্ব স্বভাবে । সে কারণে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রয়েছে সেই প্রকৃতির ব্যাপক উপস্থাপনা। নদী ও প্রকৃতির সঙ্গে বাঙালী জীবনের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য :

> পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতোধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই। কূলে কূলে জল ভরে উঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্যময়ী, আর সেই জীবন ও মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্রকৃতির সে ঔদার্য্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলবার অবসর কই ? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্য্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে , কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি।[৫]

প্রকৃত প্রস্তাবে নদীর ভাঙা-গড়া বাঙালীর জীবনে মিশে আছে নিবিড় হয়ে। নদীর ও প্রকৃতির প্রভাব বাঙালীর বহির্লোক থেকে মনোলোক পর্যন্ত প্রসারিত। বাঙালীর সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যে তার স্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় :

> বাংলার জলবায়ুর আর্দ্রতা ও ভূপ্রকৃতির নমনীয়তা বাঙালীর দৈহিক গঠনে কমনীয়তা এনে দিয়েছে, চরিত্রেও কোমলতা দান করেছে। অন্তর্জীবনের আবেগ ও বহির্জীবনের নমনীয়তাকে যখন শিল্পে রূপায়িত করেছে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাতে নিস্তরঙ্গ মন্ময়তার সুর ধ্বনিত হয়েছে।[৬]

নদীর প্রভাব মানুষের জীবনে সুগভীর। সে প্রভাবের কারণেই প্রাচীন কাল থেকে, দেখা যায়, ভাষার সমৃদ্ধি ঘটেছে নদী তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে। বাংলা ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই যে বাংলা ভাষার বিকাশের পথ সুগম হয়েছে তার উল্লেখ মেলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে :

> ... the dialects of Bengali grew up in Bengal. From Anga, the

৫. হুমায়ুন কবির, বাঙলার কাব্য, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২

৬. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

> Aryan speech (Magadhi Prakrit and Apabhransa) seems to have passed down to Radha, and crossed over the Ganges to Pundra-Vardhana or Verendra, where the Aryan Language might also have come overland from Mithila. Along the Ganges, it spread from Anga, Pundra and Radha to Vanga.[৭]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাহিত্যের প্রতিটি শাখায়, কি কবিতায়, কি গল্পে, কি উপন্যাসে সর্বত্রই রয়েছে নদীর উপস্থিতি। সেখানে মেলে নদীর ভাঙা-গাড়ার কথা, নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন ও সংগ্রামের নানা চিত্র। কখনও তার মনোহরী রূপ, কখনও তার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ তাণ্ডবলীলা–সবই বাঙালী লেখকদের চিত্ত হরণ করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে নানা অনিবার্য কারণে নদীর দ্বারা যেমনই প্রভাবিত হয়েছে বাঙালী জাতি, তেমনই প্রভাবিত হয়েছে বাংলা সাহিত্য। আকর্ষণীয় কাহিনীর জন্যে রামায়ণ-মহাভারত জনপ্রিয় হয়েছে। তবে তা বেশি সম্পৃক্ত হয়েছে বাঙালীর নৈতিকতা ও ধর্মান্বেষার সঙ্গে। কিন্তু চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য-সহ মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যসমূহে বাঙলার প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি স্পষ্টভাবেই অনুভব করা যায়। অবশ্য, সমগ্র মধ্যযুগে প্রকৃতিকে কমবেশী ব্যবহার করা হয়েছে ধর্মের অনুষঙ্গী হিসেবে, তারই অনুকূল উপাদান রূপে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথম সচেতন ভাবে প্রকৃতিকে ধর্মের নিগড় থেকে মুক্ত করলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে বাঙলার প্রকৃতি যে প্রভাব বিস্তার অব্যাহত রেখেছে বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে, তার মূলে অনেকাংশে ক্রিয়াশীল থেকেছে বাঙলার নদনদী, হাওর ও প্রান্তর এবং বর্ষা ঋতু। অন্যান্য মৌলিক উপাদানের সঙ্গে নদীর প্রসঙ্গ বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। বাংলাদেশের সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নদনদী, বিল-হাওর, দীঘি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অসংখ্য বিয়োগান্ত কাহিনী ও উপকথা সৃষ্টি হয়েছে এগুলোকে ঘিরে। বস্তুত, এ কারণেই বাঙলার লোকসাহিত্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নদনদীর অনুকূল এবং একই সঙ্গে সর্বনাশা রূপ বাঙালীদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে নানা ভাবে । নদীর সঙ্গে তাদের জীবন যেন বাঁধা পড়ে আছে আজন্ম। এ কারণেই হুমায়ুন কবির বলেছেন :

> পল্লীগীতিকার পরিমণ্ডল, নিসর্গ ও মানুষ একান্তভাবে বাঙলাদেশের, পৃথিবীর অন্য কোন দেশ বা কালের সঙ্গে তাকে ভুল করা অসম্ভব। পূর্ব বাঙলার নদীর নিরন্তর

---

৭. Suniti Kumar Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta, 3rd edition, 1975, P. 137.

Dhaka University Institutional Repository

> ভাঙা-গড়া, চরের মানুষের প্রাণপণ বলে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই এবং নিষ্ঠুর নিয়তির নির্মম রঙ্গমঞ্চে মানুষের ভালোবাসায় যে করুণা ও মাধুর্য—এ সমস্ত পল্লীগীতিকার প্রতিছত্রে তার নিদর্শন প্রাণবন্ত।[৮]

নদীতে নৌকা বেয়ে লোকজন পারাপারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ইতিহাস অনেক পুরনো। এ দেশে বহু লোক এ পেশার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করছে। অতীতকালে নৌপথই ছিল যোগাযোগের প্রধান উপায়। চর্যাপদের মধ্যে দেখা যায় নদীতে নৌকা পারাপারের চিত্র ; সেটি তৎকালীন সমাজ বাস্তবতারই ছবি এবং একই সঙ্গে প্রাচীন যুগের সাহিত্যে নদীর উপস্থিতির উদাহরণও। চর্যাপদে বিধৃত সমাজচিত্র সম্পর্কিত আলোচনায় সাধারণ মানুষের জীবন-সংলগ্ন বাস্তবতা হিসেবে একাধিক বার নদী প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ৫, ১৪, ৩৮ ও ৪৯-সংখ্যক চর্যা উল্লেখ্য।[৯]

এ বিষয়ে সুকুমার সেন বলেছেন :

> 'চর্যাগীতির বাহ্য অর্থের বিষয় সমসাময়িক জীবন হইতে নেওয়া। সে জীবন অত্যন্ত সাধারণ লোকের, যাহারা তূলা ধোনে, নৌকা চালায়, মদ চোলাই করে, সাঁকো তৈয়ারি করে, পশু পাখি শিকার করে, মাছ ধরে, দই বেচে ; যাহাদের মধ্যে নিঃস্ব ব্রাহ্মণ আছে ততোধিক নিঃস্ব ডোমও আছে, গুরু-গোঁসাই আছে শবর-শবরীও আছে।[১০]

প্রসঙ্গত আনিসুজ্জামানের মন্তব্যও উদ্ধৃতিযোগ্য :

> চর্যাগীতির রচনাকালে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিশেষত, সমুদ্র বাণিজ্যে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিলো তার ফলেই, মনে হয় চর্যাগীতির বন্দর-নগরী ও ব্যবসা-কেন্দ্রের জৌলুস কমে গিয়েছিলো।[১১]

চর্যাকার ডোম্বির ১৪ সংখ্যক চর্যায় আছে :

> গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নাঈ
> তঁহি চড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।[১২]

এখানে বলা হয়েছে :

> গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যে পারাপারের নৌকা চলছে। চণ্ডালী সেই নৌকা করে এক পারের লোককে অবলীলাক্রমে অপর পারে নিয়ে যায়। এটা তৎকালীন সমাজের দরিদ্র লোকের

---

৮. হুমায়ুন কবির, বাঙলার কাব্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
৯. Muhammad Shahidullah. Buddhist Mystic Songs. Dhaka. 1960. p. 15. 43.107. 135
১০. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ৭৫
১১. আনিসুজ্জামান, স্বরূপের সন্ধানে, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৩
১২. Muhammad Shahidullah. ibid. p. 43

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থানের একটা চিত্র। চণ্ডাল রমণীরা নৌকা পারাপার করতো এবং সেটাই ছিল তাদের আয়ের পথ।[১৩]

আনিসুজ্জামান আরও বলেছেন :

চর্যাগীতিতে কথিত শূন্য প্রান্তর (১৫), নদী (৫), খাল (৩২), ডোবা (৩২) ও সরোবরের (১০) কোন লৌকিক বৈশিষ্ট্য নেই, তবে ভাবতে ইচ্ছে করে যে, এখানে বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিচয় ধরা পড়েছে। নদী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঘাট গুল্লা খাদ তড়ের (১৫) কথা এবং সরোবর প্রসঙ্গে এসেছে পদ্মফুলের কথা (১০)। পদ্ম (২৭, ৪৭) ও পদ্মবনের (২৩) অবশ্য আরো অনেকগুলো উল্লেখ পাই।[১৪]

সরহ রচিত ৩৮ সংখ্যক চর্যায়ও আছে নদী প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

৩৮ সংখ্যক চর্যায় নৌকা, কেড়ুয়াল, পতবাল, নাভি, গুণটানা, কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজানে অতিবাহন প্রভৃতি নৌজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা নদীমাতৃক বাংলা দেশকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।[১৫]

চর্যার এ গীতিকাটিকে সুকুমার সেন নামকরণ করেছেন, নৌবাহিক চর্যা।[১৬]

সরহের এ পদটিতে আছে :

নৌবাহী নৌকা টাণই গুণে
মেলি মিল সহজেঁ জাই ণ আণেঁ।[১৭]

এ পদটির রূপকার্থ উপস্থাপন করেছেন অতীন্দ্র মজুমদার :

দেহনৌকা এবং মনকে বৈঠা করে ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার নির্দেশ দিচ্ছেন কবি। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। নৌবাহী নৌকা গুণে টানে কিন্তু দেহনৌকা বাহিত হয় না-তার জন্য প্রধান অবলম্বন সদগুরুর উপদেশ।[১৮]

ভুসুকু তাঁর ৪৯ সংখ্যক চর্যা পদ্মায় নৌকা চলাচলের কথা ব্যক্ত করে বলেছেন :

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খলেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গাল দেশ লুড়িউ।[১৯]

এ পদটিতে তৎকালীন নদীপথের যাত্রীরা ডাকাত বা জলদস্যুদের দ্বারা যে আক্রান্ত হত তার কথা

১৩. মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আনোয়ার পাশা, চর্যাগীতিকা (সম্পা.), ঢাকা, ১৩৭৫, পৃ. ১০
১৪. আনিসুজ্জামান, স্বরূপের সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
১৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ২০১
১৬. সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৪৫
১৭. Muhammad Shahidullah. ibid. p. 107
১৮. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৭৯
১৯. Muhammad Shahidullah. ibid. p. 135

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়েছে। চর্যাগীতিকায় নদীর উল্লেখ সম্পর্কে অতীন্দ্র মজুমদার বলেছেন :

> নদীমাতৃক বাঙলাদেশের সুন্দর ছবিটি চর্যায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। নদনদী খালবিলের গহন জল, কাদায় মাখা তীর, প্রবল স্রোত, নানা বিচিত্র নামের নৌকা, খেয়া পারাপার, পারের মাসুল আদায় করা, দাঁড় দিয়ে নৌকা বাওয়া, কাছি খুলে স্রোতে নৌকা ছেড়ে দেওয়া, মাঝ নদীতে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে ভীত হওয়া, গুণ টেনে নৌকা বাওয়া ইত্যাদি নদী সংক্রান্ত সমস্ত ছবি চর্যাগীতিগুলিতে পরম ভালবাসার সঙ্গে চিত্রিত।[২০]

মঙ্গলকাব্যসমূহে–অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতিতে–রয়েছে নদীর নানা প্রসঙ্গ। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন :

> সমুদ্রপথের বর্ণনা মঙ্গলকাব্য মাত্রেরই অপরিহার্য অঙ্গ।[২১]

তিনি আরও বলেছেন :

> প্রত্যেক সমুদ্র যাত্রার বর্ণনাই এক একটি উন্মত্ত ঝড়ের বর্ণনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্র ঝড়ে সর্বস্বান্ত সদাগরের করুণ চিত্রের পার্শ্বে মঙ্গলকাব্যের পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ একটি হাস্যরসের চিত্রও পরিবেশন করিতেন, তাহা বাঙ্গাল মাঝিদিগের খেদ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বহু প্রাচীন কাল হইতেই সমুদ্রগামী নৌকা চালনার কার্যে পূর্ববঙ্গের নাবিকগণই অংশগ্রহণ করিয়া আসিতেছে।[২২]

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গলে'র 'মানসিংহ-ভবানন্দ-উপাখ্যান' অংশে তাঁর সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে নদীর প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কবি দুঃখময় বাস্তবতার সঙ্গে নদীকে সংশ্লিষ্ট করে দরিদ্র মাঝির কাহিনীকে করে তুলেছেন জীবনধর্মী। হরিহোর দরিদ্র বাঙালী। তৎকালীন নিরক্ষর ও দৈব শক্তিতে আত্মসমর্পিত মানুষ মাত্রই ছিলো অদৃষ্টবাদী। দেব-দেবীই ছিল তাদের সুখ-দুঃখের তথা জীবনের প্রধান নিয়ন্তা। হরিহোরের ঘর ছেড়ে দেবী অন্নদা ভবানন্দের ভবনে যাত্রাকালে নদী পার হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কাব্যের একস্থানে বলা আছে :

> সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।[২৩]

দেবী অন্নদাকে নদী পার করার সময় ঈশ্বরী পাটুনীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে দেবী পাটুনীকে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন ; পাটুনী কেবল তার সন্তানের দুধে-ভাতে খেয়ে বেঁচে থাকার বর প্রার্থনা

---

২০. অতীন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
২১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৪০
২২. ঐ, পৃ. ৪০
২৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (সম্পা.), কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল। এ বিষয়ে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> সর্বশেষ পাটুনীর বর-প্রার্থনায় রাজ্য, স্বর্গ বা মোক্ষলাভের পরিবর্তে গৃহকেন্দ্রিক বাঙালীর শান্তিময় জীবন-যাপনের সনাতন আকুতি ধ্বনিত হইয়াছে—সন্তানের দুধে-ভাতে থাকার অপেক্ষা কোন উন্নততর বর অষ্টাদশ শতকের বাঙালী কবি কল্পনা করিতে পারেন নাই।[২৪]

মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগর মনসা দেবীর অভিশাপের শিকার হয়েছে। চাঁদ সওদাগর শিবের পূজারী, কিন্তু মনসা দেবীও চাঁদের পূজা প্রত্যাশা করেন। চাঁদ মনসা দেবীকে পূজা করতে রাজী নয়। মনসা দেবীর চাঁদের পূজা পাওয়ার প্রত্যাশা আর চাঁদের মনসা দেবীকে পূজা না দেয়ার দৃঢ়তায় দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে যায়। তখন মনসা দেবী সমুদ্রে ঝড় তুলে চাঁদ সওদাগরের সপ্ত ডিঙ্গা ডুবিয়ে দেয়। পূজা প্রসঙ্গে ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন :

> এই সব দেবপূজা সে পর্বের বাঙালীর জীবনাচারের সঙ্গে ছিল।[২৫]

এ বিষয়ে আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন :

> মঙ্গলকাব্যে দেখা গেছে, মানুষ না হলে দেবতার চলে না। কবির চলবে কি করে ![২৬]

মনসামঙ্গল কাব্যে লখীন্দরকে কেন্দ্র করে লোহার বাক্স তৈরি, তার বিয়ে, মৃত্যু এবং লখীন্দরের স্ত্রী বেহুলার নিষ্করুন দুঃখ ভোগ সৃষ্টি করেছে এক মর্মস্পর্শী কাহিনী। মৃত দেব-দেবীর বরে মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার প্রয়াসে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেলায় চড়ে বেহুলার নদীতে নদীতে ভেসে বেড়ানো বাংলা সাহিত্যে, সময়ের পরিবর্তনে, এক কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বেহুলার এ আত্মপ্রত্যয় সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন :

> নৈরাশ্যজনিত হৃদয়ে আশার একটি দীপশিখাকেও যে অনির্বাণ রাখিয়া দুস্তর সংসার-গাঙ্গুরে ভেলা ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহার জীবনে বাঁচিবার মত বলের ত অভাব হয় না এবং পরিণামে বাঁচিয়া উঠিতেও পারে সে-ই।[২৭]

ধর্মমঙ্গল কাব্যেও রয়েছে নদীর কথা। বল্লুকা নদীর তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে পূজা পার্বণের জন্য বিশিষ্ট স্থান হিসাবে চিহ্নিত। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন :

> ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে পাই, রঞ্জাবতী পুত্র- কামনায় চাঁপায়ের ঘাটে শালে ভর দিয়া ধর্ম-পূজা করিয়াছিলেন। 'শূণ্যপুরাণে'ও আছে, 'স্তান সন্ধ্যা গোসাঞির চাম্পানদীর ঘাট'। দামোদর নদের দক্ষিণে প্রায় সমান্তরালভাবে দ্বারকেশ্বর নদী প্রবাহিত। ইহা কোতুলপুর পর্যন্ত আসিয়া দক্ষিণে ক্রমে ঝুমঝুমি ও পরে রূপনারায়ণ নাম গ্রহণ করিয়া হুগলি ও

---

২৪. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, কলকাতা, ১৯৪৩, গ্রন্থ পরিচিতি।
২৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১২৮
২৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
২৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মেদিনীপুর জিলার উপর দিয়া গঙ্গা সাগরে পতিত হইয়াছে।[২৮]

পদ্মাপুরাণেও বিচিত্র রূপে নদীর উপস্থিতি চোখে পড়ে। ঝড়ের সময়কার নদীর স্রোত, ঢেউয়ের শব্দ, সীমাহীন জলরাশির তাণ্ডব নৃত্য প্রত্যক্ষদর্শীর মত বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন কবি। পদ্মাপুরাণের এক জায়গায় আছে :

উথলিয়া জল যেন পর্বত সমান
কুণ্ডলী আকৃতি স্রোত বহে স্থানে স্থানে।
নদীর গর্জন শুনি উড়িল জীবন
ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার হইল তখন।[২৯]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে পেশা ও প্রেমের সঙ্গে নদীর সংশ্লিষ্টতা অপরিহার্য বাস্তবতা হিসাবেই উপস্থাপিত। কাব্যটি গড়ে উঠেছে যমুনা নদীকে কেন্দ্র করে। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের যে বিচিত্র ঘটনা তা যমুনা নদী ও তার দুই তীরেই ঘটেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে নদীর উপস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> মহাপ্রভু শুধু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বিরহ পাঠ করিতেন, তাহা নহে ; সেযুগে বিশেষরূপে জনপ্রিয় রাধাকৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকালীলার প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। সনাতন গোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী'তে অন্য কাব্য বাদ দিয়া দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হয় এইজন্যই।[৩০]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে যমুনা নদীর নামেও রয়েছে 'যমুনা' খণ্ড। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের তাম্বুল খণ্ড, বংশী খণ্ড, বিরহ খণ্ড, দান খণ্ড প্রভৃতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য বর্ণনায় নদীই হয়ে উঠেছে প্রধান অবলম্বন। রাধা ও তার সঙ্গী গোপীরা যমুনা নদী পার হয়ে পসার বিক্রি করতে মথুরার হাটে যায়; সে নদীতে মানুষ পারাপার করে নাইয়া কানাই। যমুনা খণ্ডের এক স্থানে বলা হয়েছে :

ঘৃত দুধে সজাঁআ পসার।
বিকি জাই এ যমুনার পার।[৩১]

---

২৮. ঐ, পৃ. ৭২১
২৯. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, পদ্মাপুরাণ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২২৪
৩০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪
৩১. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (সম্পা.), কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> গোকুল থেকে মথুরায় যেতে গেলে যমুনা নদী পেরিয়ে যেতে হয়। যমুনার এক পাড়ে গোকুল বৃন্দাবন, অন্য পাড়ে মথুরা। গোকুল থেকে বৃন্দাবনের ভিতর দিয়ে যে পথটি মথুরার দিকে গিয়েছে, সেটি যমুনার পাড়ে এসে শেষ হয়েছে। যমুনার দুই পাড়ে দুটি ঘাট আছে।[৩২]

বংশী খণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। বাঁশির সুরে উতলা রাধা কৃষ্ণকে এনে দিতে অনুরোধ করলো বড়ায়িকে। কিন্তু যমুনা পার হওয়া সহজ নয় :

সুসর বাঁশির নাদ শুনি আঁইলো
মো যমুনা তীরে
শোভন কলসী করে ধরিআ
পারিলোঁ যমুনা নীরে।[৩৩]

দান খণ্ডেও আছে নদী প্রসঙ্গ :

যমুনা তীরে কদমের তলে
কাঞ্চুলী ভিজিয়া গেল ঘামে।[৩৪]

নৌকা খণ্ডের আলোচনায় সুকুমার সেন লিখেছেন :

> 'রাধার ভার ফেলিয়া দিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ যমুনার ঘাটে জীর্ণ তরী লইয়া খেয়ারি হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।[৩৫]

এ ভাবে দেখা যায় সে কালে রাধা অথবা রাধার মত মেয়েদের জীবনে নদী একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। নদী পার হলেই জীবিকা। অন্য দিকে, নদী পার হতে গিয়েই নানা সমস্যা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে নদী ব্যবহার করতে হয় কোন মাঝির সাহায্যে। এ ক্ষেত্রে মাঝিরূপী কৃষ্ণের সঙ্গে ছিল না কোন যোগাযোগের সম্ভাবনা। কিন্তু পেশার অপরিহার্য উপাদান হিসাবে নদীর উপস্থিতিতে এয়োস্ত্রী রাধার জীবনটাই পরিবর্তিত হয়ে গেল। সুখের সম্ভাবনা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে শুরু হয়েছিলো তার সংসার যাত্রা ; কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার সঙ্গে প্রেম, তাকে নিয়ে গেল স্বামী- সংসার থেকে বিচ্ছেদের, সমাজ ও সংস্কার থেকে বিচ্ছেদের এক দুঃখময় জীবনে এবং তাকে নিক্ষিপ্ত করল চিরবিরহের মধ্যে। সে না রাখতে পারল স্বামী, না পেল সর্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে কৃষ্ণকে।

---

৩২. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১১৬
৩৩. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬
৩৪. ঐ, পৃ. ৫৪
৩৫. সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগীয় গীতিকবিতার অন্তর্গত বৈষ্ণব পদাবলীতেও রয়েছে নদীর তাৎপর্যময় উপস্থিতি। জল আনার জন্য রাধা যখন যায় নদীর ঘাটে, দেখে সেখানে অপেক্ষমান কানাই। মনে তার যে ভাবই উঠুক, মুখে সে বলে, আগে জানতে পারলে হয়তো নদীর ঘাটেই আসতো না :

মুই যদি জানিতুম বাটে কানাইয়া যমুনার ঘাটে
তবে কেন ভরিতে আইলুম জল।[৩৬]

জীবিকাসূত্রে নদী পার না হয়ে উপায় নেই। সে জন্যে নদী পার করিয়ে দেওয়ার জন্যে কানাইকে আকুল আবেদন জানায় রাধা। শেষ পর্যন্ত যৌবন সমর্পণের বিনিময়ে যমুনা পার করে দেওয়ার চুক্তি হয় কানাইয়ার সঙ্গে। বেলা বেড়ে গেলে আর বিকিকিনি হবে না। নিরুপায় রাধার তাই ব্যাকুল উক্তি :

পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই।
কানাই মোরে পার কররে।
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পথের চৌকিদার
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার যাই পার।
হইল হাটের বেলা না হইল বিকিকিনি
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি।[৩৭]

জীবিকা অর্জনের দিক থেকে রাধার ক্ষেত্রে, জীবন ও নদী যেন পরস্পরের জন্যে অবিচ্ছেদ্য এবং তার ফলে সৃষ্ট অনিবার্য পরিস্থিতির এক শিকারই যেন রাধা। অভিসার পর্যায়ে রাধা কৃষ্ণের মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে গিয়ে বিদ্যাপতির উক্তি এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য :

নয়ন চান্দ দুহু এক তরঙ্গ।
জমুনা জল বিপরীত তরঙ্গ ॥
জমুনা তরি ধনি আইলি রাতি।
তুঅ অনুরাঁগে অঙ্গিরি কত সাতি ॥[৩৮]

উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশে যমুনা নদীর উল্লেখ লক্ষ্যযোগ্য। বিশেষ করে সে কালে নদীপথ ছাড়া সাধারণত মানুষের অন্য উপায় ছিল না। সে কারণে, জীবনের কথা যখনই উঠেছে, তখনই উঠেছে নদীর প্রসঙ্গ। কৃষ্ণকে হারিয়ে রাধার যে বিলাপ, তার মধ্যেও এসেছে যমুনা নদীর কথা। কারণ,

---

৩৬. মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা, ঢাকা, ১৩৭৫, পৃ. ৫৩
৩৭. ঐ, পৃ. ৯৬
৩৮. নরেশচন্দ্র জানা, গাথাসপ্তশতী ও বৈষ্ণব পদাবলী, কলকাতা, ১৯৮৬. পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তাদের আনন্দ ও বেদনার নানা স্মৃতির সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে আছে যমুনা নদী। বিদ্যাপতি বলেছেন :

সূন ভেল মন্দির সূন ভেল নগরী।
সূন ভেল দশ দিস সূন ভেল সগরী ॥
কৈসনে যাওব যমুনাক তীর।
কৈসে নেহারব কুঞ্জকুটীর ॥[৩৯]

বস্তুত, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু কাব্যেই নদীর উপস্থিতি লক্ষ্যযোগ্য। সে সব রচনার মধ্যে নদী সংশ্লিষ্ট বহু ঘটনা অথবা নদীর নানা মনোহারী চিত্রের দেখা মেলে। যেমন, 'গাথা সপ্তশতী'তে বিধৃত এমন একটি চিত্রে বলা হয়েছে, নদীর জলে স্নানের ফলে নায়িকার গায়ের হলুদ সব ধুয়ে গেছে। নায়িকার অঙ্গ-স্পর্শ পাওয়ার জন্যই নায়ক যেন হলুদ গোলা নদীর জল অঞ্জলি ভরে পান করছে :

মামি হিঅঅং বপী অঅং তেন জুআনেণ মজঝ মাণিণীঅ।
ন্হান হলিদ্দা-কভুঅং অণুসোত্ত-জলং পিঅন্তেন।[৪০]

সংস্কৃত কবি বলদেবের গাথার এই কথার মত প্রেমের মনোরম প্রকাশ দেখা যায় গোবিন্দ দাসের পদেও :

একলা যাইতে যমুনা ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥
অতি পদচিহ্ন চুম্বন কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥[৪১]

ময়মনসিংহ গীতিকাগুলোতে নদী তীরবর্তী নর নারীর সুখ-দুঃখের নানা চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন :

পল্লীগ্রামের পথে কানাকড়ি খুঁজিতে গিয়া যেন আমি স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার পাইয়াছি।[৪২]

ময়মনসিংহ অঞ্চল ছিল অত্যন্ত ঘন-অরণ্য-পাহাড়-টিলা বেষ্টিত নদী তীরবর্তী অঞ্চল:

বহু নদ-নদী, (ব্রহ্মপুত্র, সোমেশ্বরী, কংশ, ধনু, ফুলেশ্বরী, রাজেশ্বরী, ঘোড়া , উৎরা, সুন্ধ,

---

৩৯. ঐ, পৃ. ৪৩০
৪০. ঐ, পৃ. ২৬৬-২৬৭
৪১. ঐ, পৃ. ২৬৭
৪২. দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, কলকাতা, প্রকাশকাল (?), ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

মেঘনা) নিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চল গঠিত। পর্বত গাত্র বেয়ে যেমন নেমেছে নদী, তেমনি নেমেছে হিংস্র সর্প-ব্যাঘ্র সঙ্কুল ঘন অরণ্যভূমি।[৪৩]

ময়মনসিংহ অঞ্চলের মানুষের জীবনচিত্র ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ময়মনসিংহ গীতিকায় বস্তুনিষ্ঠ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন একজন সমালোচক :

বাংলা লোক কাহিনীগুলোকে যদি বাঙালীর কল্পনার রঙীন আলোকে রঙীন বলা চলে, তবে ময়মনসিংহের গীতিকাগুলোকে বলতে হয় সমাজের বাস্তব জীবনালেখ্য।[৪৪]

এ জীবনালেখ্যই ধারণ করেছে বহু মানুষের জীবনের সুখ ও দুঃখ। মলুয়া, মহুয়া, ভেলুয়া, চন্দ্রাবতী, কাজলরেখা প্রভৃতি পালায় নদীর নানা ছবি তথা নদী সংশ্লিষ্ট মানব জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ঝড় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককুলের হাহাকার দেখা যায় 'মলুয়া' গাথাঁর চাঁদ বিনোদের জীবনে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সর্বপ্রথম চাঁদ বিনোদের জীবনকে উন্মুলিত করে। কৃষক চাঁদ বিনোদ নিজের জমি আবাদ করেছিল। কিন্তু ধান পাকার আগে আশ্বিন মাসের বন্যায় ক্ষেতের ধান নষ্ট হয়ে যায়। সারা বছর কি ভাবে চলবে, কি ভাবে চালাবে সংসার, সে দুর্ভাবনায় মা-সহ চাঁদ বিনোদ ক্রন্দনরত :

আইশনা পানিতে মাও সব শষ্যি গেছে।
মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে শিরে দিয়ে হাত।[৪৫]

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় 'মলুয়া' গাঁথার দুটো পঙক্তি :

কাঙ্কের কলসী ভূমিত থইয়া মলুয়া সুন্দরী।
নামিল জলের ঘাটে অতি তরাতরি।[৪৬]

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শষ্যহানির ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন ঘটে ; তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়। ময়মনসিংহ গীতিকায় এরই চিত্র আমরা পাই চাঁদ বিনোদ, মইষাল বন্ধু সুজন, ডিঙ্গাধর ও বলরামের জীবনে। 'মহুয়া' গাঁথায় বণিক শ্রেণীর জীবনের সঙ্গে নদীর সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্যযোগ্য। বণিক জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা অনেকখানি নির্ভর করতো নদীর উপরই। অনেকে নদীতীরে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করত, বাণিজ্যের নৌকাগুলো নদীর তীরে বেঁধে রাখত। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নদীজল পান, স্নান ও অন্যান্য সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে নদী মানুষের জীবনে ছিলো এবং হয়েছে নিত্য ব্যবহার্য। এ সবের মধ্যে আবার নদীর বুকেই

৪৩. দীনেশচন্দ্র সেন, ময়মনসিংহ গীতিকা (সম্পা.), কলাকাতা, ১৯৭৩, ভূমিকা।
৪৪. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যে পঠন-পাঠন, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৯৯
৪৫. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (সম্পা.), কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১০৪
৪৬. ঐ, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

সূচিত হয় বিপরীত দৃশ্য : বন্যা-ঝড়-ঝঞ্ঝা ; তখন এই নদী তীরবর্তী মানুষদের জীবন হয় বিপন্ন। 'মহুয়া'র একটি বর্ণনায় নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে :

কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জলে।
নদ্যার চান ঘাটে গেল সেই না সন্ধ্যা কালে।[৪৭]

'কাজলরেখা'র ১৯ সংখ্যক কাব্যাংশে আমরা কুলকিনারাহীন সাগরের ছবি দেখি :

খুব বর এক সমুদ্দুর তার কুন দিকে কুল-কিনারা নাই।
তার মধ্যে গিয়া ডিঙ্গা পড়ল।[৪৮]

চন্দ্রাবতী গাঁথায়ও অনুরূপ নদীর চিত্র দেখা যায় :

সুইন্ধ্যা নদীর জল আমি
পাতিবাম্ শয়ন লো চন্দ্রা,
আইজ তেজিবাম জীবন।[৪৯]

১৭৫৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং মীর জাফর আলী খাঁ ও জগৎ শেঠদের ষড়যন্ত্রের ফলে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতন ঘটলে বাংলার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোর মাধ্যমে এবং ইংরেজদের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে বাঙলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা পাল্টে যায় ; বাঙলার কুটির শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য হয় বিপর্যস্ত। জমিদারদের এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্মিলিত শোষণ ও অত্যাচারে বাঙলার কৃষক হয় সর্বস্বান্ত।[৫০] অন্য দিকে প্রায় প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও কর ব্যবস্থা ইংরেজদের অনুকূল থাকায় আমদানি ও রপ্তানি এবং উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় সবকিছুতেই ইংরেজরা অস্বাভাবিক হারে মুনাফা ভোগের সুযোগ পায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগও পেয়ে যায়। তাদের প্রশাসন ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে স্থাপিত হয় অসংখ্য অফিস-আদালত। বাস্তব প্রয়োজনেই গদ্যের ব্যবহার বেড়ে যায়। অন্য দিকে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে স্বাধীনতা-স্পৃহা, দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও সাম্যবোধ এবং মানবাধিকার চেতনা। বাঙালীদের চিন্তায় আসে আধুনিক জীবনবোধ মানবতাবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ। দেশ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত ধারণাসমূহ, বিশেষ করে আত্মজাগরণজাত অনুভূতিসমূহ, প্রকাশিত হতে শুরু করে পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের মাধ্যমে। ইংরেজদের দালালী করার জন্যে সমবেত হয় জমিদার,

---

৪৭. ঐ, পৃ. ১৯
৪৮. ঐ, পৃ. ৩৯
৪৯. ঐ, পৃ. ২৪০
৫০. মেজবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

মহাজন, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বহু সংখ্যক চাকুরিজীবী। তাদের একমাত্র কাজ ছিল পরাধীন বাঙলার সাধারণ মানুষের শাসন নির্যাতন ও শোষণে ইংরেজদের সহায়তা করা। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি আয়েশী ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী গোষ্ঠী। এ সময় যে মধ্যশ্রেণী সৃষ্টি হয় তাদেরও জীবন নিয়ে রচিত হতে থাকে নানা আঙ্গিকের সাহিত্য : কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, বাঙলার জনজীবন যেমন তাতে হয়েছে উপস্থাপিত, তেমনই প্রতিফলিত হয়েছে বাঙলার প্রকৃতিও।

বাঙলার নদ নদী তার অনিবার্য প্রবহমানতার প্রভাব রেখে চলেছে বাঙলার জনজীবনে। নদীর ভাঙা-গড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তীরবাসী, তারাই আবার নদীতীরের পলল ভূমিতে সোনার ফসল ফলিয়ে গোলা ভরে তোলে। বিক্ষুব্ধ নদীর কবলে পড়ে জীবন প্রায়ই হয়ে ওঠে বিষময়। আবার কখনও কখনও তা হয় আনন্দের উৎস। নদী যেন সাঁকোর মতো মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের যোগসূত্র। বাঙালী জীবনে নদীর এই প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে বাংলা উপন্যাসেও। বাংলা উপন্যাসের সূচনাকাল থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত রচিত নদী-সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান উপন্যাসে এর প্রমাণ মেলে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৯); বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪); কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), ও দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৭-১৯০৯) বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) ও মাধবীকঙ্কন (১৮৭৭); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) নৌকাডুবি (১৯০৬); শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) বিরাজবৌ (১৯১৪) ও শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (১৯১৭) এবং কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪ -১৯৭০) নদীবক্ষে (১৯১৯)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাকালে প্যারীচাঁদ মিত্রের হাতে রচিত হয় প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৯)। সেখানে নানা পর্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে নদী প্রসঙ্গ। মতিলাল, ঠকচাচা ও অন্যান্য লোকজনসহ বাবুরাম বাবু নদীপথে নৌকায় গমনকালে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পড়ে প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। বাবুরাম বাবু তাঁর প্রথম পুত্র মতিলালকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য কলকাতায় তাঁর এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বেচারাম বাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন ; সেখানে বেচারামবাবুর ভাগ্নে হলধর ও গদাধরের সঙ্গে মিশে মতিলাল নিয়মিত স্কুলে না গিয়ে লিপ্ত হয় নানা অপকর্মে। ফলে সে পুলিশ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয় কয়েদ খানায়। বাবুরামবাবু ঠকচাচার সহায়তায় ও মিথ্যা সাক্ষীর বদৌলত মতিলালকে উদ্ধার করে নৌকাযোগে

Dhaka University Institutional Repository

নদীপথে যাওয়ার সময় পড়েন ঝড়ের কবলে। সেই সময়কার নদীর অবস্থার এক চিত্রময় বিবরণ মেলে 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে :

> সূর্য অস্ত যাইতেছে—সন্ধ্যার আগমন—দেখিতে২ পশ্চিমে একটা কালো মেঘ উঠিল—দুই এক লহমার মধ্যেই চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া আসিল—হু-হু করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল—কোলের মানুষ দেখা যায় না—সামাল২ ডাক পড়ে গেল। মধ্যে২ বিদ্যুৎ চম্‌কিতে আরম্ভ হইল ও মুহুর্মুহু২ বজ্রের ঝঞ্ঝন কড়মড় হড়মড় শব্দে সকলের ত্রাস হইতে লাগিল—বৃষ্টির ঝরঝর তড়তড়িতে কার্ সাধ্য বাহিরে দাঁড়ায়। ঢেউগুলো এক বার বেগে উচ্চ হইয়া উঠে আবার নৌকার উপর ধপাস্২ করিয়া পড়ে। অল্প ক্ষণের মধ্যে দুই তিনখানা নৌকা মারা গেল। ইহা দেখিয়া অন্য নৌকার মাজিরা কিনারায় ভিড়্‌তে চেষ্টা করিল কিন্তু বাতাসের জোরে অন্য দিগে গিয়া পড়িল।[৫১]

এ বর্ণনা বাঙলার নদনদীর এক স্বাভাবিক চিত্র। এ দেশের মানুষের নদীপথে চলাফেরার মধ্যে এ জাতীয় প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া যেন এক নৈমিত্তিক ব্যাপার। তার ওপর আছে মারাত্মক কাল বৈশাখী, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। সে সময় নদনদীগুলো ধারণ করে ভয়ঙ্কর জীবনধ্বংসী রূপ। সেই নদনদীই যখন হয়ে যায় শান্ত, তখন তার অপরূপ শোভাতে মুগ্ধ হয় এ দেশেরই সাধারণ মানুষ।

'রামারঞ্জিকা'য় নদী হরিহরের জীবনকে পরিণত করেছে বেদনার উৎসে। নদীর হিংস্র ছোবল হরিহরের হৃদয়কে করেছে রক্তাক্ত ও শূন্য। অভাবগ্রস্ত হরিহর কানপুর অথবা মিরাটে ছোট-খাট দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করবে। সেখানে যাওয়ার সময় নদীপথে তার নৌকা পড়লো ঝড়ের কবলে :

> নিমেষ মধ্যে নৌকা টলমল করিয়া উল্‌টিয়া গেল—নৌকার তক্তা ভিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। স্বচক্ষে দেখিলাম আমার দুইটি সন্তান চিৎকার করিতে২ ডুবিয়া পড়িল। আমার স্ত্রী কোলের ছেলেটি লইয়া কিয়ৎকাল আঁকুপাঁকু করিয়াছিলেন কিন্তু জলের তোড় এমনি হইতে লাগিল যে তিনিও শীঘ্র দৃষ্টির অগোচর হইলেন—আমি না মরিয়া ভাসিতে২ কিনারায় উত্তীর্ণ হইলাম।[৫২]

---

৫১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (সম্পা), কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৩৭
৫২. ঐ, পৃ. ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

রুদ্র বাতাস ও নদীর উত্তাল তরঙ্গ হরিহরের স্ত্রী- সন্তানদের অকাল মৃত্যুর মুখে নিয়ে গেলো। সে সময় নদীপথই যাতায়াতের অন্যতম প্রধান পথ ছিলো বলে নদীপথে ঝড়, বন্যা, ঘূর্ণি কবলিত হয়ে অনেক মানুষের প্রাণহানি হতো।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রচিত উপন্যাসসমূহে নদীর প্রসঙ্গ এসেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। নর নারীর জীবন সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর উপন্যাসে নদী উপস্থাপিত নানা ভাবে, নানা প্রসঙ্গে, নানা তাৎপর্যে; কাহিনীর বিকাশ-বিস্তৃতিতে, পরিণতি সৃষ্টিতে কোন কোন ক্ষেত্রে নদী তথা প্রকৃতি যেন পালন করেছে শিল্প নির্মাতার, কাব্য স্রষ্টার ভূমিকা। বাংলায় সাহিত্যিক গদ্য সৃষ্টির আগে নদী ও প্রকৃতির এমন কাব্যিক ব্যবহার ছিলো না বললেই চলে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নদীর উপস্থিতিই যেন কাহিনীকে করেছে বিকাশমান, প্রকৃতিকে করেছে সৌন্দর্যমণ্ডিত, আখ্যানকে করেছে ট্রাজিক। সপ্তগ্রামের নবকুমার সাধারণ একজন মানুষের মতোই জীবন যাপন করছিলো। সে গ্রামের অন্যান্য ধর্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বের হয়েছিল। কুয়াশায় তাদের দলছুট নৌকাটি নদীর তীরে বেঁধে আহারের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিলো মাঝিরা। বাঘের ভয়ে রান্নার কাঠ আনতে নবকুমার ছাড়া অন্য কেউ বনে গেল না। নদী থেকে তীরে উঠে বনের মধ্যে প্রবেশ করাটাই যেন ছিলো নবকুমারের জন্যে অনিবার্য। ইতোমধ্যে জোয়ার শুরু হওয়ার জন্যে সাগর উছলে উঠেছে, ঢেউগুলো এমন ভাবে তীরে আছড়ে পড়ছে যে, সেগুলোর আঘাতে নৌকা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায়, মাঝিরা নৌকা রক্ষার চেষ্টা করলেও স্রোতের তোড়ে সেটি রসুলপুর নদীর মধ্যে গিয়ে পড়লো। নবকুমারের ফিরতে দেরি হচ্ছিলো, অন্য দিকে সবাই মনে করলো, তাকে বাঘে বা শিয়ালে খেয়েছে। একই সঙ্গে নদীর মোহনায় প্রচণ্ড জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের চাপ ও আঘাত। এ সব কারণে সঙ্গীরা ফেলে চলে যায় নবকুমারকে। নদীর ঢেউ যেন নবকুমারকে নিক্ষিপ্ত করল লোকালয় থেকে অরণ্যে, বাস্তব জীবন থেকে অনেক দূরের এক ভুবনে। এ প্রসঙ্গে স্রোতোময় নদীর একটি চিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে :

> নাবিকেরা সুনিপুণ নহে ; নৌকা সামলাইতে পারিল না ; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। ... জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এই জন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।[৫৩]

৫৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড কলকাতা, ১৩৬০, পৃ. ১৩৯-১৪০

Dhaka University Institutional Repository

রাতে কাপালিকের জ্বালানো আগুনে বনের একাংশ আলোকিত হয়েছিল। নবকুমার সে আলোর দিকে ছুটে গেলো ত্রাণের সন্ধানে। কাপালিক তাকে আশ্রয় দিলেও তার পরিণাম জানা ছিলো কাপালিক-পালিত অনাথ তরুণী কপালকুণ্ডলার। মমতা ও করুণাবশে কপালকুণ্ডলা তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তার আগে তাদের বিয়ে দেন অধিকারী। সপ্তগ্রামের বাস্তব সাধারণ জীবনের পটভূমিতে এসেও তাদের রেহাই মেলে নি। ঘটনাচক্রে নবকুমারের প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতী ওরফে লুৎফ-উন্নিসা ওরফে মতিবিবি ফিরে আসে স্বামী ও সংসার পুনরায় ফিরে পেতে। কাপালিকও চলে আসে বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে কপালকুণ্ডলার প্রাণদণ্ড দিতে। ব্রাহ্মণ কুমারের ছদ্মবেশে মতিবিবির সঙ্গে গভীর রাতে কপালকুণ্ডলাকে আলাপরত দেখে নবকুমার তাকে দ্বিচারিণী মনে করে বসে। প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতীকে হারানোর কারণেই সম্ভবত নবকুমারের এই সন্দেহ প্রবণতা। কাপালিক নবকুমারের এই দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করে কপালকুণ্ডলাকে হত্যা করতে। কারণ, বালিয়াড়ি থেকে পড়ে গিয়ে সে তার দুটো হাতই ভেঙে ফেলেছিলো। এ সবের পরিণতিতে কপালকুণ্ডলার মনে জেগে ওঠে ক্ষোভ ও অভিমান। স্বামী, সমাজ ও সংসার ত্যাগ করে কপালকুণ্ডলা যখন নদীতীরের প্রান্তসীমায় দণ্ডায়মান হয় আত্মাহুতির জন্যে তখনও নবকুমারের সন্দেহ মুক্তি ঘটে নি, যদিও কপাকুণ্ডলার প্রতি তার প্রেম ছিল অপরিমেয়। নদীভাঙনের কবলে পড়ে কপালকুণ্ডলা যখন হারিয়ে গেল নদীগর্ভে তখন নবকুমারও ঝাঁপিয়ে পড়ল তাকে উদ্ধারের জন্যে। কিন্তু দুজনের কেউ-ই আর ফিরে আসে নি।

নদী ও সমুদ্রবেষ্টিত একটি স্থানে ছিল কপালকুণ্ডলা ও কাপালিক। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার সেখান থেকে পালালেও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কাপালিক ছুটে এলো সপ্তগ্রামে এবং সেখান থেকে পালাতে গিয়ে যেন তারা নিপতিত হলো অতল এক নদীতে। কপালকুণ্ডলার দিক থেকে এ যেন তার নদী থেকে আবির্ভাব এবং নদীতেই তিরোভাব। প্রসঙ্গত কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে চিত্রিত প্রকৃতির ভূমিকা সম্পর্কিত একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> হঠাৎ মনে হতে পারে নবকুমারের উল্লাস ঘটনা শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্বন্ধহীন একটি আকস্মিক ব্যাপার, আদৌ তা নয়। এই মনোভাবের প্রেরণায় নবকুমার গঙ্গাসাগরে না এলে কপালকুণ্ডলা উপন্যাস সম্ভব হত না।[৫৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনী পরিণতি লাভ করেছে একার্থে কুন্দনন্দিনীকে ঘিরেই। কুন্দনন্দিনীই উপন্যাসে উপস্থাপিত বিষবৃক্ষের বীজ। কুন্দ উপন্যাসটির আখ্যানে প্রবেশ করেছে নগেন্দ্রের হাত ধরে। সে কারণে বিষবৃক্ষের বীজ কুন্দনন্দিনী হলেও তা রোপণ করেছে

---

৫৪. প্রমথনাথ বিশী এবং বীথিকা চক্রবর্তী, বঙ্কিম সাহিত্য বিচার, কলকাতা, ১৩৭৭, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

নগেন্দ্র এবং সে তা বয়ে নিয়ে এসেছে নদীপথেই।

স্বামী নগেন্দ্রকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সূর্যমুখী। নদীপথে কলকাতায় যাওয়ার সময় সে তাকে বার বার সাবধান করেছে ঝড়-তুফান সম্পর্কে। নগেন্দ্রের নৌকার মাঝি রহমত মোল্লা। তিন দিনের দিন নদীতে তুফান ও ঝড় উঠল ; ঝড়ের তীব্রতা দেখে মাঝি নগেন্দ্রকে তীরে ওঠার পরামর্শ দিল। সে সময়কার ঝড়ের চিত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

> ঝড় ক্ষণেককাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। ... এমত সময়ে রহমত মোল্লা স্বয়ং বলিল যে, 'হুজুর পুরাতন কাছি, কি জানি কি হয়, ঝড় বড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ভাল হইবে।' [৫৫]

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নদী সংশ্লিষ্ট চিত্র সম্পর্কে একজন সমালোচকের নিম্নোক্ত মন্তব্য লক্ষ্য করা যেতে পারে :

> বিষবৃক্ষ প্রথম সামাজিক উপন্যাস, এর নৈসর্গও সামাজিক। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত নদীর বর্ণনায় বাংলাদেশের সমাজচিত্র যেমন প্রতিফলিত এমন আর কোথায় ? রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পৌঁছবার আগে এমনটি আর চোখে পড়বে না। বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে, পাঠকের অজ্ঞাতসারে নদীর ঘাটে ঘাটে, নদীর বাঁকে বাঁকে, নৌকার যাতায়াতে, নরনারীর স্নানলীলায় সমস্ত বাঙালী সমাজকে চিত্রিত করেছেন—সমস্ত বাংলাদেশটাই যেন নদীর ঘাটে এসে নেমেছে।[৫৬]

তাঁর এ মন্তব্যসূত্রে উল্লেখ করা চলে যে, নদীভিত্তিক জনজীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় ও চিত্র উপস্থাপনে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সে কালে বাঙালীরা পানীয় পান করার জন্যে এবং কাপড় ও তৈজসপত্র ধোওয়া, ও স্নানাদির জন্যে নদীর জল ও নদীর ঘাট ব্যবহার করতো ব্যাপকভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র নদীতে জনসমাগম লক্ষ্য করেছেন তীক্ষ্ণ ভাবে এবং সেখানে বিভিন্ন লোকের বিচিত্র আচরণ তিনি তুলে এনেছেন তাঁর মসীতে। একই সঙ্গে তিনি তাদের আচরণ—সংশ্লিষ্ট চারিত্র্যও ছেঁকে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলো সর্তকতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে নদীর সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক এবং নদীতে নানা আচরণের মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সহজ হয়ে ওঠে। নদী যে মানব জীবনের একটি অচ্ছেদ্য অংশ এবং সেখানে মানুষের স্বচ্ছন্দ প্রকাশটি যে অহরহই ঘটে তা-ও সবিশেষ লক্ষ্য করা যায়। 'বিষবৃক্ষে'-র

---

৫৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২

৫৬. প্রমথনাথ বিশী এবং বীথিকা চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনার একটি অংশ উদ্ধৃত করলে বক্তব্যটি সহজবোধ্য হবে :

> নগেন্দ্র বাবু যুবা পুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। প্রথম দুই এক দিন নির্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহবা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, , কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্র গ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠনিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে শাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারি দিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে,—পরের প্রয়োজনে।[৫৭]

---

৫৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

নগেন্দ্র তীরে উঠে কাছের গ্রামের মধ্যে আশ্রয়ের জন্যে গেলো। একটি পুরনো ঘর দেখে সেদিকে অগ্রসর হলো এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পেল রোগাক্রান্ত এক বৃদ্ধকে। বৃদ্ধের একমাত্র মেয়ে কুন্দনন্দিনী পিতার রোগ শয্যার পাশে বসে তার মৃত্যুর প্রহর গুণছে। পরদিন বৃদ্ধের মৃত্যু হলো। নগেন্দ্র ঝুমঝুমপুর গ্রামের মানুষদের মাধ্যমে মৃতের সৎকার করলো। তারপর এই অনাথ মেয়ের ব্যাপারে গ্রামবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করলো ; কিন্তু কেউ নগেন্দ্রের আহ্বানে বিশেষ সাড়া দিল না। একজন বললো কলকাতায় কুন্দর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বিনোদ ঘোষের কাছে কুন্দকে পৌঁছালে তার সমস্যা থাকবে না। পরোপকারী নগেন্দ্র তাই কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে কলকাতার পথে যাত্রা করলো। নগেন্দ্র কলকাতায় বিনোদ ঘোষকে খুঁজে পেল না । তখন নগেন্দ্র তার বোন কমলমণির বাড়িতে নিয়ে গেল কুন্দকে। কমলমণি কুন্দকে স্নেহ করেছে। কলকাতা থেকে ফিরতে দেরী হওয়ায় সূর্যমুখীকে এর মধ্যে চিঠি লিখেছে নগেন্দ্র। চিঠির মাধ্যমে নগেন্দ্র কুন্দের কথা সূর্যমুখীকে জানিয়েছে। জানিয়েছে কুন্দর প্রতি তার প্রাথমিক মুগ্ধতার কথা। সে মুগ্ধতা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সূর্যমুখী–সমস্যার আপাত সমাধান করেছে তার ভাই তারাচরণের সঙ্গে কুন্দর বিয়ে দিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়ের কিছু দিনের মধ্যে কুন্দ বিধবা হয়ে ফিরে এলো নগেন্দ্রের বাড়িতেই। নগেন্দ্র রূপজ মোহে পাগল প্রায় হলে স্বামীর সুখের জন্যে সূর্যমুখী শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্রের সঙ্গেই কুন্দনন্দিনীর বিয়ে দিলো। কিন্তু এই পরিস্থিতি সূর্যমুখী শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে গৃহত্যাগ করলো। নানা ঘটনা প্রবাহে নগেন্দ্র রূপজ মোহ থেকে অনেকখানি মুক্ত হলো। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতায় কুন্দ আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে, আত্মগ্লানিতে বিপর্যস্ত হয়ে অবশেষে বেছে নিলো আত্মহত্যার পথ। কুন্দর সর্বনাশ করতে গিয়ে দেবেন্দ্র ও হীরার জীবনও বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

বস্তুত, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্রগুলো যে দুঃখজনক করুণ পরিণতি বরণ করলো, জীবনের এক পর্যায় থেকে যে আর এক পর্যায়ে নিক্ষিপ্ত হলো, তা সবই যে কুন্দর আগমনের কারণে, সে কুন্দকে নগেন্দ্র নিয়ে এসেছিলো নদীপথেই। অন্য দিকে নগেন্দ্রও আবির্ভূত হয়েছিলো কুন্দর জীবনে নদীপথে গিয়েই। নদীতে ঝড় না উঠলে নগেন্দ্রের নৌকা কুন্দের জীবনের ঘাটে ভিড়তো না এবং নগেন্দ্রের বিশাল পরিবারে ও সমাজে এতো ব্যাপক ঘটনার সমাবেশও হতো না, ঘটতো না এতো বিপর্যয়। নদী এখানে যেন পালন করেছে একটি প্রতীকী ভূমিকা, যে ভূমিকার হাত থেকে কারও রেহাই মেলে নি।

Dhaka University Institutional Repository

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কাহিনীতেও রয়েছে নদীর ব্যাপক ভূমিকা। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্য প্রেমের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতাপ ও শৈবলিনীর গভীর বাল্য প্রেম যে সার্থকতা লাভ করবে না, এ কথা প্রতাপ বুঝেছিলো, শৈবলিনী বোঝে নি। প্রতাপ তাই গঙ্গাস্নানে গিয়ে ডুবে মরতে চেয়েছিলো। জ্ঞাতির সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক ধর্মীয় বিধানে নেই, এ কথা শৈবলিনীর জানা ছিলো না। প্রতাপ ভালোবাসার নিশ্চিত ব্যর্থতার কথা জেনে মৃত্যুকে বরণ করতে রাজি হয়েছিলো ; কিন্তু শৈবলিনী মৃত্যুকে বরণ করতে পারে নি। শৈবলিনীর আত্মাহুতি না দেয়ার মানসিকতার মধ্যে প্রতীকী অর্থে নদীর মতো প্রবহমান নারীজীবনের ছবিই যেন ফুটে উঠেছে। পরবর্তীকালে প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নদী হয়ে ওঠে এক অবিচ্ছেদ্য পটভূমি।

ফস্টর শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ডাকাতির মাধ্যমে তাকে অপহরণ করে বজরায় তুলে গঙ্গা নদীর পথে মুঙ্গের নিয়ে যায়। নদীই ছিল প্রতাপ শৈবলিনীর বাল্য প্রেমের সাক্ষী। লক্ষ্যযোগ্য যে, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী অসম বয়সী। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও শৈবলিনী এ বন্ধন মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। সে জন্য দেখা গিয়েছে যে, শৈবলিনী পুকুর ধারে সন্ধ্যা পর্যন্ত জলের সঙ্গে খেলা করতো এবং গান গাইতো :

ঘরে যাবো না লো সই!
আমার মদন মোহন আসছে ওই।
হায় ! যাব না লো সই![৫৮]

এই পুকুরের ধারেই ফস্টর শৈবলিনীকে প্রথম দেখে। প্রতাপ- শৈবলিনীর মিলন না হওয়ার ফলেই শৈবলিনী চলে যেতো সন্ধ্যাবেলায় পুকুরপাড়ে তার মনোবেদনা থেকে কিছুটা রেহাই পেতে। প্রতাপ শৈবলিনীর অপহরণের সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে শৈবলিনীকে উদ্ধার করে ফস্টরের বজরা থেকে। প্রতাপের কারণে ইংরেজরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে জন্যে, জনসন ও গলস্টন কর্তৃক বন্দী হয় প্রতাপ, দলনী ও কুলসুম। একই ঘরে লুকিয়ে থাকা শৈবলিনী নবাবের পাঠানো শিবিকার সঙ্গে দরবারে পৌঁছে বন্দীদের সংবাদ দেয়। শৈবলিনী নবাবের কাছে তার স্বামী প্রতাপকে রক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। নবাব মসীবুদ্দিন নামে একজন বিশ্বাসী খোজাকে শৈবলিনীর সঙ্গে দিলেন। শৈবলিনী গঙ্গার ওপর দিয়ে ছিপে চড়ে যাত্রা করল প্রতাপকে মুক্ত করার জন্য। নদী পথেই প্রতাপ একদিন শৈবলিনীকে মুক্ত করেছিলো ফস্টরের হাত থেকে। আজ

---

৫৮. বঙ্কিম চন্দ্রচট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

আবার সেই নদী পথেই শৈবলিনী প্রতাপকে মুক্ত করার জন্য ছুটে এসেছে। নিস্তব্ধ রাতে গঙ্গাতীরে কান্নার অভিনয় করে, পাগলের অভিনয় করে, ক্ষুধার্তের ভান করে ইংরেজদের বজরায় উঠেছে শৈবলিনী। নিজে ব্রাহ্মণ কন্যা বলে ব্রাহ্মণের হাতের খাবার খেতে হবে, নইলে খাবে না, তাতে তার জাত যাবে– এ ধরনের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে ইংরেজরা ব্রাহ্মণ কয়েদী প্রতাপের কাছে নিয়ে গেল শৈবলিনীকে। শৈবলিনী তখন প্রতাপকে জানিয়ে দিল তার পরিকল্পনার। সে অনুযায়ী পাগল শৈবলিনী জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পাগলকে উদ্ধার করার জন্য প্রতাপও ঝাঁপ দেয় জলে। সাঁতার কাটতে পাকা দু জনেই ডুব দিয়ে এবং সাঁতরিয়ে চলে যায় নিরাপদ দূরত্বে। নদীতে ভাসতে ভাসতে মনে পড়লো বাল্যপ্রেমের কথা। প্রতাপ ভালোবেসে শৈবলিনীকে 'শৈ' বা 'সই' বলে ডাকত। বাহুদিন পর সে ডাক শুনে শৈবলিনী আনন্দিত হয়ে ওঠে :

> শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল–হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। কত কাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশি মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন" ? [৫৯]

মরা কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে তীরে ওঠার পূর্ব সময় পর্যন্ত প্রতাপ ও শৈবলিনীর সংলাপে নদীর মতোন প্রবহমান প্রেমের চিরন্তন চিত্রই যেন ফুটে উঠেছে। এক পর্যায়ে শৈবলিনী প্রতাপকে বললো:

> মনে পড়ে ! তুমি যদি আমার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম।[৬০]

অবশ্য শৈবলিনী তার এই মনোবাঞ্ছা পূরণে একনিষ্ঠ থাকতে পারে নি। সে নিজেকে অযোগ্য মনে করে দূরের নির্জন পাহাড়ে আত্মগোপন করে আত্মাহুতি দিতে চেয়েছে। নির্জন পাহাড়ে ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়ে মৃতপ্রায় শৈবলিনীকে উদ্ধার করে চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের সংসারে সুখের অন্তরায় হিসেবে নিজেকে দেখেছে প্রতাপ। শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের দেখা হলে শৈবলিনীর চিত্ত বিচলিত হবে, তা হবে শৈবলিনীর অসুখের কারণ। এ বিবেচনায় প্রতাপ আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কিন্তু

---

৫৯. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭
৬০. ঐ, পৃ. ৪৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রতাপের এ বিদায়ে শৈবলিনীর হৃদয়ে বেদনার ঝড় উঠেছে :

> তুমি মরে গেলেই আমি সুখী হব। শৈবলিনী কি জানত না এই 'তুমি' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আমার প্রেম', 'আমার অস্তিত্ব', 'আমি–শৈবলিনী'। তার জীবনে-বিশ্বে প্রতাপ নেই, প্রেম নেই,– অর্থহীন সেই অস্তিত্ব নিয়ে শান্ত দাম্পত্যে কাল ব্যয় করেছে–সেই 'সুখ' সেই মৌন যন্ত্রণাই তারনিয়তি।[৬১]

এ উপন্যাসে প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনের পরিণতিতে নদীর ভূমিকা যেন প্রত্যক্ষ।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের কাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশের। ঘটনাস্থল হলো নদী। উপন্যাসের নায়িকা প্রফুল্লমুখী দরিদ্র বিধবা মায়ের সুন্দরী কন্যা। বরেন্দ্রভূমের ভূতনাথ গ্রামের বিত্তশালী হরবল্লভ তার ছেলে ব্রজেশ্বরের বউ করে ঘরে আনে এই দরিদ্র কন্যাকে সে সুন্দরী বলেই। প্রফুল্লমুখীর মাকে কতিপয় স্থানীয় দুষ্টলোক অমূলকভাবে জাতিভ্রষ্টা বলায় তার বেয়াই হরবল্লভ পুত্রবধূকে ঘরে স্থান দেয় নি। এই বিচার বিবেচনাহীন জাত্যভিমানের বলি হয়েই প্রফুল্লমুখী একদিন ডাকাত দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তরিত হয়।

প্রফুল্লর স্বামী ব্রজেশ্বর শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা ধার না পেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে রাগ করে নদীপথে ঘরে ফিরছিল। ব্রজেশ্বরের নৌকা পড়ে ডাকাত দলের কবলে। ডাকাতরা নৌকার সব মাল লুট করে ব্রজেশ্বরকে ধরে নিয়ে যায় ডাকাত সর্দারের কাছে। ব্রজেশ্বরের দ্বিতীয় স্ত্রী সাগর স্বামীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধা হয়ে যোগ দিলো দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে। ব্রজেশ্বরের সঙ্গে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সাগর প্রতিজ্ঞা করেছিল স্বামীকে দিয়ে তার পা টিপিয়ে নেবে। তার এই পণ পূরণ হয় নদীর মধ্যে বজরায় দেবী চৌধুরাণীর কৌশলের কারণে। সাগরের কাছ থেকে দেবী চৌধুরাণী ব্রজেশ্বর ও তার শ্বশুর হরবল্লভের অর্থ সংকটের কথা জেনেছিল। হরবল্লভের মান সম্মান রক্ষার্থে শেষ পর্যন্ত টাকা ধার দিলো দেবী চৌধুরাণীই। টাকা নিয়ে ব্রজেশ্বর সাগরসহ নৌকায় আবার যাত্রা করে তার গ্রামের উদ্দেশে। নদীতে সংঘঠিত এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনী যেমন একদিকে অগ্রসর হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি বিভিন্ন চরিত্রের জীবনচিত্রেরও পরিবর্তন ঘটেছে। হরবল্লভের জমি-জাত রক্ষা পেয়েছে এক দিকে, অন্য দিকে সাগরও তার স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছে। তা ছাড়া এ সব ঘটনার মধ্য দিয়ে ডাকাত সর্দার দেবী চৌধুরাণীও স্বপ্ন দেখতে থাকলো তার স্বামী ও সংসারে ফিরে আসার। দ্বিতীয় বার নদীবক্ষে যে ঘটনা ঘটেছিল তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। হরবল্লভ প্রথমত ঋণের টাকা বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের রাতে পুত্র ব্রজেশ্বরের মাধ্যমে

৬১. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, কলকাতা, ১ম খণ্ড, ১৯৯৪, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

শোধ দিতে চেয়েছিল। পরে হরবল্লভ সিদ্ধান্ত নেয় যে, ডাকাত সর্দার দেবী চৌধুরাণীকে ইংরেজ সিপাহীদের হাতে ধরিয়ে দেবে। তার পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ :

> লেফটেনান্ট্ ব্রেনান্ সেই জন্য কতক ফৌজ লইয়া ছিপে চলিলেন। এইরূপ পাঁচখানি ছিপ ভাঁটি দিয়া দেবীর বজরা ঘেরাও করিতে চলিল। এদিকে লেফটেনান্ট্ সাহেব আর কতক সিপাহী সৈন্য লুক্কায়িত ভাবে, বন দিয়া বন দিয়া তটপথে পাঠাইলেন। যেখানে দেবীর বজরা থাকিবে, হরবল্লভ বলিয়া দিল ; সেইখানে তীরবর্ত্তী বনমধ্যে ফৌজ লুকাইয়া রাখিলেন, যদি দেবী ছিপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তটপথে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে এই ফৌজের দ্বারা ঘেরাও করিয়া ধরিবেন। আরও এক পলাইবার পথ ছিল—ছিপগুলি ভাঁটি দিয়া আসিবে, দূর হইতে ছিপ দেখিতে পাইলে দেবী ভাঁটি দিয়া পলাইতে পারে, অতএব লেফটেনান্ট্ ব্রেনান্ অবশিষ্ট সিপাহীগুলিকে দুই ক্রোশ ভাঁটিতে পাঠাইলেন, তাহাদিগের থাকিবার জন্য এমন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন যে, সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকনার সময়ে সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সিপাহীরা সেখানে তীরে লুকাইয়া থাকিবে, বজরা দেখিলেই জলে আসিয়া তাহা ঘেরাও করিবে।[৬২]

এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে হরবল্লভ দেবী চৌধুরাণীকে সিপাহীদের কাছে ধরিয়ে দিতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। নির্দিষ্ট তারিখে দেবী চৌধুরাণী বা প্রফুল্ল সকল পাহারা ত্যাগ করে, সকল অলংকার ত্যাগ করে, শুধু মোটা সূতার কাপড় পরে গলায় ও হাতে ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিল ব্রজেশ্বরের। ব্রজেশ্বর উপস্থিত হলে সে তার পদধূলি নিয়ে ভক্তি নিবেদন করে। স্বামীর প্রতি গভীর দরদের জন্য দেবী চৌধুরাণী মৃত্যুকে উপেক্ষা করে নদীর মধ্যে বজরায় বসেছিলো। কিন্তু হঠাৎ ইংরেজ সৈন্যদের গুলির শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। তখন প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে তার ছিপ নিয়ে পালিয়ে যেতে বলে ; কিন্তু ব্রজেশ্বর পালিয়ে যায় নি। বরং স্বামীর দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে। এ সময়ে দেবী চৌধুরাণীর তীরন্দাজ বাহিনীও ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে যার ফলে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবস্থা তৈরী হয়। শান্তিকামী দেবী চৌধুরাণী যুদ্ধ বিরতির জন্য সাদা পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। দেবী চৌধুরাণীর মনের কথা জানত কেউ কেউ। তার সঙ্গী নিশি কৌশলে হরবল্লভকে জাত রক্ষার কথা বলে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে তার ছোট

---

৫৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪৪

Dhaka University Institutional Repository

বোনের বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত করায়। নিশির ছোট বোনই প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণী। প্রফুল্ল সব সময়ই আশ্রয় চেয়েছিলো স্বামীগৃহে, দস্যু জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে তাই স্বামীগৃহে সাংসারিক হওয়ার পথ রচনাই ছিলো প্রফুল্লের মূল আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষার সফলতা আসে নদী বক্ষে সংঘটিত নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে। একার্থে, নদীনির্ভর ঘটনাবলির মধ্য দিয়েই যেন রক্ষা হয়েছে হরবল্লভের জমি-জাত, প্রফুল্ল পেয়েছে তার স্বামী-সংসার এবং প্রফুল্ল হরবল্লভের সংসারে পেয়েছে পুত্রবধূর মর্যাদা।

রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসেও কাহিনীর ক্রমবিকাশ এবং চরিত্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় নদীর ব্যবহার এবং নদীর প্রতি মানুষের নির্ভরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। বিস্তৃত এলাকা উপন্যাসটির পটভূমি হওয়ায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে তখন নদী পথই ছিলো সবচেয়ে সুবিধাজনক। নদীয়ার রুদ্রপুর, ইছাপুর, বিহার, মুঙ্গের প্রতিটি স্থানে আসা-যাওয়ার জন্য নদীপথ ছিলো প্রধান অবলম্বন। উপন্যাসের মূল চরিত্রসমূহের ভাগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে রয়েছে নদীর সম্পৃক্ততা।

'বঙ্গবিজেতা'-র মহাশ্বেতা ও তার মেয়ে সরলা নদীতীরে একটি কুটিরে বসবাস করতো। মহাশ্বেতা মহেশ্বর মন্দিরের ব্রহ্মচারীর কাছে ব্রত গ্রহণ করেছে। সরলা ও প্রতিবেশী অমলা খুবই ঘনিষ্ঠ। সরলা ও অমলা প্রতি সকালে নদী থেকে পানি নিয়ে আসে। সেই তোলা পানিই সংসারের পানীয় জল। নদীপথেই মহাশ্বেতা ও সরলা ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বনগ্রাম চলে আসে। সেখানে মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্রশেখর ও তার আশ্রিতা বিধবা কমলার সঙ্গে মহাশ্বেতা ও সরলার পরিচয় ঘটে। মহেশ্বর মন্দিরের সামনে ইন্দ্রনাথ ও বিমলার কথা হয় ; টেডরমল্লের দরবারে বন্দী পিতা সতীশচন্দ্রের মুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে বিমলা। ইন্দ্রনাথ নদীপথে এক মাঝির কণ্ঠে সুমধুর সুরে বিমোহিত হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নদীর অপরূপ শোভা :

> নৌকা এক ক্রোশ ভাসিয়া গেল, গঙ্গার জল উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, আবার দুই এক খণ্ড শুভ্র মেঘ দেখা যাইতেছে, কখন কখন চন্দ্রকে ঈষৎ আবরণ করিতেছে, আবার বায়ুতে তাড়িত হওয়াতে চন্দ্রের পুণ্যজ্যোতিঃ নদীর প্রশান্ত বক্ষে পতিত হইতেছে।[৬৩]

---

৬৩. রমেশচন্দ্র দত্ত, রমেশ রচনাবলী, কলকাতা, ১৩৬০, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রনাথ গভীর অরণ্যে টেডরমল্লের বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে উঁচু পাড় থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়েছিল। সে সময় বিমলা ঐ নদীতে নৌকায় অবস্থান করছিলো। বিমলা সক্ষম হয় ইন্দ্রনাথকে নদী থেকে উদ্ধার করতে। ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে মহাশ্বেতা ও সরলা বিমলার পিতার প্রাসাদে এসেছিলো। বিমলা নিজের পিতার আশ্রিত শকুনির ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করে নদীপথেই মুঙ্গেরে পৌঁছে যায়। সেখানেকৌশলে মাসুমীর বন্দী শিবির থেকে ইন্দ্রনাথকে মুক্ত করেছিলো বিমলাই। শেষ পর্যন্ত শকুনির ষড়যন্ত্র সফল হয় নি। রাজা টেডরমল্ল সতীশচন্দ্র ও শকুনির মৃত্যুদণ্ড দেয়। বিমলা ব্রত গ্রহণ করে মহেশ্বর মন্দিরে যায়। সরলা এই নদী পথে খুঁজে পায় বাল্যপ্রেমিক এবং তাকে বরণ করে স্বামীরূপে। এ উপন্যাসে নদী যাতায়াতের প্রধান উপায় ; নদীর সৌন্দর্যও সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে মাঝে মধ্যে। তা ছাড়া নদীর সঙ্গে মানব জীবনের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তারও প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে।

রমেশচন্দ্র দত্তের আরও একটি রাজনৈতিক উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কনে'ও নদী একটি প্রধান উপকরণ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে নরেন ও হেমলতার বাল্যপ্রেমের গভীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নদী সংশ্লিষ্ট। নরেন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র ও হেমলতা তিন বাল্যবন্ধু। জমিদার বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নবকুমার জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব পায়। বীরেন্দ্রনাথের ছেলে নরেন আশ্রয় লাভ করে নবকুমারের কাছে। নবকুমারের মেয়ে হেমলতার সঙ্গে নরেনের বন্ধুত্ব। নরেন, হেম ও শ্রীশ খেলা করত গঙ্গা তীরে। সেখানে খেলা করার সময় শ্রীশের প্রতি হেমের কোনরূপ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ নরেন সহ্য করতো না। ছোটখাটো বিষয়ে মনোমালিন্যের পথ ধরে তাদের সম্পর্কের এমন পতন হলো যে, একদিন নরেন শ্রীশকে নৌকা থেকে ফেলে দিলো গঙ্গার জলে। এ প্রসঙ্গ ধরেই নরেনকে বাড়ি থেকে যেতে হয় বের হয়ে। পথে গঙ্গার তীরে নরেনের সঙ্গে দেখা হয় হেমলতার। বিদায়ের সময় শোকাতুর নরেন গঙ্গা সৈকতে তার রোপণ করা মাধবীলতা দিয়ে কঙ্কন তৈরি করে হেমকে পরিয়ে দেয়। হেম যতদিন নরেনকে মনে রাখবে ততদিন এ মাধবীকঙ্কন যত্নে রেখে দেবে। হেম নরেনকে ভুলে গেলে এ মাধবীকঙ্কন গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়ার কথা বলেছে নরেন। সে দিন রাতেই গঙ্গা সাঁতরিয়ে নরেন চলে যায় দূরে অজানার পথে। উপন্যাসটিতে ধৃত

Dhaka University Institutional Repository

সে সময়কার নদী ও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি দৃশ্য :

> সায়ংকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন গঙ্গাতীরে বসিয়া ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা অসংখ্য ঊর্মিরাশির দিকে কি জন্য চাহিয়া রহিয়াছে ? যতদূর অন্ধকার দেখা যায়, বীচিমালা উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহার একটা ঈষৎ ধূসর রেখা, তাহার পর আর অন্ধকারে দেখা যায় না।[৬৪]

উপন্যাসের কাহিনীর শেষদিকে হেম মথুরায় নরেনের সঙ্গে দেখা করে তার রেখে দেয়া মাধবীকঙ্কন দেয় ফিরিয়ে। নরেন সে মাধবীকঙ্কন গ্রহণ করে ভাসিয়ে দেয় গঙ্গার জলে।

গঙ্গা সৈকতে বাল্য প্রেমের এই ট্রাজেডিতে রয়েছে নদীর সম্পর্ক। এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য উপকরণ যেন নদী। প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রেও নদীর উপস্থিতি রয়েছে এখানে। নরেনের জীবনের সঙ্গে নদীর স্রোত সম্পর্কে, নদীর স্রোতোধারার মতোনই যাপিত জীবনে নরেন ভেসে গেছে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। সে যেন নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া মাধবীকঙ্কন। হেমলতাকে পাওয়াই ছিলো নরেনের সারা জীবনের সাধনা। নরেনের হেমলতাকে না পাওয়ার বেদনাটি নদীর জলে মাধবীকঙ্কন ভাসিয়ে দেয়ার চিত্রটিতে প্রকাশিত হয়েছে আরও বেদনাবিধুর হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে নদী প্রসঙ্গ এসেছে রমেশের বিয়ে কেন্দ্র করে। বরযাত্রীরা দম্পতিসহ নৌকাযোগে বাড়ি ফেরার পথে ঝড়ের কবলে পড়ে। ফলে নৌকাডুবি হয়। ঝড়ের তাণ্ডব যেন উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত বয়ে গেছে। এবং তা ক্রমাগত স্পর্শ করেছে রমেশ, কমলা, হেমনলিনী প্রমুখ সকলকে। হেমনলিনীর জীবনের ভিত্তিও যেন আলগা করে দিয়েছে নদীর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ। রমেশ চেতনা ফিরে পায় নদী তীরে। রমেশ তার বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়কে খুঁজতে গিয়ে অজ্ঞান নববধূ কমলাকে পায় নদী তীরেই। রমেশ স্ত্রীজ্ঞানে কমলাকে সেবা করে সুস্থ করে তোলে ; কিন্তু কমলা রমেশের বিবাহিত স্ত্রী নয়। কমলার স্বামীর নাম ডাক্তার নলিনাক্ষ। এ সত্য তখনও জানা ছিলো না কোন পক্ষেরই। দুর্ঘটনার রাতে চাঁদের ক্ষীণ আলোয় রমেশ ও সুশীলা স্বামী-স্ত্রীর দাবি পূরণের মধ্য দিয়ে সূচনা করে নতুন এক জীবন। কিন্তু রমেশ যাকে সুশীলা ভেবেছে, সে ছিলো আসলে কমলা। সুশীলা যে নদীর স্রোতে ভেসে গেছে অন্যত্র, তা জানার সুযোগ হয় নি রমেশের। তেমনই ঘটেছে নলিনাক্ষ ও কমলার ক্ষেত্রেও। রমেশের সংসারে কমলা যেদিন সুশীলা নামে আপত্তি তুলে তার কমলা নামের পরিচয় দেয়, সেদিনই রমেশ বুঝতে পারে ভুলটি। রমেশের ক্ষেত্রে বউ বদল হয়ে গেছে নদীর উত্তাল তরঙ্গে। প্রকৃতির এই খেলা সহজে

---

৬৪. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙতে পারে নি রমেশ। এতদিন রমেশ কমলাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সংসার করে এসেছে ,আজ কেমন করে হঠাৎ তাকে পরস্ত্রী বলে তাড়িয়ে দেবে? এই সংসারে যার অন্য কেউ নেই তার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করা সঙ্গত নয় বলে তার মনে হয়েছে। মমতার ও দায়িত্বের বন্ধন ছিঁড়ে হেমনলিনীকে বিয়ে করার প্রস্তাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে রমেশ। অন্য দিকে হেমনলিনীও পুড়েছে অশান্তির আগুনে। সে যখন শুনল যে রমেশ বিবাহিত, তখন থেকেই শুরু হলো তার মানসিক যন্ত্রণা। রমেশ না পারে কমলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে, না পারে কমলাকে ত্যাগ করে হেমনলিনীকে নিয়ে সংসার সাজাতে।

উপন্যাসের দীর্ঘ কাহিনী জুড়ে জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে টানাপোড়েন চলে তার মূলে ছিলো নদীতে সংঘটিত বিপর্যয়। সেই বিপর্যই দু জন মানুষকে দাঁড় করিয়েছিলো জীবনের মুখোমুখি। নদীতে দুর্যোগ নেমে না এলে রমেশ-কমলার এ কাহিনী নির্মাণ করা হয়তো সম্ভব হতো না। এ কাহিনীর অভ্যন্তরে বেদনার যে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ফলবতী হয়েছে, তার মূলে যেন রয়েছে প্রমত্ত নদী। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি নেওয়া যেতে পারে :

> এমন সময় আকাশে মেঘ নাই, কিছু নাই, অথচ কোথা হইতে একটা গর্জনধ্বনি শোনা গেল। পশ্চাতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড অদৃশ্য সম্মার্জনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধূলা-বালি আকাশে উড়াইয়া প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া আসিতেছে ; 'রাখ্ রাখ্ সামাল সামাল হায় হায়' করিতে করিতে মুহূর্তকাল পরে কি হইল, কেহই বলিতে পারিল না। একটা ঘূর্ণি হাওয়া একটি সংকীর্ণ পথমাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবল বেগে সমস্ত উন্মূলিত বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা কয়টিকে কোথায় কী করিল, তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।[৬৫]

নদী মানুষের জীবনের সঙ্গে যেন একটা সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। এ কারণেই যেন মানুষের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ কখনও কখনও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে নদীর ওপর। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা চলে :

> সেই ঝড়ের রাত্রে নৌকা ডুবির যে চিত্র কবি এঁকেছেন, তা শুধু যে বাস্তব তাই নয়, কাহিনীর গুরুত্ব বৃদ্ধিরও সহায়ক হয়েছে।[৬৬]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিরাজবৌ' উপন্যাসে নদী উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিরাজবৌ'-এর

---

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৌকাডুবি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২১

৬৬. অর্চনা মজুমদার, রবীন্দ্র-উপন্যাস-পরিক্রমা, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক স্বল্প হলেও সে সম্পর্কই যেন তার পরিণতি অনিবার্যভাবে নির্দেশ করেছে। এক অদৃশ্য সুতোয় নদীর সঙ্গে যেন বাঁধা পড়েছে বিরাজবৌ। বিরাজবৌ প্রতিদিন নদী থেকে জল সংগ্রহ করত সংসারের জন্য। নদীর সঙ্গে সংসারের এ সম্পর্কের সুযোগ নিয়েই যেন লম্পট জমিদার রাজেন্দ্র বিরাজবৌয়ের সঙ্গে গড়ে তুলতে চেয়েছে নীতিবিরুদ্ধ সম্পর্ক। কেবল নদীর ঘাটে উপস্থিতির কারণেই বিরাজবৌকে দেখতে পেয়েছে জমিদার রাজেন্দ্র। এখান থেকেই রাজেন্দ্রের মধ্যে জেগে ওঠে রূপতৃষ্ণা। বিরাজবৌয়ের রূপমুগ্ধ রাজেন্দ্র তাই নানা ছলে বিরাজবৌকে দেখার চেষ্টা করে, সময় কাটায় নদীর ঘাটে। কাঠের মাচা তৈরি করে এক রকম শুকনো নদীতেও ছিপ ফেলে মাছ ধরার অভিনয় করেছে রাজেন্দ্র। পথের মোড়ে লুকিয়ে থেকে বিরাজবৌকে দেখার চেষ্টাও করেছে। এমন পরিস্থিতিতে বামুন কুলবধূ বিরাজবৌ মর্যাদা রক্ষাকল্পে নদী থেকে জল আনার সময়ও বদলে ফেলে, একই সঙ্গে একদিন জমিদারকে শাসিয়েও দেয়। তবু রাজেন্দ্র বিরাজবৌয়ের রূপমোহে ত্যাগ করতে পারে নি। রাজেন্দ্র তার উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে বিরাজবৌয়ের ঘরের কাজের মানুষ সুন্দরীকে হাত করে। অর্থকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় বিরাজবৌ পেতলের কব্জার ফর্মা তৈরির কাজ করেছে। কখনও পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা ভাবে নি সে ; বরং স্বামীর সংসারে সুখে-দুঃখে জীবন কাটাতে চেয়েছে। কিন্তু তিন দিন অনাহারে থেকে রোগে-শোকে ভুগে জীবনের প্রতি এক সময় বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায় বিরাজবৌ। অবশেষে নৈতিকতার প্রশ্নে একদিন যে সুন্দরীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, শেষে তাকেই স্মরণ করেছে বিরাজবৌ। নদীর ঘাটে সে আত্মহত্যার সংকল্প ভেঙে সুন্দরীর সহায়তায় গ্রহণ করেছে রাজেন্দ্রের দেয়া সুখের প্রতিশ্রুতি। এ বিষয়ে নদীতে বজরায় রাজেন্দ্রের কাছে বিরাজবৌয়ের চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা চলে :

> একখানি সুসজ্জিত বজরা নোঙ্গর তুলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ সুন্দরীর পানে চাহিয়া বলিল, তুই সঙ্গে যাবি নে ? না বৌমা , আমি এখানে না থাকলে লোকে সন্দেহ করবে। যাও মা, ভয় নেই, আবার দেখা হবে। বিরাজ আর কিছু বলিল না। সুন্দরী কাঙালীর পানসিতে উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল। জমিদারের সুশ্রী বজরা বিরাজকে লইয়া তীর ছাড়িয়া ত্রিবেণী অভিমুখে যাত্রা করিল।[৬৭]

চরম খাদ্যাভাব নৈতিকতাসহ জীবনের সব রকমের বন্ধনকেই যেন শিথিল করে দেয়। এ কারণেই বিরাজবৌকে চড়তে হয়েছে রাজেন্দ্রের বজরায়। বিরাজবৌ বজরায় মাতাল রাজেন্দ্রের কাছে

---

৬৭. সুকুমার সেন, সুলভ শরৎ সমগ্র (সম্পা.), কলকাতা, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

নিজেকে সমর্পণ করার আগে ফিরে পায় চৈতন্য। পর মুহূর্তেই আবার সেই নদীবক্ষেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সে রক্ষা করে নিজের সতীত্ব। নীলাম্বরের কর্মহীন জীবনের অনিবার্য পরিণতি দরিদ্রতার বোঝা মাথায় করে বিরাজবৌ শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় ভিক্ষুকে। নদী নিয়ন্ত নয় বিরাজবৌয়ের জীবনের। কিন্তু, যে সমস্ত ঘটনা তাকে করেছে নিয়ন্ত্রিত, বিপর্যস্ত, তার অধিকাংশই নদী সম্পৃক্ত। নদীই যেন খেলা করেছে তার জীবন নিয়ে।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে নদী মানুষের ও তার জীবনের অনুষঙ্গী হিসেবেই যেন হয়েছে উপস্থাপিত। যে ইন্দ্রনাথ একদিন দুঃসাহসিক নদী-অভিযানে নিয়ে যায় শ্রীকান্তকে, সে যে নদীর গতি প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল তা সহজেই বোঝা যায়। জেলেদের পাহারা এড়িয়ে মাছ চুরি তার বহুদিনের অভ্যাস। গভীর অন্ধকার রাতে বিষধর সাপের উপস্থিতির মধ্যেও কি ভাবে মাছ চুরি করতে হয়, তা ইন্দ্রনাথ ভালোভাবেই রপ্ত করে রেখেছিলো। জেলেদের ভয়ে, সাপের ভয়ে শ্রীকান্ত যখন বার বার ব্যাকুল হয়েছে, তখন, তার ঐ অভিজ্ঞতার কারণেই, সে বিন্দুমাত্র হয় নি বিচলিত। খরস্রোতা নদীতে, প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে, উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে কিংবা যে কোন প্রকার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে, এমনকি গভীর অন্ধকারে মাঝনদীতে কিভাবে নৌকা চালাতে হয়, সামাল দিতে হয়, তা অতি সুষ্ঠুভাবে জানা ছিলো ইন্দ্রনাথের। নদী যখন সত্যিই ভয়ঙ্কর, তখনও শঙ্কিত হয় নি ইন্দ্রনাথ। যে রাতে শ্রীকান্তকে নৌ-অভিযানে নিয়ে যায় ইন্দ্রনাথ, সে রাতের অভিজ্ঞতার একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মত্তগর্জন ছাড়া কোনও শব্দমাত্র নাই। হঠাৎ ছোট্ট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইন্দ্র দুই হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া চড়িয়া বসিল। ক্ষুদ্রতরী তীব্র একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।
>
> কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্র গতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোর বয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই

Dhaka University Institutional Repository

সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশেপাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে। কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোনখানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই।[৬৮]

নদী ও প্রকৃতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্যাবলি যেন ফুটে উঠেছে ইন্দ্রের চরিত্রে, তার প্রায় অবিশ্বাস্য অলৌকিক কর্মকাণ্ডে। ইন্দ্র দূরাগত শব্দ শুনে বুঝতে পারে নদীর পাড় ভাঙছে, বুনো শুয়োরের ডাকও তার চেনা। প্রবল স্রোতে নদীর খাড়া পাড় ঘেঁষে নৌকা চালানো কঠিন বলেই শ্রীকান্তকে দাঁড় টানার জন্যে বলেছে ইন্দ্রনাথ। মক্কা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে জেলেদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথ ইন্দ্রনাথ চেনে, যেন তার নিত্যদিনের পথ। কোনক্রমে ধরা পড়ার সম্ভাবনায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ডুব দিয়ে ভাসতে ভাসতে ছয়-সাত ক্রোশ পথ চলে যেতে পারে সে। পরিচিত পরিমণ্ডলে তার নিশ্চিত বিচরণ, দুর্গম যাত্রাপথে শঙ্কাহীন সে। ইন্দ্রনাথের তুলনায় ভীতু ছিল শ্রীকান্ত। ইন্দ্রনাথ শুধু সাহসীই নয়, কুশলীও বটে। কোমরের সঙ্গে নৌকোর রশি বেঁধে আস্তে আস্তে নৌকা টেনে নিয়ে গেছে সে বড় গাঙে। সর্বোপরি নদীর প্রবল স্রোত, নিস্তব্ধ রাতের গাঢ় অন্ধকার, হিংস্র বন্য প্রাণীর উপস্থিতিতে যে প্রতিকূলতার পিচ্ছিল পথ তৈরী হয়েছে, ইন্দ্র তার অভিজ্ঞতা ও কৌশল দিয়ে সেগুলোর মোকাবেলা করেছে অবলীলায়। ইন্দ্র যেন নদী ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বেঁচে থাকা একটি জলজ সত্তা।

কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে নদী তীরবর্তী মানুষের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। নদীভিত্তিক গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা এ বইয়ে দুটি পরিবারের আর্থিক চিত্র উপস্থাপিত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষেতের ফসল ও হালের বলদ হারিয়ে নায়ক লালু আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত । দরিদ্র ও সংগ্রামী লালু অন্যান্য কৃষকের সঙ্গে দক্ষিণে বাদায় ধান কাটতে যায়। কৃষকদের বাদায় যাত্রার মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসে নদীর আগমন। ধান কেটে অর্জিত মজুরিতে সারা বছর সংসার চালানোর ইচ্ছা

---

৬৮. ঐ, পৃ. ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

তার। পরের মৌসুমে ফসল ফলিয়ে সে ফিরিয়ে আনবে নিজের আর্থিক সফলতা। লালুর এই স্বপ্নময়তা ও সংগ্রামশীল অভিযাত্রার মধ্যে প্রেরণা হিসেবে রয়েছে কিশোরী মতি। আশৈশব পরিচিত মতি ও লালু। বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্ক প্রেমে রূপ নেয়। বাখরগঞ্জের বাদায় লালু অজানা আশঙ্কায় অস্থিরচিত্ত হয়ে বাড়ি ফেরে নদীর উজান স্রোত ঠেলে। তার এই উজান বাওয়ার সঙ্গে তার প্রতিকূল জীবন যেন একই সুরে গাঁথা। বাড়ি ফিরে সে জানলো যে, তার অনুপস্থিতিতে ইলিশমারির গৃহস্থ ফটিকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছে মতির। বিয়ের পর মতি বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে জল আনতে নদীর ঘাটে গিয়ে চেয়ে থাকতো চলমান ছোট-বড় নৌকোর দিকে এই ভেবে, যদি তার কোন আত্মীয় খবর নিতে আসে। বলা বাহুল, এ দৃশ্যটি নদীবহুল বাংলাদেশে প্রায় চিরন্তন। পুরুষশাসিত বাংলাদেশের সমাজে প্রায় চিরবন্দিনী নারী বিয়ের পর স্বইচ্ছায় ও চেষ্টায় কখনও পিতৃগৃহে যেতে পারে নি। সে কারণে নদীতীরে তার এই অপেক্ষা। একই ভাবে অপেক্ষমান থেকেছে নব্য প্রেমে অনুপ্রাণিতা তার দয়িতের জন্যে। প্রেমময়ী স্ত্রী অপেক্ষমান থেকেছে বিদেশে অবস্থানরত তার স্বামীর জন্যে। বাবা মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে চিরব্যাকুল কন্যা, প্রবাসী স্বামীর জন্যে উদ্বিগ্ন স্ত্রী এবং প্রেমিকের জন্যে বিরহতাপিত তরুণী বারবার ফিরে এসেছে নদীর তীরে , নদীর ঘাটে। বৈষ্ণব কবিতাসহ অসংখ্য কবিতা ও গানে এই অপেক্ষা ও ব্যাকুলতার মর্মস্পর্শী চিত্র আছে। অসহায় বধূ, প্রোষিতভর্তৃকা এবং প্রেমপীড়িত যুবতী নারীর বহুবার অশ্রু বিসর্জনের সাক্ষী বাংলার নদীসমূহ। তাদের অবরুদ্ধ উদ্বেগ ও বেদনার যেন কিছুটা উপশম ঘটেছে নদী তীরে এসে। নদীই যেন তাদের আশ্রয় ও আশ্বাস। মেয়ের কুশল জানতে মতির মায়ের ব্যাকুলতায় একদিন লালু নদীপথে ইলিশমারির তীরে আসে মতির খবর জানতে। এর মধ্যে ফটিকের মৃত্যু হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে মতি ও লালুর জীবনে শুরু হয় প্রেমের দ্বিতীয় পর্যায়। অন্যদিকে, লালুর মা-ও মৃত্যুর আগে লালু ও মতির মিলন কামনা করে গিয়েছিলো। এ ধরনের সার্বিক অনুকূল পরিস্থিতিতে লালু হয়ে ওঠে দুঃসাহসী। একদিন সে নৌকা নিয়ে মতিকে আনতে বেরিয়ে পড়ে। মতির মামাবাড়ি থেকে তাকে নিয়ে লালু ফিরতি পথে রওয়ানা দেয় নদীপথেই । এ প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর উপন্যাসে লিখেছেন :

> নৌকা ধীরে ধীরে চলিতেছিল ; লালু আর তেমন জোরে জোরে নৌকা চালাইতেছিল না। এখন অনেকক্ষণ পর পর সে দুই একবার বোটে মারিতেছিল, তদ্ভিন্ন প্রায়ই বোটেখানি হালের মত ধরিয়া রাখিয়া তাহার সামনে মতির পানে, জ্যোৎস্না আলোকিত আকাশের

Dhaka University Institutional Repository

> চন্দ্র-তারকার পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। নৌকা হেলিয়া দুলিয়া সামনের পানে চলিয়াছিল। শেষে মাঝে মাঝে লালুর সেই দুই-একবার বোটে মারাও যেন স্থগিত হইয়াছিল। একবার বোটেখানি হালের মত বগলের ভিতরে ধরিয়া পিছনের দিকে ঈষৎ হেলান দিয়া সে বলিতে লাগিল—আর নৌকা বাইতে ইচ্ছা করছে না ... তাহার চোখের সামনের সবকিছু আজ যেন পেলব ঔজ্জ্বল্যে একেবারে লেপিয়া গিয়া অপরূপভাবে ভাসিতেছিল।[৬৯]

দীর্ঘ বিরহের অবসানে প্রশান্ত নদীর বুকে হলো তাদের নিরুপদ্রব সাক্ষাৎ। এ যেন রাধাকৃষ্ণের সম্মিলন। তাদের মিলন হতো সাধারণত কুঞ্জবনে। মতি ও লালুর দেখা হলো নদীবক্ষে। এই মিলনের মধ্যে রয়েছে যেন এক প্রতীকধর্মিতা। এ প্রসঙ্গে রশীদ আল ফারুকীর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> মামার বাড়ি থেকে মতিকে নিয়ে আসার সময় নৌকায় শুধু তারাই ছিলো। লেখক এই দৃশ্য ... রূপকের মাধ্যমেই ... ব্যক্ত করেছেন।[৭০]

নদীর সঙ্গে বাঙালীর নিত্য সম্পর্ক। নদী ও মানব জীবন যেন একই সুতোয় বাঁধা। লালুর বাদায় ধান কাটতে যাওয়া, মতির বিয়ে, তার ফিরে আসা, ইলিশমারির তীরে যাওয়া-আসা, পুটির বিয়ে, মতির মামার বাড়ি যাওয়া, আবার তার ফিরে আসা ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড জীবন চিত্রের সঙ্গে নদীর অনিবার্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে নদী যেন পালন করেছে এক সর্বাত্মক ভূমিকা।

---

৬৯. নুরুল আমিন, কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২০৭-২০৮
৭০. রশীদ আল ফারুকী, বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

জীবনচিত্র : পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) 'দিবারাত্রির কাব্য'(১৯৩৫), 'জননী' (১৯৩৫) ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র (১৯৩৬) পর লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) । উক্ত তিন উপন্যাসে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র উপস্থাপিত। 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রধানত অন্ত্যজ শ্রেণীর কাহিনী। এ উপন্যাসে সামন্ত অবশেষ হলো মেজকর্তা। হোসেন মিয়া ধূর্ত ব্যবসায়ী এবং রহস্যময় উপনিবেশবাদী হয়েও কেতুপুরের মাঝিদের মধ্যে মিশে আছে অন্তরঙ্গভাবে। তাদেরই যেন অপরিহার্য অংশ সে। কেতুপুরের অন্য সবাই জেলে সম্প্রাদায়ভুক্ত। তাদের বাস্তব- জীবনই এ উপন্যাসের বিষয়। তাদের সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরালো করে তুলতো। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটুয়ে মানুষের সংস্পর্শে ওই বাস্তবতা উলঙ্গ রূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেতো। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকার, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নীচের তলার মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে। গরীবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করতো–জিজ্ঞাসা জাগতো, তা হলে আসল ব্যাপারটা কি ? [১]

বঞ্চিত অন্ত্যজদের জীবন উপন্যাসে রূপায়িত করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। মানুষের জীবন আসলে কেমন; অর্থ, ক্ষমতা ও যৌনাকাঙ্ক্ষা কি ভাবে পরিচালিত ও তাড়িত করে মানুষকে, শ্রেণী সংগ্রামের আসল রূপই বা কি, জীবন সংগ্রামে রত নরনারীর আশা

---

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য করার আগে, মানিক গ্রন্থাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা,১৯৭৫, পৃ. ৫৫৩ - ৫৫৪

Dhaka University Institutional Repository

নিরাশা, আনন্দ-বেদনার আসল ছবিটি কেমন দেখায়, এ সবই ছিল তাঁর অনুসন্ধিৎসার মূল লক্ষ্য। তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা তাঁর জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। দারিদ্র্য ও দুর্দশা ছিল তাঁর নিত্য সহচর। ফলে অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁকে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় নি। এ প্রসঙ্গে একজন আলোচক বলেছেন :

> তিনি জীবনের যে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন তা যেমন নির্মম, তেমনি করুণ (এখানে করুণের অর্থ সুলভ ভাবালুতা নয়), যেমন তির্যক তেমনি বিষণ্ণ। জীবিকার সংগ্রাম ও আত্মার সংগ্রাম পাশাপাশি চলেছে। প্রথমটির ফল প্রত্যক্ষ –দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ও ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের অকাল অবসান।[২]

একই সঙ্গে তাঁর রচনা যেন হয় শিল্পোত্তীর্ণ, সে ব্যাপারেও তিনি সর্তক ও যত্নশীল। উপন্যাসটির শিল্পসাফল্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে পিয়ের ফালোঁ এস. জে. মন্তব্য করেছেন :

> সাধারণ মানুষের আদিম ও অমার্জিত অসামাজিক মানবতা, অশিক্ষিত ও কষ্টনিপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয় বেদনা ও গভীরতম প্রবৃত্তির অশান্ত সংঘাত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ জীবন পরিধির মধ্যেও অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরদেশের অনিবার্য আকর্ষণ 'পদ্মানদীর মাঝি' বই খানিতে নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেই এই উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকায় সার্থকতা অর্জন করেছে।[৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেক কল্লোলীয় লেখকদের 'জনজীবনবাদ অন্য দিক থেকে যত অর্থবহই হোক না কেন কতকটা সাহিত্যিক বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তা অবশ্য পরবর্তীকালে জীবন সত্যে পরিণত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতির লেখায়।'[৪] অবশ্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কল্লোলেরই কুলবর্ধন' বললেও স্বীকার করেছেন যে, "মাণিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে "কল্লোল" ডিঙিয়ে "বিচিত্রায়" চলে এসেছে-পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়।"[৫] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে, 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকা দুটো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এসেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবু তাঁকে কেউ কেউ কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক হিসাবে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ বিষয়ে একজন

---

২. মানিক গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, আলোচনা ও গ্রন্থ-পরিচয়, মন ও শিল্প: রথীন্দ্রনাথ রায়, কলকাতা, ১৩৭০, পৃ. খ-গ
৩. বিশ্বনাথ দে, মানিক বিচিত্রা, (সম্পা.), কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৭২-৭৩
৪. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কল্লোলের কাল, কলকাতা, প্রথম দে'জ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ. ১৪৬
৫. মানিক গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, পূর্বোক্ত, পৃ. ঘ

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচকের বক্তব্য বিবেচনায় আনা চলে :

> তাঁর কল্লোল ও কালিকলমে কোন গল্প-উপন্যাস লেখার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কল্লোল বন্ধ হয়ে গেলেই যে তার ধর্ম ও প্রভাব রুদ্ধ হয়ে যাবে, মুছে যাবে--এ রকম কোন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন কোন কালেই ঘটে না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও ঘটে নি। তাই তিনি লেখক হিসাবে কল্লোলের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে কিছুটা চিহ্নিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এসব সময়েরই স্বভাব!
>
> অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে বলেছেন 'কল্লোলের কুলবর্ধন', বুদ্ধদেব বসুর মতে তিনি 'belated Kallolean', তাঁর রচনা বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিতে 'of Kallol spirit ', কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় কল্লোলীয় আদর্শ গৃহীত হয়েছে সংযমে, শাসনে, চিন্তার গভীরে। এই বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে কার্যকরী থেকেছে।[৬]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর মাঝিতে 'জীবন সত্য'ই অংকিত করতে চেয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য। পুরুষাণুক্রমে এ রকম ক্ষুদ্র পরিসরে বসবাসের ফলে অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে গেছে কেতুপুর গ্রামের জেলে পল্লী। তাদের জীবন প্রণালীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেখানকার ভৌগোলিক, পারিবেশিক ব্যবস্থাও । তাদের এ সমাজ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন :

> পূর্বদিকে গ্রামের বাইরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই কিন্তু জেলে পাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূ-স্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলে পাড়াটি হইয়াছে জমজমাট। ...জেলে পাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোন দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজো কোনদিন সাঙ্গ হয় না । এ-দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ও দিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে,

---

৬. ধীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোট গল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

> শীতের আঘাত হাড়ে গিয়ে বাজে কনকন। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়।[৭]

এ পরিবেশ পরিসরে দীর্ঘন দিনে যে সমাজ গড়ে উঠেছে, সে সমাজের প্রতীক কুবেররা। এখানে অন্য দশ জনের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অন্যদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, ভালোবাসা-ঘৃণা, প্রভৃতি এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই তাদের পক্ষে। তারা সবাই একই জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। চরম দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধেও তাদের সংগ্রাম করতে হয় প্রতিনিয়ত। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে মানুষ উভয়ের সঙ্গেই এই অন্ত্যজ মানুষগুলির সংগ্রাম।[৮]

বছরের কোন না কোন সময় বন্যায় ভেসে যায় গ্রামের পর গ্রাম। দু একটি উঁচু রাস্তা ছাড়া সবই চলে যায় পানির নীচে। প্রকৃতির অব্যাহত বৈরিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল কুবের যেন কেতুপুরের জেলেদের বেঁচে থাকার যে সংগ্রাম তারই প্রতীক। প্রকৃতপক্ষে, কুবেরের বাহ্যিক আচরণ, তার মনোজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর সাহায্যে কেতুপুরের জেলেদের জীবনধারাই যেন লেখক প্রকাশ করেছেন। তাদের জীবন-সংগ্রাম চলে পদ্মার বুকে। জেলেপাড়ার লোকজন জীবিকার জন্যে পদ্মায় মাছ ধরে। তাদের কেউ কেউ নৌকার মাঝি। অনেকে মানুষ ও মালামাল পারাপার করে তাদের নৌকোয়। কুবের, ধনঞ্জয় ও গণেশ ভরা পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরে। তিনজন একত্রে মাছ ধরলেও অর্জিত অর্থের ভাগে রয়ে যায় তারতম্য। নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয়। সে জন্যে সে শ্রম দেয় কম এবং প্রাপ্ত অর্থের ভাগও নেয় অর্ধেক। সারারাত ঠাণ্ডা বাতাসে অশান্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে থেকে নির্ঘুম কুবের ও গণেশ মাছ ধরে। অথচ নৌকা ও জালের মালিক বলেই ধনঞ্জয় এ সুবিধা নেয়। এর ফলে শোষিত হয় কুবের ও গণেশ। নদীতে মাছ ধরার কৌশল সম্পর্কে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বাস্তবসম্মত :

> গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মত দুটি বাঁশে-বাঁধা জাল লাগে। দড়ি ধরিয়া বাঁশের ঠোঁটে—হাঁ করা জাল নামাইয়া দেওয়া হয়। মাছ পড়িলে খবর আসে জেলের হাতের দড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারাই জলের নীচে জালের মুখ বন্ধ করা হয়।[৯]

অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় করে কঠিন ধৈর্যের ও সাহসের সঙ্গে মাছ ধরে কুবের। কিন্তু সারা বছর নদীতে এক হারে মাছ পাওয়া যায় না। মৌসুমের শেষে নদীতে মাছ কমে যায়, তখন যে মাছ

---

৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, কলকাতা, ১৩৭০, পৃ. ১০-১১

৮. অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৭৩

৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় তার আয়ে এক জনেরই সংসার চলে না। সে অভাব মোকাবেলা করার জন্যে একটু সচ্ছলতার লক্ষ্যে নগদ টাকায় অন্যের পুকুর কিনে রাখে কুবের। মৌসুমের শেষে যখন মাছের আকাল পড়ে, তখন এ পুকুরগুলোই তার ভরসা। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুর কিনতে না পারায় কুবের চিন্তিত। কারণ, সারা বছর সংসার চালানোর জন্যে কেবল পদ্মার ওপর নির্ভর করা কঠিন। ভরা মৌসুমে অধিক শ্রম দিয়ে বেশি মাছ পেয়েও কুবেরের লাভ হয় না। প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় মাছের দর কমিয়ে দেয় আড়ৎদাররা। আড়ৎদারদের কৌশলের কাছে পরাস্ত জেলেরা বাধ্য হয় কম দামে মাছ বিক্রি করতে । তাই হতাশ কুবেরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'হালার মাছ ধইরা জুত নাই'।[১০] সারা বছরের অভাব থেকে কিছুটা হলেও মুক্তির জন্যে সে গোপনে মাছ বিক্রি করে শেতলবাবুর কাছে। কিন্তু শেতলবাবুও কুবেরের এই দুর্বলতার সুযোগ নেয়। সে কুবেরকে মাছের দাম না দিয়ে হয়রানি করতে থাকে দিনের পর দিন। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> এ সরল জেলেদের শোষণ করে সবাই। জমিদার তার নায়েব-গোমস্তা এমনকি জেলে সমাজেই যারা একটু অবস্থাপন্ন তারাও বাদ যায় না। জমিদারের কর্মচারী তাদের কাছ থেকে ধারে মাছ কিনে নিয়মিত ধার শোধ করতে চায় না। অথচ রক্ষিতার জন্য তার খরচের হাত দরাজ।[১১]

বস্তুত, প্রত্যেকেই ঠকায় কুবেরকে, ধনঞ্জয় খুড়োও তাকে ঠকায়। ধনঞ্জয় গণেশকে চিড়া আনতে পাঠিয়ে গোপনে আড়ৎদারদের মাছ দিয়েছে। সে মাছের হিসাব কুবের ও গণেশ কখনও পায় না। কুবের ব্যাপারটি কিছুটা ধারণা করতে পারে ; কিন্তু এ বিষয়ে সে খুড়োকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। আনুমানিক চার শ মাছের জায়গায় খুড়ো হিসাব দেখায় দু শ সাতান্নটির। খুড়োকে কুবের চোর বলতে পারে নি। তাই সে মাছ কম হওয়ার দোষ চাপিয়েছে চালান বাবুর ওপর। পর্যায়ক্রমে কুবেরের ঠকে যাওয়া প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন :

> গরিবের মধ্যে সে গরিব ; ছোট লোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক। এমন ভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে সে। প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।[১২]

---

১০. ঐ, পৃ. ৩

১১. ভূঁইয়া ইকবাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১১

১২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

সব কিছুতেই অধিকারহারা সে যেন সামান্যতম আত্মমর্যাদারও দাবিদার নয়। এ কারণেই, তার প্রতিবেশী নকুল নির্লজ্জ ব্যবহার করতে পেরেছে তার সঙ্গে। ছেলে জন্ম হওয়া প্রসঙ্গে নকুল বলেছে :

> তুই তো দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা ? ঘরে ত থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।[১৩]

নকুলের এমন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক মান ও রুচি বোধগম্য। তবে, এ ধরনের নিম্নরুচির ঠাট্টা ভদ্র সমাজেও প্রচলিত। নিন্দার প্রতি প্রায় সব শ্রেণীর মানুষেরই কম বেশী আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। ফলে, কুবেরের জন্যে এই নিন্দা ছিল অনিবার্য ; বিশেষ করে যখন মেজকর্তার সঙ্গে মালার সম্পর্ক আছে বলে অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা চলে :

> নদীর তীরে নিয়ত ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বলেই এদের জীবন যাত্রার ভঙ্গিটি নিতান্ত আদিম। সুখ-দুঃখের অনুভূতি মোটা দাগে চিহ্নিত। তাই কুবেরের সন্তান লাভ এবং সেই সন্তানের অস্বাভাবিক বর্ণলালিত্য দেখে নকুল শয়তানির হাসি হাসে।[১৪]

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে পুত্র লাভের সংবাদেও কুবের আনন্দিত হতে পারে না। কারণ তার জীবনে চরম সত্য হলো নগ্ন ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য। কুবেরের অভাবগ্রস্ত জীবনের বাস্তব প্রমাণ মেলে মালার আঁতুড় ঘরের দিকে তাকালে। এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন :

> বেড়া-দেওয়া ছোট একটি উঠানের দুদিকে দুখানা ঘর, কুবেরের বাড়ির এর বেশী পরিচয় নাই। এ দিকের ঘরের সঙ্কীর্ণ দাওয়া একটা ছেঁড়া মাদুর চট প্রভৃতি দিয়া ঘেরিয়া লওয়া হইয়াছে। চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় ওটি আঁতুড়ঘর। কারণ চটের ফাঁক দিয়া ভিতরে শায়িতা মালাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।[১৫]

অর্থের অভাবেই আলাদা আঁতুড়ঘর তৈরি করে দিতে পারে নি কুবের। এমন কি ছনের অভাবে ছিদ্র হয়ে যাওয়া চালও মেরামত করতে পারে নি সে। ফলে ঘরের সব কিছুই ভিজে যায় বৃষ্টিতে। উঠোনে জমে কাদা। বৃষ্টিতে ভেজা মাটি ও কাদাতেই চলতে থাকে তাদের জন্ম-মৃত্যুর পালা।

নিত্য অভাবের এ কেতুপুরে একমাত্র আনন্দ উৎসব রথের মেলা। জীবন ধারণের জন্যে সব সময়ই কাজে নিয়োজিত থাকে কেতুপুরবাসীরা। সে কারণে উৎসবে আগ্রহী হওয়ার অবকাশও

---

১৩. ঐ, পৃ. ১৩
১৪. অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
১৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কম। অবশ্য প্রতি বছর রথের মেলাই তাদের সবার জন্যে হয়ে ওঠে একমাত্র আকর্ষণ। মেলাকে কেন্দ্র করে তারা সারা বছর টাকা জমায় এবং সে টাকা আনন্দে মেলাতেই খরচ করে। মেলাতে নানা ঘটনা ঘটে। অপরিণামদর্শী এক যুবক বালা খেলায় সব টাকা হেরে গিয়ে বিষণ্ন মনে বাড়ি ফেরে। সে ভুলে যায় তার সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর জন্যে টাকা খরচের কথা। গ্রামের বৌ-ঝিদেরও শাঁখা চুড়ি কিনে সাধ মেটাবার সুযোগ ঘটে এ মেলাতে। কেনা-বেচা এক দিনের জন্যে হলেও জমে ওঠে ব্যবসা। গ্রামেরই সাধারণ মানুষেরা এ জাতীয় মেলায় কেনা-বেচা করে। মেলার কারণে ঘটে স্থানীয় মানুষদের সমাবেশ। ফলে, পরস্পরের সঙ্গে দেখাশোনার একটি সুযোগ ঘটে। এ ধরনের মেলায় একটি অঞ্চলের লোক সংস্কৃতির চিত্রও পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থারও কিছু চিত্র মেলে এ সব মেলায়। স্থানীয় জীবনাচরণের আভাসও মেলে এখানে। বস্তুত, একটি জেলেগোষ্ঠীর তথা অন্ত্যজ শ্রেণীর সংস্কৃতি ও তার রূপায়ণ নিষ্ঠার সঙ্গেই চিত্রিত করা হয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে।[১৬]

প্রায় প্রতি বছরই মেলার সময় বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পানিতে কুবেরের স্ত্রী মালার আঁতুড় ঘর ভেসে যায়। স্ত্রীর এ দুঃসময়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বৃষ্টির পানি থেকে মালাকে রক্ষা করতে পারে নি কুবের। স্ত্রীর ব্যাপারে সে দায়িত্বশীল, নিষ্ঠাবান। দেবীগঞ্জের রেল কোম্পানীর কয়লাও সে চুরি করে এনেছে। ভেবেছে, হিরু জ্যাঠার কাছে ছন ধার চাইবে। কিন্তু সে আপন ভাইপোকে চালও ধার দেয় না দেখে কুবের বুঝতে পারে, তার কাছে ছন ধার চাওয়া না চাওয়া সমান। এমন দুর্যোগে সে সহায় হিসেবে খুঁজে পেয়েছে হোসেন মিয়াকে। আগে জানলে মালা কলকাতা থেকে হোসেন মিয়াকে এক পয়সার সুঁই আনতে বলতো। কারণ, সেখানে এক পয়সায় দশটি সুঁই পাওয়া যায়। সংসারের এ তুচ্ছ অথচ অনিবার্য প্রয়োজনটিও লেখকের চোখ এড়িয়ে যায় নি।

রথের মেলায় যাওয়ার জন্যে নদীপথই একমাত্র অবলম্বন। মেলায় বহু মানুষের সমাগম ঘটে, ফলে নৌকার চাহিদা বেড়ে যায়। এ সুযোগ আর্থিকভাবে ব্যবহার করার জন্যে কুবের ও গণেশ তাদের নৌকায় যাত্রী বহনে লিপ্ত হয়।

নোয়াখালির হোসেন মিয়া কেতুপুরে এসে প্রথমে জহর মাঝির নৌকা চালাত। কিন্তু সে আজ দরিদ্রতা থেকে মুক্ত, অর্জন করেছে অর্থ-সম্পদ। কেতুপুরের সব মানুষের প্রতি রয়েছে তার দরদ। তাদের সব রকমের অভাব-অভিযোগে সাড়া দেয় সে। সবাই তাকে মান্যও করে। হোসেন মিয়াই

---

১৬. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্ত্যজ সংস্কৃতি: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ সাহিত্য ও রাজনীতিতে, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

কুবেরকে ছন দেয়ার কথা বলে কলকাতা গিয়েছিল। কেতুপুরবাসীর প্রতি উদার হোসেন মিয়ার অর্থ সম্পদ গড়ার গোপন রহস্যের কথা তাদের অনেকেই জানে, কিন্তু মুখে কেউ রা করে না। হোসেন মিয়া একদিকে লোক পাঠায় তার ময়নাদ্বীপে, অন্যদিকে সে লিপ্ত থাকে আফিমের অবৈধ চোরাচালানে। বলা বাহুল্য, হোসেন মিয়া নিজ স্বার্থেই কেতুপুরের দরিদ্র মাঝিদের সাহায্য করে। তার পাতা জাল কেউ এড়িয়ে যায় এমন কোন সুযোগও সে রাখে না। হোসেন মিয়া ও ময়নাদ্বীপ সম্পর্কে দরিদ্র জেলেদের অনাগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কঠোর দারিদ্র্যের কারণে বাধ্য হয়ে তাদের অনেকেই পরিবার পরিজনসহ ময়নাদ্বীপে যায়। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অনেকেই আর ফিরে আসতে পারে না। এ ভাবেই নিখোঁজ হয় কেতুপুরের তিনটি পরিবার। এই ভয়াবহ তথ্য জানার পরও কেতুপুরবাসীরা যে কত অসহায় সেটাই জানিয়েছেন লেখক :

> মনুষ্য-বাসের অযোগ্য সেই দ্বীপকে জনপদে পরিণত করার আহ্বান আসিলে যতদিন পারে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিবে। যেদিন পারিবে না সেদিন স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে হোসেন মিয়ার নৌকায় গিয়া উঠিবে।[১৭]

মাছের মৌসুম শেষে কুবেরের আয় বন্ধ। সংসারে শিশুসন্তান নিয়ে মালা নানা সমস্যায় পীড়িত। অভাবের সংসারে অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত কুবের ভুলে গেছে হোসেন মিয়ার প্রতি তার বিদ্বেষ। আগে কুবের হোসেন মিয়ার সাহায্য পর্যন্ত গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিল এবং শঙ্কিত হয়ে উঠত আসন্ন বিপদের আশঙ্কায়। কিন্তু অনিবার্য পরিস্থিতির কারণেই পরিবর্তন ঘটেছে তার মনে। পরিণামে, সে-ই বরং হোসেন মিয়ার সাহায্য পেতে হয়েছে উদগ্রীব। 'যেন জাগতিক পরিস্থিতিই মানুষের চালক এবং শক্তি দায়ক।'[১৮] অন্য দিকে রাসু ময়নাদ্বীপ থেকে নগ্ন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছে। বিদেশী কাঁঠাল ব্যবসায়ীর নৌকা থেকে রাসু অভ্যস্ত ভঙ্গি ও শব্দে কেতুপুরের মাঝিদের ডাকতে থাকে। এ ভাষা পদ্মার মাঝিদের নিজস্ব। সে ভাষায় কথা নেই, আছে শুধু ভাসমান শব্দ। সে শব্দ বাতাসে ভেসে ভেসে বিলীন হয় ; কিন্তু সে শব্দ অন্য মাঝিরা শুনে ঠিকই বুঝে নেয় তার কথা। পদ্মার মাঝিরা একে অন্যের সহায়ক। পদ্মায় বিপদে বা সমস্যায় পড়লে কোন মাঝিকে অন্য কোন মাঝির অবহেলা করার নিয়ম নেই। পদ্মায় মাছ ধরতে গিয়ে কুবের, গণেশ, ধনঞ্জয় রাসুকে অন্য ব্যবসায়ীর নৌকা থেকে উদ্ধার করে। রাসুকে পেয়ে কুবের, গণেশ ও ধনঞ্জয় তার প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করে এবং সেদিন আর মাছ না ধরে বাড়ি চলে আসে। রাসুর শরীরে অনেক ক্ষতচিহ্ন। কোন কোন ঘা তখনও শুকায় নি। দু হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের গোড়ালি

---

১৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

১৮. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত ফুলে গেছে। পায়ের চামড়া আলগা হয়ে শুকিয়ে হয়েছে শক্ত এবং তা বৃষ্টি ভেজা জুতোর চামড়ার মতো স্যাঁতসেঁতে। গ্রামের মানুষেরা তাকে দেখে হয় বিস্মিত। ডুকরে কেঁদে ওঠে রাসুর মামা পীতম মাঝি। মৃতপ্রায় রাসুকে দেখে কেতুপুরের হিন্দু-মুসলমান সবাই কষ্ট পায়। তারা আশঙ্কা করে, প্রলোভন দেখিয়ে হোসেন মিয়া রাসুকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ময়নাদ্বীপ নিয়ে হত্যা করেছে রাসু বাদে অন্যদের। সবার চোখে হোসেন মিয়া তাই খুনী। কেতুপুরের সবাই এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। এক সময় তার বিচারের জন্যে সবাই উপস্থিত হয় পীতমের ঘরে। কিন্তু হোসেন মিয়ার বিচার করার ক্ষমতা কেতুপুরে কারও নেই। সে ধনবান ও শক্তিশালী এবং একই সঙ্গে জেলেপাড়ার মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সে সরাসরি জড়িত। তার সাহায্যের ওপর জেলে পাড়ার মানুষেরা এমনভাবে নির্ভরশীল যে, ন্যায়-অন্যায় সে যা-ই করুক না কেন, কোন ভাবেই তার বিরুদ্ধে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে, সে মেজকর্তার মতো তাদের সমাজ বর্হিভূত, ধরা ছোঁয়ার নাগালের বাইরের কেউ নয়। সে বরং প্রতিষ্ঠিত তাদের মাঝখানেই। টাকা ধার দিয়ে, ক্ষেত্র বিশেষে অনুকম্পা করে তাদের প্রভাবিত করেছে, তাদের জীবনকে যেন নিয়ে গেছে তাদেরই স্বপ্ন বাস্তবায়নের অনুকূলে। এ সব কারণেই, উপস্থিত কেউ-ই স্পষ্ট করে তার বিচার দাবি করতে পারে না। বরং সমাজের অভ্যন্তরের অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নকুল। পীতমের মেয়ে যুগী সমাজ-শৃঙ্খলা ভেঙে পাড়ার একপ্রান্তে ঘর তুলে মেজকর্তার মুহুরীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করছে। যুগীর জীবন-যাপন সমাজ-অস্বীকৃত—এই বিষয়টিই হয়ে ওঠে যেন বৈঠকের মূল বিষয়। মুহুরীর সঙ্গে যুগীর বসবাস করার ক্ষেত্রে নৈতিক চেতনার ঘাটতি যে রূপ সত্য, সে রূপই সত্য তার সচ্ছল জীবন-যাপনের অভিলাষ তথা যৌনজীবন সম্ভোগের বাস্তব ও সঙ্গত বাসনা। এই বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত মুহুরীর পেছনের শক্তি মেজকর্তা। ফলে যুগীর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সাহস হয় না তাদের। একজন সমালোচক অবশ্য এ ক্ষেত্রে যৌনাকর্ষণের শক্তিশালী ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন :

> যৌন জীবন যে মানুষের অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপের উপরও প্রভাব বিস্তার করে তারই বিচিত্র চিত্র পদ্মানদীর মাঝি।[১৯]

এক অর্থে অব্যাহত অসহনীয়, সীমাহীন দারিদ্র্যই হরণ করেছে তাদের নীতি-নৈতিকতা ; অন্য দিকে এ দারিদ্র্যই সবচেয়ে বড় সেতুবন্ধন হয়ে দাঁড়িয়েছে কেতুপুরবাসী হিন্দু-মুসলমানের জন্যে। সে কারণেই, কুবেরের সঙ্গে সিধু-আমিনুদ্দির আবার আমিনুদ্দির সঙ্গে জহরের বিবাদ

---

১৯. অচ্যুত গোস্বামী, বাংলা উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৩৯৮

গালাগালি হাতাহাতির মধ্যেই শেষ হয়। দারিদ্র্যজনিত অসহায়তার সুযোগ নিয়ে হোসেন মিয়া রাসুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পেরেছে সহজেই। ঝামেলামুক্ত ভাবে। সে রাসুকে বুঝে নিতে বলেছে তার পাওনা। রাসুর ব্যাপারে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে হোসেন মিয়া চলে গেছে কুবেরের সঙ্গে। তার বাসাতেই সে রাত্রি যাপন করেছে। রাতে ঘুমিয়ে থাকা হোসেন মিয়ার ব্যাগ থেকে কুবের সিকি-আধুলি চুরি করে তার নীতিভ্রষ্টতার পরিচয় দিয়েছে। নগ্ন অভাবের কারণেই এ রকম অন্যায় কাজে সে প্রলুব্ধ হয়েছে। একই সাথে লক্ষ্যযোগ্য যে, সিকি-আধুলি ছাড়া বেশি কিছু চুরি করতে চায় নি কুবের। এত কম তাদের চাহিদা ! অন্য দিকে, এত কম তাদের সাহস! কুবেরের বাসায় একজন মুসলমানের এক রাত অবস্থান তাদের ধর্মীয় সহনশীলতার প্রমাণ। হোসেন মিয়ার পানি খাওয়ার ঘটি বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পবিত্র করে নেয় গোপী। অবশ্য হোসেন মিয়া ব্যবহৃত ঘরটি আর ধোওয়া সম্ভব হয় নি। দরিদ্র কুবেরের সংসারে এক রাত থাকার সময় হোসেন মিয়া তার অতীতের দরিদ্র জীবনের কথা স্মরণ করে। তখন সে গান বাঁধত, আজও সে গান বেঁধে শোনায় কুবেরকে। হোসেন মিয়ার বাঁধা গানটি এ রকম :

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা অকাল ফসল রোও
...
মিয়া কত ঘুমাইবা।[২০]

হোসেন মিয়ার সৃষ্ট ঐ কাব্যময় পরিবেশে হোসেন মিয়া একজন শিল্পী হলেও, তার বাসনা সুদূরপ্রসারী। অভাবগ্রস্ত সেই জনগোষ্ঠীকে হোসেন মিয়া তার নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে নিয়ে যেতে চায় চিরকালের জন্যে। সেখানে সে রাজার মতো একচ্ছত্র রাজত্ব করতে প্রয়াসী। দারিদ্র্য কুবেরকে কুশলী করে তুলছে। এগার বছর বয়সী মেয়ে গোপীকে সে চালাতে চেয়েছে নয় বছরের বলে। সে জানে, বয়স কম হলে পাত্রের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয় মেয়েরা। গোপীর প্রতি যুগলের আগ্রহ দেখে কুবের তাকে দু তিন কুড়ি টাকা পণ দেওয়ার কথা বলেছে। তাদের সমাজে মেয়ের মুখচ্ছবি নিখুঁত হলে চার পাঁচ কুড়ি টাকাও পণ পাওয়া যায়। কুবের ভাবে, প্রাপ্ত পণের টাকা সংসারের অভাব মেটাবে। বিয়ে প্রসঙ্গে যুগলের ভাবনা ভিন্ন রকম। সে বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে করে নি। বোনের বিয়েতে পাওয়া তেইশ টাকার সঙ্গে যুক্ত করেছে তার নিজের আয় করা কিছু টাকা। সেগুলো দিয়ে যুগল একটি বড় নৌকা কিনেছে, নৌকার ভাড়া থেকে অর্জিত অর্থে

২০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছে যুগল। সে জেলে সমাজের সন্তান হয়েও ভিন্ন একটি সৃষ্টিধর্মী চেতনায় গড়তে চায় নিজের ভবিষ্যৎ। কুবের ও মালা শুধু পণের টাকার জন্যেই আগ্রহী নয়। মেয়ের বিয়ে নিয়েও তারা ভাবিত। বিয়ের বয়সী মেয়ে নিয়ে মা-বাবা হিসেবে তারা খুবই উদ্বিগ্ন। গোপীর বয়স বেড়ে যাচ্ছে দেখে লোকনিন্দার ভয় পেয়ে বসেছে মালা ও কুবেরকে। গণেশ তার শালা যুগলের জন্য গোপীকে বউ করতে আগ্রহী ; কিন্তু তার ভয় পাছে গোপীও মালার মতো পঙ্গু হয়ে যায়। গণেশের এই নির্বুদ্ধিতার জন্যে যুগল ও গোপীর বিয়ের সিদ্ধান্ত পাকা হতে পারে নি। অন্য দিকে, রাসু গোপীর রূপে মুগ্ধ। সে নকুলের মাধ্যমে গোপীর নামে কানকথা বলতে শুরু করে। এ ধরনের নীচুতা আমাদের সমাজে প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করা যায়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল রাসু গোপীকে বিয়ে করতে চায় শুনে মালা বাস্তব বুদ্ধি থেকে মন্তব্য করে, 'চালচুলা নাই'।[২১] মালার এ উক্তি রাসুর প্রতি কটাক্ষ নয়, বরং মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তার পরিচায়ক। মালা মা ও নারী হিসেবে মমতাময়ী। সে সবার জন্য দরদ অনুভব করে। স্বামী-সন্তান, মা-বাবা, বোন সবার জন্যে তার মন কাঁদে। তার বাপের বাড়ি চরডাঙার গ্রামগুলো বন্যায় ভেসে গেছে। তাই সে বাপ-ভাইয়ের জন্যে চিন্তিত। কোমল-প্রাণ নারী মালা স্বামী কুবেরকে বার বার অনুরোধ করে পাঠায় সেখানে। চরডাঙার মানুষ, গরু-বাছুর কারও দুর্ভোগের শেষ নেই। মানুষেরা ঘরের চালে গাছের ডালে মাচা বেঁধে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু তাই নয়, বন্যায় ক্ষেতের পাটও নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে পাট নির্ভর বৈকুণ্ঠ হয়ে যায় বিপর্যস্ত। অন্য দিকে তার মজুত করা পাটও নিয়ে গেছে চোরে। ফলে কুবেরের শ্বশুর বৈকুণ্ঠ পড়েছে ভীষণ বিপদে। তার এই বিপদে কিছুটা সাহায্য করার জন্যে কুবের তার শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানরত শালী কপিলা ও অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের নৌকায় করে নিয়ে আসে কেতুপুরে। কুবেরের নিজের রয়েছে নিত্য অভাব, তার ওপর এত মেহমান বাড়িতে নিয়ে আসার অর্থ বিপদ বাড়িয়ে তোলা। সামনের আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় বৈকুণ্ঠ একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করবে না কুবেরকে। তাই আসন্ন দুর্দিনের কথা উল্লেখ করে সে মালাকে বলেছে :

> স্বামীর দুঃখ না বুঝিয়া যে স্ত্রীলোক বাপ-ভাইয়ের জন্য কাঁদিয়া মরে, হাসিমুখে তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে হয় আখার তলের ছাই। মালা অমন উতলা না হইলে কে যাইত চরডাঙায় ? কে আনিত তাহার ভাই-বোনদের ডাকিয়া।[২২]

জামাইবাবুর সংসারে এসে ক্রমে ক্রমে কপিলা কুবেরের জন্য যেন হয়ে ওঠে অনিবার্য, অপরিহার্য। দুজনের মধ্যে অজান্তেই যেন গড়ে ওঠে একটি সম্পর্ক। এর প্রথম প্রকাশ দেখা যায় নদীর ঘাটে,

---

২১. ঐ, পৃ. ৫৫
২২. ঐ, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

কুবেরকে তার ফেলে আসা তামাক পৌঁছে দেয়ার সময়। কপিলা এখানে কুবেরের সঙ্গে রহস্যময় আচরণ করে, তাতে সে আন্দোলিত হয় এবং বুঝতে পারে মালা ও কপিলার ব্যবধান। মালা পঙ্গু, তাই কখনও হাঁটতে পারে নি। সে কারণে, তার পক্ষে নদীর ঘাটে স্বামীকে তামাক পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় নি। বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য হয়েও দাঁড়ায় না সে। শুধু নদীর ঘাট নয়, ঘরে এসেও কুবের এখন না চাইতেই তার প্রয়োজনীয় সবকিছু হাতের কাছে পায়। এতদিন কপিলার অনুপস্থিতিতে তা ছিল কুবেরের স্বপ্নেরও অতীত । এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন :

> সারারাত্রি পদ্মার বুকে কাটাইয়া আসিয়া এখন সে না চাহিতে পা ধোয়ার জল পায়, পান্তা–ভাতের কাঁসিটির জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে হয় না, খাইয়া উঠিবামাত্র তামাক আসে, প্রস্তুত থাকে তাহার দীনমলিন শয্যা, এবং ফাঁক পাইলেই কোন দিন গোঁফ ধরিয়া টান দিয়া, কোনদিন একটা চিমটি কাটিয়া, হাসি চাপিয়া চোখের পলকে উধাও হইয়া–ঘুম আসিবার আগেই কপিলা তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়।[২৩]

পঙ্গু নারী মালাও তার সবটুকু প্রেম কুবেরকে দিয়েছিল। কিন্তু মালার প্রেমে নেই বৈচিত্র্য। একনিষ্ঠ অথচ বৈচিত্র্যহীন ভালোবাসা নারীর লাস্যময়তার কাছে হতে পারে পরাভূত। বাস্তব কারণেই লীলা ও ছলাকলায় অভ্যস্ত কপিলার প্রতি কুবের হয় মন্ত্রমুগ্ধ। পরিণামে কপিলার কাছে কুবেরের আত্মসমর্পণ ঘটে খুব সহজে। কুবের ও কপিলার যৌন জীবন সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি করেছেন এক মনোরম রহস্যময়তা। কিসের অভাবে ও তাড়নায় কপিলা ঝুঁকে পড়লো কুবেরের দিকে। তার ইতিহাস সবটা বিবৃত করেন নি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি লক্ষ্য করেই একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> প্রবল বিজ্ঞান-দৃষ্টি সত্ত্বেও মানিক মূলত গূঢ় রহস্যময় মনোজীবনের রূপকার।[২৪]

কেতুপুরের দরিদ্র জেলেদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্যজ্ঞানের প্রমাণ মেলে আশ্বিন মাসের প্রচণ্ড ঝড়শেষে। ঝড়ে জেলে পাড়ার অর্ধেক ঘরের চাল উড়ে যায়। কুবেরের ঘরটি পড়ে হুমড়ি খেয়ে। তার মেয়ে গোপীর পায়ে লাগে চোট। সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটে আমিনুদ্দির সংসারে। তার বিপর্যস্ত হওয়ার চিত্র নিম্নরূপ :

> প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরে আমের গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়াইয়া যে ঘরে আমিনুদ্দির বৌ আর ছেলেমেয়ে তিনটে ছিল সেই ঘরখানাকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। আমিনুদ্দির বৌ

---

২৩. ঐ, পৃ. ৬৭

২৪. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, বাংলা কথা সাহিত্য প্রসঙ্গে, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

> থেতলাইয়া মরিয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে, সকালে টানিয়া বাহির করার সময় ছেলেটির প্রাণ ছিল, ঘন্টাখানেক পরে সেও শেষ হইয়া গিয়াছে।[২৫]

ঝড়ের কবলে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে আমিনুদ্দির স্ত্রী-কন্যার পর্দা রক্ষার উচুঁ বেড়া। প্রকৃতির প্রচণ্ডতায় বিলীন হয়ে যায় তার মেয়ে মমিনের সম্ভ্রম রক্ষার সমস্ত প্রয়াস। গ্রামের মানুষের এই দুর্দিনে সবাই সবার সাহায্যে এগিয়ে আসে। অনন্তবাবুর সভাপতিত্বেও সভা করে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে চাঁদা তোলা হয় পঁচিশ টাকা। সঠিক পরিকল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে চাঁদার মাধ্যমে তোলা টাকা সঠিকস ভাবে বিতরণ হতে পারে নি। ফলে, অনন্তবাবুদের সহযোগিতা শেষ পর্যন্ত তেমন কাজে আসে নি। অন্যদিকে, কেতুপুরের জেলেদের কার্যকর সাহায্য করেছে হোসেন মিয়া। সে ক্ষতিগ্রস্তদের বাঁশ, ছন ইত্যাদি সাহায্য দিয়ে, দাঁড়িয়ে থেকে ঘর তৈরি করে দিয়েছে। বিনিময়ে সে প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি দস্তখত নিয়েছে। ঝড়ের কবলে পড়ে আমিনুদ্দি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সে এত বেশি হতাশ হয়েছে যে, সে ঘর তৈরি করতেও আর উৎসাহিত হয় নি। আমিনুদ্দি আর নদীতে মাছ ধরতেও যায় না। কেতুপুরের জেলেদের এই দুর্দিনে হোসেন মিয়াই যেন তাদের প্রধান অবলম্বন। সে গোপীকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু কেতুপুরের নিরক্ষর জেলেরা হাসপাতাল সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না ; কোন মেয়েকে হাসপাতালে নেয়া তাদের কাছে যেন প্রতিমা বিসর্জন দেয়ার মতো ঘটনা। কুবেরের এমন বিপদের দিনে কপিলা তাকে ছেড়ে যায় নি, আমিন বাড়িতে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় কুবেরের সঙ্গেও গিয়েছে কপিলা। রাসু ময়নাদ্বীপ থেকে ফেরার পথে পনের দিন ছিল হাসপাতালে। সে কারণে হাসপাতাল সম্পর্কে তার কমবেশী ধারণা জন্মেছে। রাসু তাই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছে, ডাক্তাররা তাকে অভিভাবক ভেবে বকেছে। গণেশ, যুগল ও রাসু ঘরে ফিরে গেলেও একরাত কুবের ও কপিলা আমিন বাড়ি রয়ে যায়। কপিলার সঙ্গে আমিনবাড়িতে একরাত কাটানোর সময় সামাজিকতার সম্মানের কথা ভেবেছে কুবের। মানসিকভাবে কপিলার ওপর কুবের নির্ভরশীল হলেও লোকনিন্দার ভয় সে উড়িয়ে দিতে পারে নি। উপন্যাসের এক জায়গায় বলা হয়েছে :

> কলঙ্ক কিনিবার সাধ যে কপিলার ষোল আনা দেখা যায় ? কুবের গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। এ তো ভালো কথা নয়। এক বাড়িতে যারা বাস করে, শুধু দুর্নাম কিনিবার জন্য এখানে

---

২৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

তাদের পড়িয়া থাকিবার কোন মানে হয় না। ...কপিলার মন বুঝিবার ক্ষমতা ভগবান কুবেরকে দেন নাই।[২৬]

আমিন বাড়ি রাত কাটানোর সময় দ্বিধাহীন কপিলা রাতে নিজের চাদরটা পুঁটলি করে বালিশের মতো কুবেরের মাথার নীচে দিয়েছে। কপিলার এই মমতাবোধ কুবেরের দুঃখবোধকে করেছে আরও বেশি জাগরিত। কুবের পড়েছে দোটানায় :

এখানে কাঁদিতেছে কপিলা , ওখানে মালাও হয়তো কাঁদিতেছে এখন। পথের দিকে চাহিয়া কত কী হয়তো ভাবিতেছে মালা। আর গোপী কী করিতেছে তা যেন ভাবাও যায় না।[২৭]

জীবনের কঠিন সময়ের মুখোমুখি কুবের ও কপিলা। কপিলার আমিনবাড়ি থেকে যাওয়ায় কুবের তার সম্পর্কে ভিন্ন মনোভাব পোষণ করেছিল। কিন্তু তার কোন ভিত্তি ছিল না। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন নারী মমত্ববোধকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সে কারণে আমিনবাড়ির ভাড়া করা ঘরে রাত কাটাতে গিয়ে যৌনতাকে প্রশ্রয় দেয় নি সে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

'পদ্মানদীর মাঝি'তে মানুষের নগ্ন বর্বরতার চিত্র নেই।[২৮]

কপিলার প্রতি কুবের যে গভীরভাবে আকৃষ্ট তা সে প্রথম তীব্রভাবে বুঝতে পারে শ্যামাদাসের সঙ্গে কপিলার আকুরটাকুর যাওয়ার পর। যখন ফেলে আসা তামাক কেউ আর নৌকায় পৌঁছে দিতে আসে না। তখন কপিলার অনুপস্থিতিতে যে শূন্যতা তৈরি হয় কুবেরের মনে তা পূরণ হয় না কারও দ্বারা। কুবের কপিলার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। যেন একটি শিল্প রচিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে। কোন ধাপে নেই কোন আচমকা আচরণ। হঠকারিতা অথবা নগ্ন অশোভনতা। জীবন যেমন গড়ে উঠে একটি ধারাক্রমে, তেমনই তাদের প্রেম গড়ে উঠেছে স্বাভাবিক যৌন আবেদনের মধ্য দিয়ে। একটি গভীর মমতা ও অনিবার্য টান যৌনতাকে দিয়েছে এক অপরূপ সৌন্দর্য। এ সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

যেমন পদ্মার পটভূমি দিয়ে, তেমনি কুবের-কপিলার ভালোবাসা দিয়ে উপন্যাসে সঞ্চারিত হয় কবিত্বময় সৌন্দর্য।[২৯]

---

২৬. ঐ, পৃ. ৯১
২৭. ঐ, পৃ. ৯৪
২৮. অচ্যুত গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৮
২৯. অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার জালে প্রেমের পথে যেমন, সংসার জীবনেও তেমনি কুবের ক্রমে ক্রমে আটকে গেছে। স্বামীর কাছে কপিলার চলে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট শূন্যতার সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়েছে তার সংসারের অভাব। ইলিশের মৌসুম শেষ। কেতুপুরের জেলেরা যার যেমন সুবিধা তেমনি বেছে নিয়েছে বিকল্প আয়ের পথ। ধনঞ্জয় নিজের নৌকায় নিজেই মাঝি হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু যারা অন্য কাজ সংগ্রহ করতে পারে নি তাদের সমস্যা অনেক। কুবেরের কাজ নেই। বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ায় দুর্ভিক্ষের সমূহ সম্ভাবনা। সে জন্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। বন্যার সময় কুবের আত্মীয়দের জন্যে অর্থ ব্যয় করেছে। ফলে ইলিশের মৌসুমে টাকা জমা করতে পারে নি সে। এটা ছাড়া গোপীর পায়ের সমস্যার কারণে যুগলকে জামাই হিসেবে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে পণ থেকেও টাকা পাওয়ার উপায় নেই। চারদিক থেকে সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ে কুবের । এ অবস্থায় সহায় সম্বলহীন রাসুই যেন গোপীর ভবিষ্যৎ বর। সেও যাতে হাতছাড়া না হয়, সে জন্যে মালা রাসুর সমাদর শুরু করে। এ সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> মালা হঠাৎ রাসুকে বড় খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুগল অবস্থাপন্ন লোক, গোপীর দিকে সে আর ফিরিয়াও চাহিবে না, চালচুলাহীন রাসু হয়তো গোপীকে গ্রহণ করিতে পারে।[৩০]

কিন্তু রাসুর মনেও রয়েছে সন্দেহ, সে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের কাছে গোপীর মচকানো পা সম্পর্কে ভালো কথা শোনে নি। কুবেরের ঘরে-বাইরে চলছে প্রচণ্ড টানাটানি। ভাতের অভাবে না খেয়ে মরার অবস্থা হতে পারে। এ ধরনের মারাত্মক পরিস্থিতিতে কুবের বাধ্য হয়ে হাত বাড়ায় হোসেন মিয়ার দিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও চরম আর্থিক অনটনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

> এক সময় চার পয়সার মুড়ি খেয়ে দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল।[৩১]

লেখকের সে অভিজ্ঞতা কুবেরের অন্নাভাবের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে হয়তো সহায়ক হয়েছে। এ রকম মারাত্মক প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে কুবের পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে হোসেন মিয়ার ওপর। কুবের ও গণেশ হোসেন মিয়ার কাজ করে তাদের আর্থিক সঙ্গতি ফিরিয়ে এনেছে বেশ কিছুটা। পদ্মার অদূরে বন্দরে ব্যবসা আছে হোসেন মিয়ার। সেখানে নৌকা নিয়ে মালামাল পৌঁছে দেয়ার

---

৩০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪
৩১. এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করে তারা। এ জন্যে দিন পনের ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে হবে কুবেরকে। হোসেন মিয়ার কৃপায় কুবের ও গণেশ আর্থিক সচ্ছলতা পেয়ে তাদের জীবনের ভাঙন ঠেকাতে পারলেও রোধ করা যায় নি আমিনুদ্দির জীবনের বিপর্যয়। তার একমাত্র দায়িত্ব মেয়ে মমিনকে বিয়ে দেয়া। এ কাজটিও সে করতে পেরেছে। কিন্তু তারপরও তার পরিস্থিতি বিপর্যয়মুক্ত হয় নি। সে এমনই নিঃস্ব যে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে পাড়ি জমানো ছাড়া তার অন্য উপায় নেই। আমিনুদ্দি তাই তার জীবনকে যেন সমর্পণ করে হোসেন মিয়ার হাতে। অবশ্য তার অন্তরে অপার যে বেদনা তার উপশম হোসেন মিয়ার হাতে নেই। কিন্তু দুঃখ ভুলে থাকার একটি ওষুধই যেন জানা আছে হোসেন মিয়ার :

> এখানে শোকে দুঃখে কাতর হইয়া থাকিবে লোকটা, তার চেয়ে সেখানে গিয়া আবার বিবাহাদি করিয়া ঘর-সংসার করা কি ভাল হইবে না ওর পক্ষে ? ময়নাদ্বীপ কি সে রকম আছে এখন, জঙ্গল সাফ হইয়া এখন সেখানে নগর বসিয়াছে।[৩২]

হোসেন মিয়ার চাকুরিতে কুবের ও গণেশ এক দিকে যেন আনন্দিত, অন্য দিকে তেমনি শঙ্কিত। তারা জানে, হোসেন মিয়ার মতলববাজি কারও জন্যে নিশ্চিত শান্তির ব্যবস্থা করে না। হোসেন মিয়া যে কোন কাজই তাদের দিয়ে করিয়ে নিতে পারে। এমন কি, অন্যায় কাজও। তার সম্পর্কে কুবেরের মনে জমে আছে গভীর সন্দেহ। সে মনে করে, আশ্বিনের ঝড় আসলে কোন ঝড় নয়, তা যেন হোসেন মিয়ার পোষমানা অন্ধকারের ভৌতিক শক্তি। সে শক্তিই যেন আমিনুদ্দির ক্ষতি করেছে, গোপীর পায়ে দিয়েছে আঘাত। তবু কুবের যতই সন্দেহ ও শঙ্কায় থাকুক না কেন, হোসেন মিয়ার এই কাজে এসেই সে দেখেছে অর্থ ও সুখ। দায়িত্বপূর্ণ পাকা মাঝি সে। তার উপর যে কোন দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে হোসেন মিয়া। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসটিতে বলা আছে :

> কলিকাতা হইতে বিড়ির চালান আসিয়াছে, নৌকায় আমিনবাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। সেখানে গিরিধারী সাহার গদিতে খবর দিলে তাহারা মাল নামাইয়া লইয়া যাইবে, তারপর কুবের নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিবে কেতুপুরে। দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নৌকা কেতুপুরেই বাঁধা থাকিবে।[৩৩]

কুবেরের হঠাৎ পাওয়া এ কর্তৃত্বের ব্যাপারে নৌকার অন্য মাঝিরা উদাসীন। তাদের এ মনোভাব যে ঈর্ষাজাত, তা সহজবোধ্য। উদাসীনতা দেখিয়ে এমন কি গণেশও নৌকার বাইরে

---

৩২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯
৩৩. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

রাত কাটিয়েছে। আবার তারাই কেতুপুরের কাছাকাছি এসে হোসেন মিয়াকে দেখে নৌকা চালাতে তৎপরতা দেখায়। অভাবগ্রস্ত কুবের যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই টাকা চুরি করেছে। নৌকার মাঝিদের খরচের জন্যে তিন টাকা থেকে দু আনা চুরি করে বসে সে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বরেছেন :

> খরচের সামান্য পয়সা আত্মসাৎ করতে পারার পূর্বে কুবের ভাবে লোকটা তা হলে সর্বশক্তিমান নয়।[৩৪]

হোসেন মিয়ার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ সম্ভব হলেও, কুবেরের পক্ষে সম্ভব হয় নি তার নিজের সর্বনাশের ব্যাপারে শঙ্কামুক্ত হওয়া। তাই বলা যায় :

> লেখক একটু একটু করে হোসেন মিয়ার সমস্ত বাণিজ্যবৃত্তটাই দেখে নিয়েছেন।[৩৫]

নৈতিকতাকে আড়াল করে হোসেন মিয়ার চোরাকারবারে মাঝি হয়েছে কুবের। সে ভয় পায় পুলিশকে। অবৈধ পণ্য বহনকারী নৌকার মাঝি হিসেবে ধরা পড়লে শাস্তি অনিবার্য--এই ভয়ে ভীত হয়ে কুবের ও গণেশ বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে উলুপীর কাছে অন্য মেয়ের সঙ্গে যুগলের বিয়ের সংবাদে কুবেরের মন ভেঙে যায়। যুগলের বিয়ে নিয়ে উলুপীর কটাক্ষপূর্ণ উক্তির উত্তর দেয় কুবের এই বলে, 'ক্যান যুগাইলা বিনা মানুষ নাই দ্যাশে'।[৩৬] কুবেরের স্বপ্ন ছিল পয়সাওয়ালা ছেলের সঙ্গে মেয়ে গোপীর বিয়ে হবে এবং সে সুখে সংসার করবে। একই সঙ্গে নিজেও পণের টাকায় আর্থিক ভাবে উপকৃত হবে । কিন্তু কুবেরের এই আশা ভেঙে গেল। অন্য দিকে, চাকুরি পেয়েও ভয় তার কাটে না। এই দোটানায় হোসেন মিয়ার চাকুরি ছেড়ে দেয়াও কুবেরের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে শেষ পর্যন্ত কুবের ও গণেশ ময়নাদ্বীপে নৌকা নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়। ময়নাদ্বীপে বসতি গড়বে আমিনুদ্দি ও অন্যান্য কয়েকজন। তাদের দেখতে নদীর ঘাটে এসেছে অনেক মানুষ। আমিনুদ্দির মেয়ে মমিনও বাপকে দেখতে পাগলের মতো ছুটে এসেছে। বাপকে সে যেতে দিতে নারাজ। সে জন্যে, নদীতে ডুবে মরে সে যেন তার মনের দুঃখ দূর করতে চায়। কিন্তু উলুপী তাকে জড়িয়ে ধরে সম্ভাব্য হৃদয় বিদারক ঘটনাটি থামিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে একজন

---

৩৪. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮
৩৫. নারায়ণ চৌধুরী, মানিক সাহিত্য-সমীক্ষা, (সম্পা.), কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১০৪
৩৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচক বলেছেন :

> হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য থাকলেও ছোঁয়াছুঁয়ির বাছ-বিচার আছে। কিন্তু সঙ্কটকালে তারা ভদ্র সমাজের মত এ গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ধরে থাকে না। তখন মুসলমান তরুণীকে অনন্যোপায় হয়ে শুদ্ধ বস্ত্রেই জেলে রমণী জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়।[৩৭]

ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা উপেক্ষা করে উলুপীর এ আচরণ নিতান্তই মানবিক। ময়নাদ্বীপে জনবসতি প্রসারের অনুকূলে হোসেন মিয়া আমিনুদ্দির সঙ্গে নছিবনের বিয়ের ব্যবস্থা করে। এ দম্পতির ভবিষ্যৎ সন্তানই হবে ময়নাদ্বীপের নাগরিক। ময়নাদ্বীপে যাওয়ার সময় পাকা মাঝি হোসেন মিয়া সারারাত হাল ধরে বসে থাকে হাতে কম্পাস নিয়ে। কুয়াশার কারণে এক জায়গায় নৌকার নোঙর ফেলে সবাইকে সে নিজের জীবনের গল্প শোনায়। হোসেন মিয়া ছিল পদ্মার মাঝি। ভয়াল পদ্মার বহু রূপের সঙ্গেই সে পরিচিত। কুয়াশা বা ঝড়-তুফানে কি ভাবে নৌকা চালাতে হয় তা তার জানা আছে ভাল ভাবেই। কুয়াশা কেটে গেলে পরদিন ভোর পর্যন্ত নৌকা চালিয়ে তারা চলে যায় ময়নাদ্বীপ। পদ্মায় নানা প্রতিকূলতা—কখনও প্রবল স্রোত, কখনও ঝড়-তুফান, কখনও কুয়াশা—সকল বাধা অতিক্রম করে নৌকা চালিয়ে গেছে হোসেন মিয়া। তার আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড :

> হোসেন মিয়া যেন পদ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী। পদ্মার প্রতিকূলতাই তার ভূমিকা। পদ্মার তীরবাসী জেলেদের অদৃষ্টের তথা পদ্মার কাছে সমর্পিত ভবিষ্যৎ জীবন যাত্রার পটভূমিকায় হোসেন মিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। সে নিজ ভবিষ্যৎ রচনায় বিশ্বাসী।[৩৮]

কেতুপুরের মানুষেরা এতদিন ময়নাদ্বীপকে জেনে এসেছে রহস্যময় এলাকা হিসেবে। বহুদিন পর সে রাজ্যের রূপ চোখে দেখার সুযোগ ঘটলো কুবের ও গণেশের। বিস্তৃত নদীর মধ্যে জেগে ওঠা এক চরের নাম ময়নাদ্বীপ। লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দ্বীপটি লবণ পানিতে ঘেরা। প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে ঝোপ-জঙ্গল হয়েছে। এ জঙ্গলে রয়েছে সাপ, মশাসহ নানা বন্য প্রাণী। ময়নাদ্বীপের মানুষেরা সাপ ও ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। দ্বীপটির ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের বেঁচে থাকার অনুকূল নয়। জীবন যেন এখানে নিশ্চলতায় বন্দী। সে কারণে, সেখান থেকে পালিয়ে গেছে অনেকে। হোসেন মিয়ার প্রাণপণ চেষ্টায় সেখানে আমিনুদ্দি ও রসুলকে নিয়ে বত্রিশটি পরিবার আসে বসতি স্থাপনের আশায়। কিন্তু, নোনা পানিতে ভালোভাবে ফসল ফলে না।

---

৩৭. ভূঁইয়া ইকবাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৩৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

মূলত, সে কারণেই গড়ে ওঠে না জনবসতি। অথচ, জনবসতি গড়ে তোলার জন্যে হোসেন মিয়ার চেষ্টার অন্ত নেই। সে জন্যে কেতুপুরের দরিদ্র মানুষদের সে দেয় সব ধরনের সাহায্য। রসুলকে সে মুক্ত করে আনে জেল থেকে। আমিনুদ্দিকে দিয়েছে নছিবনের মতো স্ত্রী। তারা ময়নাদ্বীপ পৌঁছেই ঘর পেয়ে যায় এবং জঙ্গল পরিষ্কার করেই জমির মালিকও হয়ে যায়। এ জমির নেই কোন খাজনা। এত সব সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপে মানুষ বাড়াতে চায়। কিন্তু তার এ চেষ্টা সফল হয় না। ময়নাদ্বীপে জীবন-বিরুদ্ধ পরিবেশে অল্প সংখ্যক মানুষের বসতি স্থাপিত হলেও তাদের রয়েছে একটি নিজস্ব সমাজ। তাদের জীবনের মতো সে সমাজ ব্যবস্থাও নড়বড়ে। বিপিণ এখানে হোসেন মিয়ার নির্বাচিত মোড়ল। সে ময়নাদ্বীপের দেখাশুনা করে। দ্বীপের বাসিন্দা এনায়েত সম্পর্কে কিছুদিন থেকে লোকদের মধ্যে গুঞ্জন চলছিল। সে সব ধরনের অন্যায় কাজ করে বেড়ায়। একবার শাস্তি পেয়ে কিছুদিন শান্ত ছিল সে। কিন্তু আবারও বিচার সভা বসেছে তার বিরুদ্ধে। সে বৃদ্ধ বশিরের যুবতী স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এ কারণে তার শাস্তি হলো। কিন্তু আসলে বশিরের স্ত্রীরও সায় ছিলো ঐ সম্পর্ক স্থাপনে। এক রাতে দেখা গেল, গাছে বেঁধে রাখা এনায়েতকে ভাত খাওয়াচ্ছে সে। এ সব জানা আছে হোসেন মিয়া ও কুবেরের। বশির সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। অন্যান্য কারণের মধ্যে সে কারণও বশিরের স্ত্রী আকৃষ্ট এনায়েতের প্রতি। অক্ষম বশির পাঁচ বছরে পারে নি ময়নাদ্বীপে একজন মানুষ বাড়াতে, সেখানে তাই তার থাকার কোন দরকার নেই। এটাই হোসেন মিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি।

কুবেরের ময়নাদ্বীপে অবস্থান কালে রাসু তার সংসারে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। গোপী সম্পর্কে ডাক্তারের কাছে সে শুনেছে আশার বাণী। গোপী হাঁটতে পারবে বলে অধিক পণের টাকা দিতে রাসু নিরুৎসাহিত হয় নি। বরং কুবেরের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। যে ভাবেই হোক পণের টাকা সংগ্রহ করবে রাসু। টাকা না পেলে গোপীকে হারাতে হবে তার। সংসার ও জীবনের প্রতি গভীর আস্থার কারণেই রাসু কুবেরের দেয়া ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব মেনে নেয়।

ময়নাদ্বীপ থেকে ফিরে এসে কুবের পেয়েছে কিছুটা অবসর। এ সময় সে কপিলার কথা ভাবে, এবং নিজেকে তুলনা করে ময়নাদ্বীপের এনায়েতের সঙ্গে। যেন সে এনায়েতের মতোই অবৈধ সম্পর্কে পেতে চায় কপিলাকে। এনায়েতকে কুবের ভাগ্যবান মনে করে। মনে মনে সে হোসেন মিয়াকে যেন বলে, কপিলাকে পেলে স্থায়িভাবে সে-ও যাবে ময়নাদ্বীপ। হোসেন মিয়াও যেন কুবেরকে সায় দেয় : 'হোসেন চিরন্তন হাসি হাসিয়া যেন বলিয়াছে, তাই করুম আইনা দিমু কপিলারে।' [৩৯] কিন্তু কুবের তার মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না কপিলার কাছে। সে কপিলার

৩৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি ভালোবাসা লুকিয়ে রেখে সুবচনীর হাটে আসার কথা বলে। কিন্তু কুবের জানে না সুবচনীর হাট বসে সপ্তাহে কোন দিনটিতে। আজ যে হাটের দিন নয়, এ কথা কপিলার মুখে শুনে কুবেরের মুখ সাদা হয়ে যায়। কুবের কপিলার প্রেমমুগ্ধ, সে ভুলেছে মালার একনিষ্ঠ প্রেমের মাধুর্য। কুবেরের মনের এই রহস্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে একজন সমালোচক বলেছেন :

> মানিক বাবুর বিষয় যেহেতু মানুষের মন, সেই হেতু ঘটনার প্রোজ্জ্বল রঙ-চড়ানোর বর্ণনা অপেক্ষা মানুষের মনের ওপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া সন্ধানের জন্য তিনি বেশী উৎসুক।[৪০]

কুবের শ্যামাদাসের বাড়িতে কপিলাকে দেখতে গেছে। সে কিন্তু ভাবে ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে, সুবচনীর হাটে আসার পর পথ চলতি চলে এসেছে। কপিলাকে দেখতে কুবেরের আকুরটাকুর আসার ব্যাপারে এ মিথ্যা বলার মধ্য দিয়ে কপিলার প্রতি কুবেরের ভালেবাসার তীব্রতাই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। কুবের ও কপিলার মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা যতই থাকুক না কেন, তাদের প্রেম সমাজস্বীকৃত নয়। সে কারণে শ্যামাদাসের সামনে সে লজ্জায় পড়ে যায় এবং তখন যেন আশ্রয় নেয় মিথ্যার। নৈতিকতাবোধে তাড়িত হয়েই সে যেন কৈফিয়ত দেয় নিজের কাছেই। ময়নাদ্বীপের জন্য মানুষ খোঁজ করার কথা বলে অসময়ে রাস্তায় বের হয়ে কুবের অসুস্থ হয়ে পড়ে। দোকানদারের সাহায্যে আবার সে কপিলার কাছেই ফিরে আসে। কিন্তু অসুস্থ কুবেরকে স্বামীর বাড়িতে, সীমাবদ্ধতার কারণে, সে ভালো ভাবে যত্ন করতে পারে না। ঘরের অভাব। সে জন্যে, পাট ও পাঁঠার জন্যে নির্ধারিত গোয়াল ঘরে তার রাত যাপনের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে কপিলা মনে মনে ব্যথিত হয়ে ব্যাকুল চিত্তে কুবেরকে বলে, 'যাওগা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি।' [৪১] এ পরিস্থিতি সম্পর্কে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> কুবেরের সঙ্গে তার রহস্য-চপলতা কুবেরের উপবাসী জীবনে যেন অমৃতানিঃস্যান্দী সুধার সাধ নিয়ে আসে।[৪২]

তা সত্ত্বেও মনের দুর্বলতা ধরা পড়ে যাওয়ায় কপিলার কাছে কুবের পেয়েছে লজ্জা। বাড়ি ফিরে কুবের নতুন কাজে হোসেন মিয়ার ডাক পেয়েছে। নোয়াখালির উপকূলে নারিকেল ভর্তি নৌকায় চট্টগ্রামের জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান কুবেরকে দিয়েছে আফিমের পোটলা। হোসেন মিয়ার কারবার সম্পর্কে সন্দেহ প্রমাণিত হলে কুবের ভয় পায়। সে ভাবে, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে

---

৪০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২

৪১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

৪২. নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

তার নিশ্চিত কারাবাস। কিন্তু হোসেন মিয়ার চাকুরিও সে ছেড়ে দিতে পারে না। হোসেন মিয়ার দেখানো সুখের পথ ছেড়ে দিয়ে সে ঝাঁপ দিতে পারে না অন্ন কষ্টে। তার পরিবারের সদস্যদের সে না খাইয়ে হত্যা করতে পারে না। সে তার জীবনের এই ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে হয়ে ওঠে যেন অধিকার সচেতন। মনে তার প্রশ্ন জাগে বৈঠা বেয়ে ঝুঁকি নিয়ে সে হোসেন মিয়াকে সাহায্য করছে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনে ; সে টাকার ভাগ সে পাবে না কেন ? কেবল মজুরি পেয়ে এতো ঝুঁকি কি নেওয়া যায় ? কিন্তু তারপরও কুবের বেশি কিছু করতে পারে না ; অধিকার আদায় তো দূরের কথা। বস্তুত, 'সামাজিক দিক থেকেই নয় অর্থনৈতিক অসহায়তা এদের ব্যর্থ, অপাংক্তেয় করে রেখেছে।' [৪৩]

কেতুপুরের এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর একজন রাসু। ময়নাদ্বীপে সে হারিয়েছে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। কেতুপুরে ফিরে এসে সে প্রাণপণ চেষ্টা চালায় আবার তার হারানো সংসার-সন্তান ফিরে পেতে। গোপীকে রাসুর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্যে কুবের অনেক টাকার পণ চেয়েছে। সে টাকা সংগ্রহ করতে রাসু চুরি করে বসে তারই বৃদ্ধ মামা পীতম মাঝির সঞ্চিত অর্থ। এ চুরির ফলে গ্রাম সুদ্ধ তোলপাড় হয়ে যায়। রাসুকে এ সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দেহ করলেও তাতে কোন ফল হয় না। চৌকিদার রাসুর ঘর তল্লাশি করে কোন প্রমাণ পায় নি। অবশ্য সবার কাছে রাসু নির্দোষ প্রতীয়মান হলেও মালার সন্দেহ থেকে সে মুক্ত হতে পারে নি। এর আগে রাসুকে পণের টাকার কথা বলা হলে চিন্তায় তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু এখন আর তেমন কোন ভাব দেখা যায় না। মালা রাসুর চোখমুখের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে নিশ্চিত হয়েছে যে, সে-ই চুরি করেছে পীতম মাঝির টাকার ঘট। মালার এই গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির বাইরে যেতে পারে নি কুবের ও কপিলার সম্পর্কটি। কুবের ও কপিলাকে এ বিষয়ে মালা সরাসরি কোন প্রশ্ন করে নি। কিন্তু তার মর্মজ্বালার প্রকাশ ঘটে ডাক্তার দেখিয়ে নিজের পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনার মধ্যে। রাসুসহ মেজকর্তার সঙ্গে মালা ডাক্তার দেখাতে যায়। কুবের মালার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আগ্রহ দেখায় নি কখনও । মালার প্রতি এই অবহেলা সম্পর্কে কুবের সচেতন নয়। উল্টো মেজকর্তাকে জড়িয়ে নিজ স্ত্রীকে সন্দেহ করে এবং রাগের মাথায় বলে, 'যা, বেড়া গিয়া মাইজা কর্তার লগে হারামজাদী, বদ।' [৪৪] মালার ধারণা, পঙ্গুত্বই তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসা হ্রাসের কারণ। মালা আরও লক্ষ্য করেছে যে, গোপী পঙ্গু হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় রাসু তাকে বিয়ে করতে চায় নি। মালা তাই নিজের পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি চায়। রাসু চোরাই টাকা পেয়ে গোপীকে বিয়ে করার জন্যে মালার সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষায় উদগ্রীব। কিন্তু সুস্থ গোপীর সঙ্গে রাসুর বিয়ে দিতে অসম্মত যেন মালা ও কুবের। এই দোটানার

৪৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫
৪৪. ঐ, পৃ. ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

সমাধান ঘটে হোসেন মিয়ার মাধ্যমে। তার নির্বাচিত ছেলে বঙ্কুর সঙ্গে গোপীর বিয়ে হয়ে যায়। রাসু তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধের হুমকি দেয় কুবেরকে। বঙ্কু পণ দিয়েছে পাঁচ কুড়ি টাকা। এর চেয়ে কিছু টাকা কম নিয়ে রাসুর সঙ্গে বিয়ে দিতে অপারগ দরিদ্র কুবের। একমাত্র মেয়েকে বঙ্কু নিয়ে যাবে ময়নাদ্বীপ, সেখানে সে হোসেন মিয়ার লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে করবে সহায়তা। এ তথ্য জানা আছে কুবেরের। এ জন্যে বিয়েতে সে মনে মনে শঙ্কিত ও অসুখী। তবু সে এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় :

মনতো অনেক কারণেই কেমন করে মানুষের।[৪৫]

অর্থের সঙ্গে সংসারের সম্পর্ক অনিবার্য আর মেয়ের সঙ্গে স্নেহের বন্ধন অকৃত্রিম। দুটোই কুবেরের মানসভূমিতে স্থায়িভাবে প্রোথিত। অত্যন্ত বাস্তব কারণেই কুবের হোসেন মিয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বঙ্কুর সঙ্গে গোপীর বিয়ে দেয়। আর্থিক দিক থেকে নির্ভরতার কারণেই অন্যান্য ব্যাপারেও কুবের হোসেন মিয়ার কর্তৃত্বের কাছে অসহায়। একই সঙ্গে সে কপিলার ভালোবাসার কাছেও অসহায়। অধরের কাছে সে জেনেছে, কপিলা চরডাঙায়। কপিলার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কুবের দোল উৎসবকে ব্যবহার করেছে ছুতো হিসেবে। চরডাঙায় কুবের ও কপিলা রঙ্গ- রসিকতা করে চুন-হলুদ গোলা পানি তাদের শরীরে ছিটিয়ে। গরমের কারণে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করে শরীর জুড়ায় তারা। কুবের ও কপিলা উভয়ে উভয়ের জন্যে কাতর। কপিলার ভালো-মন্দের খবর নেওয়ার সময় উভয়ের সংলাপে তা স্পষ্ট :

কুবের খুশী হইয়া বলিল, আছস কিবা কপিলা?

কিবা দেখ ?

কাহিল যেন লাগে তরে।

হ, কাহিল হইছি।

কুবের ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ক্যান রে কপিলা, অসুখ নি করছে তর ?

মনডার অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা ভাইবা কাহিল হইছি।[৪৬]

কপিলার স্বামী শ্যামাদাস নিরস স্বভাবের। ধারণা করা চলে যে, তার এই স্বভাবের প্রতিক্রিয়াতেই কপিলা কুবেরের প্রতি অনুরাগী হতে উৎসাহিত হয়েছে। অন্য দিকে মালার পঙ্গুত্ব শেষ পর্যন্ত কুবেরের জন্যে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার প্রথম জীবনের প্রেমের মাত্রা এসেছে কমে এবং

৪৫. ঐ, পৃ. ১৫৮
৪৬. ঐ, পৃ. ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বিকল্প আশ্রয় কপিলার দিকে তা ধাবিত হয়েছে। কপিলার মধ্যে ক্রিয়াশীল এক জন্মগত বেপরোয়া ভাব। যে প্রেম ধর্ম, আত্মীয়তা ও বিবাহ জনিত সম্পর্কের বাধা-সহ সমাজ, সংসার কোন কিছুই মানে না, সে প্রেমেরই উপযুক্ত শিষ্য কপিলা। সর্বনাশ নিশ্চিত জেনেও সে পিছ পা হতে জানে না। কুবেরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু অনিবার্য, সর্বনাশী কপিলার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার মতো কোন শক্তিই তার মধ্যে ছিল না। কপিলা সম্পর্কে তাই একজন সমালোচক বলেছেন :

> কপিলা নামক নারী চরিত্রটি নিজ সংসার তুচ্ছ করে প্রেমের আহ্বানে কূলত্যাগ করেছে।[৪৭]

কুবেররা জীবন যুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রে পরাজিত, বিপর্যস্ত। সমাজপতিদের সীমাহীন শোষণে নিশ্চিহ্ন হওয়াটাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কুবেরের সংসারে অন্নের অভাব, তার স্ত্রীও উচ্চ বর্ণের মেজকর্তার করতলগত। সামাজিক শোষণের মধ্যে তার অকল্পনীয় অসহায়ত্বের বড় প্রমাণ তারই স্ত্রীর গর্ভে মেজকর্তার ধলা সন্তান উৎপাদন। মেজকর্তাকে হত্যা করা অথবা তাকে অন্যভাবে শাস্তি দেওয়া, এমন কি তার নোংরা থাবা থেকে স্ত্রীকে উদ্ধার করে পালিয়ে যাওয়ার মতো কোন শক্তি বা উপায় তার নেই। সে কারণে শোষণে ও পীড়নে গুঁড়িয়ে যাওয়া একজন মানুষ, কুবের তার নাম, এই জীবন ধ্বংসী জাল কেটে বেরিয়ে যেতে চায়। সে পালাতে চায় এমন কোন জায়গায় যেখানে তাকে ধরতে পারবে না শোষণ ও অন্নাভাব, তাকে পীড়িত হতে হবে না নিজ স্ত্রীকে অন্যের শয্যা সঙ্গিনী হতে দিতে বাধ্য হওয়ার কারণে। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ এবং তার শালী কপিলা হচ্ছে তার পালিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত একটি ভুবন। দেহের জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তারা সাধারণত হৃদয় চর্চার কোন অবকাশই পায় না। কুবেরের জন্যে কথাটা অনেক খানি সত্য। তবু, তার জীবনে গভীর অমানিশার মধ্যে কপিলা হচ্ছে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা। ঐ রেখা অনুসরণ করে জেগে উঠেছে তার হৃদয়বৃত্তি। এরই প্রতিধ্বনি করে একজন সমালোচক বলেছেন :

> সংসারের দারিদ্র্যের তথা বিমুখ বাস্তবের ভেতর থেকেও তাই তার হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায়। এই স্পন্দন এই গ্রন্থে সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে।[৪৮]

---

৪৭. আশিস কুমার দে, উপন্যাসের শৈলী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৭৬

৪৮. নাসিম মাহমুদ, মানিক ও তাঁর খণ্ড-বিখণ্ড মানুষ, উত্তরাধিকার, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৮, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কুবের যে বলেছে, 'পরাণডা পোড়ে', সেটি কেবল পরাণের জন্যে প্রযোজ্য নয়, দেহের জন্যেও বটে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের :

> ঝোঁক প্রথম ইহতেই সেক্সের দিকে, পরে ফ্রয়েডীয় ভাবনায় পরিণত। ক্ষুধা এবং রিরংসা মানুষের আদিমতম দুইটি প্রবৃত্তি। তাহার মধ্যে, ফ্রয়েডের মতে, রিরংসাই প্রগাঢ়তর। মানুষের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি যৌন-প্রবৃত্তির গৌণ বৃত্তির পথেই সাধিত হইয়াছে। ব্যক্তি-মানুষের অনবরুদ্ধ মন : প্রবণতা যাহা তাহার চরিত্রের মেরুদন্ড তাহারই উপর তাহার জীবনের সুস্থতা-অসুস্থতা এবং সফলতা-বিফলতা নির্ভর করে। মাণিকবাবু এই দিক দিয়াই জীবনের তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একদেশদর্শিতা অবশ্যই আছে তবে সেটা কৃত্রিম কোন মতবাদ-আশ্রিত নয়। বাল্যকাল হইতেই মাণিকবাবুর জীবন সমস্যাসঙ্কুল ছিল এবং তথাকথিত "ছোটলোক"দের সঙ্গে তাঁহার খোলাখুলি মেশামিশি ছিল। এই সহজাত সিম্প্যাথির সঙ্গে তাঁহার সংসার-সমাজ ভাবনার সংঘর্ষ হইয়াছিল, সেই সংঘর্ষের ফলে তাঁহার বিশিষ্ট মানসিকতা, তাঁহার বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি উদ্ভূত।[৪৯]

সুকুমার সেনও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি'তে 'কৃত্রিম কোন মতবাদ' প্রাধান্য পায় নি। নদীর জীবন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে তাই তিনি বুকের-কপিলাদের সাধারণ যৌণ আচরণ এড়িয়ে যান নি।

কেতুপুরের সমাজ ব্যবস্থা কুবেরের অনুকূলে নয়। কুবের চেয়েছিল বাড়ির দক্ষিণে ফাঁকা জায়গায় একটি ঘর তুলতে। কিন্তু তার জন্যে মেজকর্তার অনুমতি দরকার। অনুমতি নিতে ফরাসে গিয়ে হাতজোড় করে মেঝেতে বসতে হয়। কেতুপুরের জেলেদের জন্যে এ এক বৈষম্য, বিড়ম্বনা। এ অবমাননায় অভ্যস্ত জেলেরা। কিন্তু তারপরও যে অনুমতি মিলবে, এমন কোন ভরসা নেই। শোষণের নির্যাতনের বিষয়টি তাদের জানা আছে। কিন্তু তারপরও তারা নানা দিক থেকে এতই দুর্বল যে, প্রতিবাদের সাহস পায় না। একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ মানুষ কুবের। কিন্তু অর্থনৈতিক নিপীড়নে ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসজনিত অবহেলায় পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে নি।[৫০]

তবে এ শ্রেণী বৈষম্যের কারণেই মেজকর্তার সঙ্গে গড়ে উঠে নি জেলেদের সুসম্পর্ক। বস্তুত,

---

৪৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ৩৪৬
৫০. নিতাই বসু, , পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত কেউ তার শ্রেণী চরিত্র ত্যাগ করতে পারে না। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম তাই অনিবার্য। এবং এ কারণেই বিদ্যমান শ্রেণী বৈষম্য ভুলে কেতুপুরের জেলেদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি মেজকর্তা, পারেন নি তাদের জীবনকে উন্নত করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে। একজন সমালোচকও বলেছেন সে কথা :

> জেলেপাড়ার জমিদার মেজকর্তাও চেয়েছিলেন এই গরীব মানুষগুলোর জীবনকে উন্নত করতে। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। কেবলমাত্র সহানুভূতি দিয়ে উপরতলা থেকে নিচুতলার মানুষের জীবন যাত্রার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য থেকেই যায়। সে জন্যে প্রয়োজন তাদের জীবনের শরীক হওয়া।[৫১]

অবশেষে কুবেরকে ঘর তোলার অনুমতি দিয়েছেন মেজকর্তা। কিন্তু সেটি তাঁর ব্যক্তিগত কৃপা কুবেরের প্রতি। অন্য সবার জন্যে তিনি এ সুযোগের দুয়ার খুলে দেন নি। কুবেরের প্রতি তার কৃপা তাৎপর্যপূর্ণ !

গোপীকে বিয়ে করতে না পারার কারণে রাসুর ষড়যন্ত্র উপন্যাসের পরিণতি নির্দেশ করেছে। সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কৌশলে তারই চুরি করা পীতম মাঝির টাকার ঘট থেকে টাকাগুলো সরিয়ে নিয়ে সেটি কুবেরের ঘরে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। ফলে আইনের চোখে কুবের অপরাধী বনে যায় এবং তখন কুবেরকে রক্ষায় এগিয়ে আসে কপিলা। কুবের এ সময় হোসেন মিয়ার কাজে বাইরে ছিলো, সে জন্যে দুঃসংবাদটি জানানোর জন্যে গভীর রাতে নদীর ঘাটে কুবেরের জন্যে অপেক্ষায় থাকে কপিলা। সুযোগ বুঝে কুবেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেয় হোসেন মিয়া, তবে তার শর্ত হলো :

> ময়নাদ্বীপ যাবা কুবির ? চুরি আমি সামাল দিমু। [৫২]

হোসেন মিয়ার স্বার্থপূর্ণ শর্ত ও রাসুর কূটকৌশল যেন সমন্বিত একটি ঘটনা। পরোক্ষ ভাবে যা হোসেন মিয়ার কৌশল তা আমাদের সমাজ বাস্তবতারই নগ্ন রূপ। প্রসঙ্গত তাই বলা যায় :

> মানিকের কাছে জীবন আর সাহিত্য ছিল অভিন্ন, এ দুয়ের মধ্যে কোন ফাঁক বা প্রতারণা তিনি সহ্য করেন নি।[৫৩]

হোসেন মিয়ার দেয়া প্রস্তাবে কপিলার সম্মতি ছিল না। কিন্তু কুবের এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারে নি। কারণ কুবের জানে,সে একবার জেল খেটেই মুক্তি পাবে না। সে বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, হয়

---

৫১. সরোজ মোহন মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৩৪৯

৫২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পদ্মানদীর মাঝি, পৃ. ১৭৩

৫৩. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

জেল-জুলুম, সহ্য করতে হবে, না হয় হোসেন মিয়ার যে কোন কৌশলের কাছে বশ্যতা মেনে ময়নাদ্বীপেই যেতে হবে তাকে। সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে কুবের এতই অসহায় যে সে প্রতিবাদে অপারগ। নিজ নিরাপত্তার প্রশ্নে মহাউদ্বিগ্ন কুবের ময়নাদ্বীপ যাত্রাকালে স্ত্রী-সন্তানের কথা চিন্তা করার যেন অবকাশই পায় নি। এটি এক ধরনের নিষ্ঠুরতা হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু দেশের, সমাজের ও মানুষের সকল আবর্জনা ও ক্লেদ নিয়ে ক্রমাগত বয়ে চলা নদীর মতোই যেন তাদের জীবন। 'ফিরে চাহিবার' নেই কোন উপায়। জন্ম থেকেই এদের সুখ-দুঃখের জীবন যেন নদীর সঙ্গে সমান্তরাল, যেন এদের চরিত্র নদীর মতোই কেবলই ধাবমান; সামনের দিকে এবং নিষ্ঠুরভাবে কখনও না থামা। স্বামী সংসার ফেলে কুবেরের সঙ্গে কপিলার চলে যাওয়াও একই সুরে বাঁধা। এদের জীবন ও আচরণ যেন এক অনিবার্য লক্ষ্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। একজন সমালোচক তাই মন্তব্য করেছেন :

> ...দীর্ঘকাল কুবেরের সম্মুখে মোহজাল বিস্তার করিয়া দ্বন্দ্ব ও ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া শেষ পর্যন্ত এ দুর্বোধ্য, অনিবার্য আকর্ষণের ফাঁদে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছে সংগতিপন্ন স্বামীগৃহের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া এক বিপদসঙ্কুল অনিশ্চিত অভিসার যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে (কপিলা)।[৫৪]

হোসেন মিয়া তার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমিনুদ্দি-নছিবন, কুবের-কপিলা, বঙ্কু-গোপী সবাইকে পাঠায় ময়নাদ্বীপ। এমন কি, কুবের পরিবারের অন্য সদস্যদেরও সে ময়নাদ্বীপ নিয়ে আসবে। তার সুবিন্যস্ত জালে আটকে পড়েছে কুবেরসহ অনেকে। কুবেরের নামে চুরির মিথ্যা মামলা গ্রামাঞ্চলে স্বাভাবিক ঘটনা ; কিন্তু সেটাই অনুকূলে চলে গেছে হোসেন মিয়ার। হোসেন মিয়ার ক্ষমতা ও কৌশলের কাছে পরাজিত এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তাই বলা যায় :

> পদ্মার স্রোতোরাশি যেমন সমুদ্রে মিশিয়াছে, সেইরূপ গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন প্রবাহ, তাদের স্বতন্ত্র কর্ম প্রচেষ্টা ও আশা-কল্পনা শেষ পর্যন্ত হোসেন মিয়ার মনোগহনের অতল গভীরতায় আশ্রয় ও সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।[৫৫]

বস্তুত, কুবেররা গরিবের মধ্যেও গরিব বলে তারা স্পষ্ট করে জানতে পারে নি যে, তারা নিত্য শোষিত ও পদদলিত হয় মানুষেরই দ্বারা, ওপর তলার মানুষেরই দ্বারা। ঐ ওপর তলাবাসীরা সাম্রাজ্যবাদীদেরই পোষা সারমেয়। বিদেশী স্বদেশী শোষকরাই যুগ যুগ ধরে তাদের শোষণ ও

---

৫৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৫১৭
৫৫. ঐ, পৃ. ৫১৭

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্পেষণ করে আসছে। ক্ষমতা ও অর্থের-জোরে তারা তাদের বেঁধে রেখেছে চারদিক থেকে। সে বাঁধনে তারা দেহেমনে এমনই আহত ও দুর্বল যে :

> ... তারা সমাজের অপাংক্তেয় জীবমাত্র। সামাজিক মানুষ হিসেবে তাদের বাঁচার দাবী বা প্রয়াস নেই। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ও স্বজাতি স্বদেশী স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও কোন দীপ্ত সাহস তাদের চরিত্রে নেই। অনেকটা ক্রীতদাসের মতই তারা। প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি।[৫৬]

৫৬. সালিম সাবরিন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ব্রাত্যজীবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পসাফল্য : পদ্মানদীর মাঝি

সাতটি পরিচ্ছেদে গড়ে উঠেছে 'পদ্মানদীর মাঝি'। প্রথম পরিচ্ছেদে উপন্যাসের ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছে। কেতুপুরের ও জেলেপাড়ার পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জমিদার কর্তৃক জেলেদের শোষণ, শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা এবং অসহায় এক জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার সংগ্রামের বাস্তব চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। কুবেরের নবজাত সন্তানের কান্নার মধ্য দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক জেলেদের লোকজ জীবনের পরিচয়, তাদের পূজা-পার্বণ, মেলা ও উৎসবের কথা বলেছেন। এর পর তিনি দিয়েছেন কুবেরের পরিবার পরিস্থিতির বিবরণ : তার ভাঙা ঘর, আসবাবপত্র, চালের ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়া, কুবেরের চিড়া খাওয়া, খাওয়ার পর থেকে যাওয়া অতিরিক্ত চিড়া নিয়ে তার ছেলে লখা ও চণ্ডীর কাড়াকাড়ি, স্ত্রী মালার স্যাঁতসেঁতে আঁতুড় শয্যায় নির্মোহ বক্তব্য—সবকিছু। উপন্যাসের এ পর্যায়ে বা পরিচ্ছেদে হোসেন মিয়ার আগমন। সে কেতুপুর গ্রামের নতুন প্রতিনিধি, তার অতীত ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। বর্তমানের আর্থিক সাফল্য, ব্যক্তিত্ব অর্জন ও প্রভুত্বকামিতা, দরিদ্র মাঝিদের ভোলাতে চাতুর্যের প্রয়োগ, পরোপকারের নামে স্বার্থ উদ্ধার, বিচিত্র আইনী-বেআইনী ব্যবসায়ে তার সফলতা, এক নতুন চরে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে তার সামন্ত প্রভু হওয়ার বাসনা এবং এ প্রসঙ্গে গ্রামের লোকদের তার পক্ষে-বিপক্ষে পোষিত মনোভাব প্রভৃতির উপস্থাপন ঘটেছে এখানে। এ পরিচ্ছেদেই কুবেরের ঘরে চাটাইয়ে চিৎ হয়ে শুয়েছিলো হোসেন মিয়া এবং এখান থেকেই উপন্যাসে তার প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পাই আমরা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কুবের তার মেয়ে গোপীকে বিয়ে দেয়ার কথা ভাবে, এবং এ বিয়ের মাধ্যমে বেশ কিছু টাকা পাওয়ার সম্ভাবনাও সে দেখে। পরিচ্ছেদটিতে এক দিকে মালার বাল্য স্মৃতি ও তার সন্তান পালনের কথা, অন্য দিকে কুবের ও মালার দাম্পত্য জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে অনেকগুলো ঘটনার উপস্থাপন। রাসুর ফিরে আসায় গ্রামবাসীর মধ্যে হোসেন মিয়ার বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তার অবসান ঘটে হোসেন মিয়ারই দৃঢ়তায়। নতুন করে সংসার সাজানোর চিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

এবং গোপীকে পাওয়ার কামনায় যেন জেগে ওঠে রাসু। এ সব ঘটনার পটভূমিতেই চরডাঙা থেকে মালার বোন কপিলার আগমন কেতুপুরে। কপিলার চলে আসা, তার চঞ্চলতা, রহস্যময় ব্যবহার, সেবা-যত্ন, ছলা-কলা কুবেরকে করে আন্দোলিত, রোমাঞ্চিত। তার মগ্ন চৈতন্যে অবস্থিত কামনার বীজ হয় অনুপ্রাণিত। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঝড়ের তাণ্ডব আসে কেতুপুর গ্রামে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে হোসেন মিয়া। সে সবাইকে খত-বন্দী করে সাহায্যের ব্যবস্থা করে। হোসেন মিয়া অতিরিক্ত খাতির করে কুবেরকে এবং কুবের তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়। গোপীর আঘাতিত পা নিয়ে বিব্রত কুবের। অন্য দিকে, কপিলার সঙ্গে তার স্থাপিত হয় রঙ্গরসের সম্পর্ক। ধীরে ধীরে এই রঙ্গময়ী-লাস্যময়ী-লীলাময়ী নারী কপিলা কুবেরকে করে উদ্‌ভ্রান্ত, বিমুগ্ধ। দেখা যায়, অসুস্থ গোপীকে নিয়ে কুবের, কপিলা, গণেশ, যুগী ও রাসু আমিনবাড়ি যায়। গোপীর চিকিৎসার অন্তরালে কুবের ও কপিলার সম্পর্ক হয়ে ওঠে আরও অন্তরঙ্গ। এ পরিচ্ছেদে সর্বস্ব হারানো রাসুর বিয়ের বাসনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে, সে গোপীকে পাওয়ার জন্যে কুবেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে এক ধরনের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ অংশে যখন কুবের ও কপিলার সম্পর্ক হয়ে ওঠে প্রায় অনিবার্য, তখনই কপিলার স্বামী শ্যামাদাস এসে কপিলাকে নিয়ে যায় আকুরটাকুর। কপিলার অবর্তমানে কুবের বুঝতে পারে তার প্রতি কুবেরের প্রেম ছিল কত তীব্র।

এ উপন্যাসের শেষ ও দীর্ঘতম অংশ সপ্তম পরিচ্ছেদ। এখানে ঘটনার পর ঘটনার আগমন ঘটেছে এবং এ সবের মধ্য দিয়েই কাহিনী লাভ করেছে পরিণতি। এক দিকে শেষ ইলিশের মৌসুম, অন্য দিকে ধনঞ্জয় তার নৌকোয় কাজে নেয় না কুবেরকে। অর্থাভাবে পড়ে কুবের। এমন সময় কুবের ও গণেশ চাকুরি পায় হোসেন মিয়ার নৌকায়। তারা হোসেন মিয়ার ব্যবসার মালামাল বন্দরে-বন্দরে পৌছে দেয়। এবং ময়নাদ্বীপও যায় সেখানে বসতি স্থাপনে আগ্রহী লোকদের নিয়ে। হোসেন মিয়ার সংস্পর্শে এসে কুবের ফিরে পায় আর্থিক সচ্ছলতা, সঙ্গে সঙ্গে সে কপিলাকে পাওয়ার বাসনায়ও হয়ে ওঠে আগ্রহী। সে বিনা কারণে আকুরটাকুর যায় কপিলাকে দেখতে। কিন্তু কুবের শত চেষ্টায়ও কপিলার মন বুঝতে পারে না। এ দিকে দ্বিতীয় বার চিকিৎসায় গোপীর পা ভালো হওয়ার আশা ব্যক্ত করেছে ডাক্তার। এর আগেই গোপীকে রাসুর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার কথা দেয় কুবের। কিন্তু পাঁচ কুড়ি টাকা পণ ও তিন কুড়ি টাকার গহনা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে, হোসেন মিয়ার মধ্যস্থতায় গোপীর বিয়ে হয় বঙ্কুর সঙ্গে। বোনঝির বিয়েতে অতিথি হয়ে কেতুপুরে আবার কপিলার উপস্থিতি। এ বিয়ের আনন্দের দিন শেষ না হতেই কুবেরের বিরুদ্ধে রাসুর ষড়যন্ত্র পাকা হয়ে যায়। পীতম মাঝির চুরি হয়ে যাওয়া টাকা ভর্তি ঘটটি টাকা শূন্য অবস্থায় কুবেরের ঘর থেকে

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ উদ্ধার করে। কুবেরের বিরুদ্ধে মামলা হয় থানায়, পুলিশ ও চৌকিদার অভিযুক্ত কুবেরকে ধরে নিয়ে যেতে পারে যে কোন সময়। তখন কেতুপুরে উপস্থিত কপিলা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। বাড়িতে অনুপস্থিত হোসেন মিয়ার কাজে ব্যস্ত কুবেরকে এ দুঃসংবাদ দিতে কপিলা তাই গভীর রাতে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়ায়। এ সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হোসেন মিয়ার অনুগত হওয়া। কপিলার দ্বিমত সত্ত্বেও কুবের হোসেন মিয়ার বশ্যতা মেনে ময়নাদ্বীপে যেতে সম্মত হয়। এবং অবশেষে কুবের কপিলাকে সঙ্গে নিয়ে ময়নাদ্বীপের পথে নৌকো ভাসায়। এ ভাবেই গড়ে উঠেছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা সেট্‌লমেন্টের কর্মচারী হিসেবে কিছুদিন অবস্থান করেন পদ্মানদীর তীরে। সে সময় :

> মানিকের সেইখানেই পদ্মার সঙ্গে পরিচয়। পদ্মার ভীষণ সৌন্দর্য তাঁকে আকর্ষণ যত না করত, তার চেয়ে বেশি করত তার তীরবর্তী মানুষের জীবনধারা। সেই পুঁজি নিজের মানসের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি এ বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের সন্ধান দিলেন। তাঁর পূর্বে স্থানিক সাহিত্যে রাঢ়বঙ্গ—বাংলার প্রত্যন্তে অবস্থিত কয়লাখনির এলাকা ফুঠে উঠেছিল শৈলজানন্দের কলমে, তাঁর কুশীলবেরাও আঞ্চলিক ভাষায় মুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গত তখনো ছিল পাণ্ডববর্জিত। সেই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলকে তিনি নিয়ে এলেন সাহিত্যের দরবারে, তার ব্রাত্য মানুষকে এনে নায়ক-নায়িকার পাদপীঠে বসালেন।[১]

প্রকৃত প্রস্তাবে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রায় অনন্য সৃষ্টিধর্মিতা ও সহমর্মিতার সমন্বয় ঘটার ফলেই 'পদ্মানদীর মাঝি'র মতো একটি জীবনঘনিষ্ঠ রচনা সম্ভব হয়েছে।

সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত কাহিনীর মধ্যে অতিরিক্ত কোন মেদ নেই। কাহিনী পূর্বাপর পরিমিত পরিসরে বিন্যস্ত, বাহুল্য বর্জিত। জেলেদের দারিদ্র্য নিয়ে অনেক অতি কল্পনা ব্যাপক পরিসরে সম্ভব ছিল। দারিদ্র্যবিলাস থেকে অনেক লেখকই মুক্ত হতে পারেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে দেখেছেন সাদা চোখে, স্বপ্নালু দৃষ্টিতে নয় ; সে কারণে কোন ভাবালুতা সাধারণত তাঁকে আক্রমণ করতে পারে নি। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে তাঁর বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থেকেছে। দরিদ্র কুবের ও তার পরিবারের এবং একই সঙ্গে কেতুপুরের অন্যান্য মানুষের যে পরিচয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন তার কোন অংশই পরিত্যাজ্য গণ্য হওয়ারও নয়। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে কাহিনী প্রবাহিত হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কাহিনী প্রবাহিত হয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। এ ভাবে প্রবাহিত কোন কাহিনী-অংশই কখনও অপ্রয়োজনীয়, অপাংক্তেয় মনে হয় না। ঘটনাবলির অনিবার্যতা এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কোন কাহিনী-অংশ বাদ দেওয়ার উপায় নেই। এমন

---

১. মানিক গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, আলোচনা ও গ্রন্থপরিচয়, গ্রন্থ পরিচয়: আশোক গুহ, কলকাতা, ১৩৭০ পৃ.ধ

Dhaka University Institutional Repository

কি টাকা-চুরির ঘটনা, গ্রামে পুলিশের আগমন, ময়নাদ্বীপ থেকে রাসুর ফিরে আসার কারণে হোসেন মিয়ার প্রতি গ্রামবাসীদের ক্ষোভ, হোসেন মিয়ার মাদক দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা প্রভৃতি ঘটনা যে কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের হাতে ব্যাপকভাবে পল্লবিত হতো। কিন্তু, মিতবাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠুর সংক্ষিপ্তিতে 'মাঝি'র কাহিনী রচনা সুসম্পন্ন করেছেন। অথচ মানুষ ও প্রকৃতি বর্ণনায় কোন ঘাটতি নেই। রস ও সৌন্দর্যেরও নেই কোন কমতি। শেক্‌স্‌পীয়রের ট্রাজেডি-গুলোর কাহিনীর কোন অংশই পরিত্যাজ্য মনে করা যায় না। 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা চলে নির্দ্বিধায়। তার কাহিনী এতই সাবলীল যে, যে কোন পাঠকই প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রবাহিত হন যেন তাঁর অজ্ঞাতেই। কোন অংশই কৃত্রিম, স্বকল্পিত ও আকস্মিক মনে হয় না। কাহিনী অগ্রসর হয়, বাঁক নেয়, সমস্যায় নিপতিত হয় কিংবা মুশকিল আসান হয় যেন নিজ গুণে। কোন সময় লেখকের উপস্থিতি অনুভব করা যায় না। কোন ঘটনার ব্যাখ্যায়, কোন ঘটনার উপস্থাপনায় লেখকের চাপিয়ে দেয়া কোন জীবন দর্শনের সাক্ষাৎও মেলে না। বস্তুত, ঔপন্যাসিক তাঁর রচনা থেকে অতি উচ্চ মাত্রার বিচ্ছিন্নতা পূর্বাপর অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এ সবই 'পদ্মানদীর মাঝি'কে দান করেছে একটি ঈর্ষণীয় উচ্চমান। 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রধান প্রধান চরিত্র কুবের, হোসেন মিয়া, মালা ও কপিলা। এগুলো ঘিরে আবর্তিত হয়েছে অন্যান্য চরিত্র।

অসংখ্য সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল থেকেও জীবনের অফুরন্ত সীমাবদ্ধতা ভেঙে ফেলতে পারে নি কুবের। কোন রাজনৈতিক আদর্শে সে দীক্ষিত নয় যে আপসহীন হবে। বিশ্বের কোটি কোটি নিষ্পেষিত গরিবের সে একজন। সে গরিব এটাই তার প্রধান পরিচয়। সমাজপতিদের পাতা শোষণের জালে তার বন্দীত্ব সে বরণ করে নিয়েছে। সমাজ-সংসারের সব প্রতারণা-প্রবঞ্চনা নিয়েছে মেনে। জমিদারের কর্মচারী, সঙ্গতিহীন সিধু দাসও ঠকায় কুবেরকে। এমন অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে পদ্মায় মাছ ধরে, ছ জনের সংসার চালায় সে। পৃথিবীতে মালা ও গণেশই তার অনুরাগী। তাকে ভালোবাসে, সম্মান করে । তার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন:

> গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মের মত, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে সে। প্রতিবাদ করিতেও পরিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার, অধিকার তাহার নাই।[২]

তার জন্ম শ্রেণী-শোষণ-মূলক সমাজ কাঠামোর মধ্যেই। সেখানে জমিদার বা অর্থ-বিত্তশালী মাত্রই যেন নিয়ম মাফিক ঠকিয়েই চলেছে দরিদ্রকে। গরিব জেলে কুবের তাদের থাবার বাইরে নয়। শ্রেণী বৈষম্যের শোষণ-পীড়নে কুবেরের মনও যেন গেছে ছোট হয়ে ; সে মহা আতঙ্কের শিকার। সে কারণেই কোথাও সে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াতে পারে না নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। সে ভয় পায়। নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয় খুড়োকেও সে ভয় পায়। সে কারণে, প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাকে চোর সাব্যস্ত করতে পারে না কুবের। তার নিশ্চিত ভয়, তা হলে তাকে আর মাছ ধরতে নেবে না নৌকোয়। সে ভীত হোসেন মিয়ার নামেও, সে জন্যেই সে ময়নাদ্বীপ না যাওয়ার কথা সামনা সামনি বলতে পারে না। এমন কি মিথ্যা মামলার মোকাবেলা করার সাহসও নেই তার। অনন্ত বাবুকে পর্যন্ত সে ভয় পায়। তার প্রতি কুবেরের সঞ্চিত ক্ষোভের কখনও প্রকাশ ঘটে নি। বরং তা যেন স্থানান্তরিত হয়েছে মালাকে মারধর করার মধ্যে। সে ভয় পায় কাল্পনিক দেবতাকেও ; নদী তীরের নির্জনতায় কপিলার হাসি শুনে কুবের তাই আঁৎকে ওঠে। অসহনীয় অভাবের কারণে কুবেরের মন বাস্তবিকই ছোট হয়ে গিয়েছে। দারিদ্র্যই কুবেরের জীবনের নগ্ন সত্য; তার পরও পদ্মার 'হেঁয়ালী আচরণ' এবং কপিলার প্রেমের আহ্বানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে যেন আর একজন কুবের। কপিলার আগমনে কুবেরের জীবন হয়েছে যথার্থই দ্বন্দ্বমুখর। কপিলার প্রতি অনুরাগের আগে কুবের ছিল একজন নিষ্ঠাবান সাংসারিক মানুষ। কপিলা কুবেরের জীবনের অজানা এক অধ্যায় যেন করেছে জাগরিত। কপিলাকে পেয়ে কুবেরের চোখে মালার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কপিলার প্রেম মালার নিবেদিত ভক্তির চেয়ে আরও বেশি কিছু মনে হয় কুবেরের কাছে। সম্পূর্ণ নতুন এক সুখের উৎস কপিলা ; সে জন্যে কপিলাই তাকে কাছে টেনেছে। কিন্তু বাস্তবতার কারণে কপিলা যখন চলে যায় শ্যামাদাসের কাছে, তখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে কুবের। সুযোগ পেতেই কুবের ছুটে যায় আকুরটাকুর। সেখানে শ্যামাদাসের সংসারে কপিলার সুখ-সচ্ছলতা দেখে সংকুচিত হয়ে ওঠে কুবেরের মন। নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাওয়া কুবের ফিরে আসতে আসতে শ্যামাদাসের সমান সচ্ছল জীবনের কল্পনা করে সে :

চার ভিটায় চার খানি বড় বড় ঘর তোলে কুবের, গোয়াল করে, ধানের মরাই করে, ঝাঁকার উপর লাউলতা তুলিয়া দেয়। তারপর একদিন কপিলাকে নিমন্ত্রণ করে। কপিলার পা দুটি

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

জড়াইয়া ধরিয়া বলে যে তাকে ছাড়িয়া থাকিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে কুবেরের—ও কপিলা, আমারে ফেইলা যাইস না, যাইস না— আমি নি মইরা গেলাম কপিলা, তরে না দেইখা ![৩]

কপিলার প্রেমই যেন কুবেরের জীবনের প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক রীতি-নীতি উপেক্ষা করে কুবেরের পক্ষে কপিলাকে নিয়ে সংসার গড়ে তোলা অসম্ভব। এমন পরিস্থিতিতেই কুবেরের বিরুদ্ধে রাসুর ষড়যন্ত্র সফল হয়। তখন পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে কুবেরকে যেতে হয় ময়নাদ্বীপ, সঙ্গে যায় কপিলা। সংসার-সন্তান ছেড়ে কুবের এ যাত্রায় হয়ে ওঠে এক পলায়নপর মানুষ। সংসারের প্রতি তার এই দায়িত্বহীনতা পরিস্থিতি-জাত। মিথ্যা মামলা প্রতিহত না করে সংগ্রাম-সংঘাতের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে ভীরুর মতো চলে গেল কুবের। তবে, তার মতো গরিবের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। দারিদ্র্যজনিত দুর্বলতার কারণে এরা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়ে থানা-পুলিশের সঙ্গে লড়তে সক্ষম নয়। ধরা পড়লে সংসার ধ্বংস অনিবার্য। পরিস্থিতি এমনই শাঁখের করাত হয়ে ওঠে যে, একটা না একটা বিপর্যয় মেনে নিতেই হয়। কুবের লড়াইজাত বিপর্যয় এড়িয়ে বেছে নিয়েছে পলায়নজাত বিপর্যয়। তার আচরণ তাই নয় অবাস্তব বা অস্বাভাবিক। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা চলে :

> তার নীচুতা সঙ্কীর্ণতা অসচ্ছলতা সত্ত্বেও কুবের যে একটি উপাখ্যানের নায়ক হতে পারলো, তার মূলে আছে এই অবিমিশ্র স্বাভাবিকতা যাকে আমরা বাস্তবের সঙ্গে সমীকরণ করতে পারি অনায়াসেই। হয়ত আরও তলিয়ে দেখলে কুবেরের চরিত্র চেতন-অবচেতনের নিষ্ঠুর ও রহস্যময় দ্বন্দ্বের মানবিক পরিণতি বলে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে, কী করে অর্থনৈতিক বিন্যাস ও সীমাবদ্ধতা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিকাশ ও অভিব্যক্তির রূপ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করে।[৪]

'পদ্মানদীর মাঝি'র অপর উল্লেখযোগ্য চরিত্র মালা। পঙ্গুত্ব তার জীবনে একটি প্রধান অন্তরায় হলেও সে কারও থেকে পিছিয়ে নেই। অবশ্য সে নিজ গুণে জেলেপাড়ার অন্য দশ জন মেয়ের চেয়ে আলাদা একটি বিশিষ্টতা যেন অর্জন করেছে। সারাদিন ঘরে বসে সংসারের কাজ করে সে আপন মনে। সন্তানদের যত্নআত্তি করতে সে সব সময় অধীর হয়ে থাকে ; পরম মমতায় নিজ হাতে তাদের খাওয়ায়। রূপকথার গল্প শুনিয়ে তাদের ঘুম পাড়ায়। কুবেরও ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু, স্ত্রীর কাছে পাওয়া এ সুখে আর যেন মন ভরে না কুবেরের। লাস্যময় সুস্থ নারী কপিলার আগমনে সে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সচলা কপিলা অচলা মালার স্বামী-

---

৩. ঐ, পৃ. ১৪৮

৪. ভূইয়া ইকবাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

ভক্তিজনিত প্রেম করে দিয়েছে অচল। এটি মর্মে মর্মে অনুধাবন করে মালা। সে আরও বুঝতে পারে যে, কপিলাই তার জীবনের সুখ ও দুঃখের নিয়ামক। কুবের ও কপিলার অবৈধ প্রেম সম্পর্কে অবগত হয়েও মালা থেকেছে নিশ্চুপ। সে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আপস করেছে নবোদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে। কিন্তু তাতে তার অন্তরের জ্বালা হয় নি প্রশমিত। বরং এক দিকে সাংসারিক অভাব-অনটন, অন্য দিকে স্বামীর অসদাচরণ মালার মনকে তুলেছে বিষিয়ে। অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি না পেয়ে মালা মাঝে মধ্যে কামনা করে মৃত্যু ; কিন্তু তা তার মনের কথা নয়। সেখানে বরং আছে সুখের বাসনা। সে কারণেই, সে আমিনবাড়ি গিয়ে ডাক্তার দেখায় পঙ্গু পা ভালো করার জন্যে। কিন্তু তার পা ভাল হওয়ার নয়। বরং আমিনবাড়ি থেকে ফেরার পর কুবেরের কাছে মালা হয়েছে আরও উপেক্ষিত। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে অভিমানে স্নেহময়ী মা মালা এক সময় নিজ সন্তানকে কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। এ উপন্যাসে প্রকৃতির অধীন জনগোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতার প্রতীক যেন মালা। সে জন্ম থেকেই পঙ্গু। এ প্রসঙ্গ আলোচনাকালে একজন সমালোচক অবশ্য মালা, কপিলা, গোপী সবাইকে প্রতীকী চরিত্র হিসেবে গণ্য করেছেন :

> নদীর তীরবর্তী মানুষ–তার প্রতীকের মূল্য রক্ষা করতেই যেন পঙ্গু। মালা ও গোপী দুজনের একজন জন্ম থেকে চিরকালের জন্যে, অন্যজন ঝড়ের ফলে সাময়িকভাবে পঙ্গু হয়েছে, তারই পাশে আছে কপিলা যে কিনা চলিষ্ণুতার প্রতিনিধি। উপন্যাস যেমন যেমন অগ্রসর হয়, তেমনি তেমনি জড়িয়ে আসে মৃত্তিকালগ্ন এই তিন নর-নারীর মায়াজাল।[৫]

এই তিন নারী কুবেরকে যেন ঘিরে আছে সারা জীবন। গোপী তার কন্যা, মালা ও কপিলা তার সংসার জীবনের সুমেরু ও কুমেরু। মালা বাস্তব, কপিলা স্বপ্ন। মালার কাছে কুবেরের রয়েছে আশ্রয়, কপিলার কাছে কুবেরের তা নেই, আছে অনিশ্চিত আগামীর সম্ভাবনা। আসলে মালা সংসার যাত্রার নিপুণ পারদর্শিতার এবং স্বামী-ভক্তি ও সন্তান-স্নেহের অপরূপ উপমা। অন্য দিকে কুবেরকে অভিভূত করা কপিলার বেগুনী রঙের শাড়ী, তেলে ভেজা চুল, বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গি, প্রগল্‌ভ-হাসি। এ সবই কুবেরকে কপিলার প্রতি আকর্ষণের সঠিক উপকরণ। এ অবস্থার কারণে মালার অসাধারণ সহিষ্ণু মনোভাব প্রকারান্তরে কুবের ও কপিলার প্রেমের পক্ষে গেছে। কুবের ও কপিলা তাদের প্রেমজাত সংকীর্ণতার কারণে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জগৎ-সংসারে পঙ্গু মালার মৌলিক অধিকারের কথা ভাবে নি। এবং মালাও সোচ্চার হয়ে এ অবৈধ প্রেমের বিরোধিতা করেনি। সে মোকাবেলার পক্ষে না গিয়ে গোপনে বরং ডাক্তার দেখিয়ে পা

৫. অচিন্ত্য বিশ্বাস, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

ভালো করার চেষ্টা করেছে। সে ভেবেছে হয়তো সুস্থ নারীর অবস্থায় ফিরে গিয়ে সে আদায় করে নিতে পারবে স্বামীর সুখ-সম্পদ। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং সে বাধ্য হয়ে নিরবে সব সয়ে গিয়েছে আপন বৈশিষ্ট্যে। তার সহিষ্ণু মনোভাবের সামাজিক মর্যাদা থাকলেও অথবা অন্যদের সমবেদনা তার প্রতি থাকলেও তার নিজ অস্তিত্ব এর ফলে যেন অনিবার্যভাবেই বিলীন হয়ে গেছে, হয়েছে অর্থহীন। কুবের ও কপিলার অবৈধ প্রেমের বিরোধিতা না করা যেন মালার শারীরিক পঙ্গুত্বের মতোই স্বাভাবিক। তবু মালার এই নিরবতাই তাকে যেন দান করেছে এক ধরনের মহিমা।

কপিলা আমাদের সামনে এসেছে স্বামী-সংসারের অবহেলাগ্রস্ত নারীরূপে। স্বামীর কাছে সে পায় নি তার কাঙ্ক্ষিত সংসার ও সন্তান। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পরই তার স্বামী শ্যামাদাস এসেছে তার খোঁজে। তার আগ্ পর্যন্ত শ্যামাদাস কপিলার খোঁজই করে নি। অবহেলিত দেহ-মন নিয়ে বন্যাকবলিত চরডাঙা থেকে কুবেরের সঙ্গে কপিলা আসে কেতুপুর। এবং কেতুপুরের বন্ধনমুক্ত পরিবেশে, শ্যামাদাসের অবহেলার পটভূমিতে, কুবের ও কপিলার প্রেমের সূত্রপাত হয়। অনুরাগ, ছলাকলা ও রহস্যময় আচরণে কপিলা যেন বন্দী করেছে কুবেরকে। ঘরে ফেলে আসা তামাক কুবেরকে নদীর ঘাটে পৌঁছে দিতে গিয়ে কপিলা তার হাত ধরে টান দেয়, যেতে চায় কুবেরের সঙ্গে নৌকোয়। কুবেরের স্নেহবিজড়িত শাসনে কপিলা আহলাদিত কণ্ঠে 'আরে পুরুষ' বলে ঠাট্টা করে কুবেরকে। ঐ ঠাট্টা তথা ব্যঙ্গের মাধ্যমে কপিলা কুবেরের পৌরুষ জাগ্রত করতে চায়। এ ভাবে কপিলা সমাজবিগর্হিত প্রেমের পথে নিয়ে আসে কুবেরকে। মালার পঙ্গুত্বজাত নানা অপারগতা এত দিন ছিল যেন কুবেরের চোখের আড়ালে ; এখন যেন তা প্রকটতর। সংসারিক জীবনে মালার অবদান লাস্যময়ী সম্পূর্ণ নারী কপিলার প্রাণ-চাঞ্চল্যের কাছে পরাভূত। মোহগ্রস্ত কুবের তাই সামাজিক শাসনকে উপেক্ষা করে কপিলাকে জড়িয়ে ধরে মেলা থেকে ফেরার পথে। কপিলার দেহ-মনের শূন্যতার কিছুটা পূরণ অবৈধভাবে সম্ভব হলেও, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত। সে জন্যে বিকল্প হিসেবেই কপিলার মনে পড়ে তার স্বামী শ্যামাদাসকে। ধর্ম ও সমাজ তার জন্যে স্বামী হিসেবে বরাদ্দ করেছে শ্যামাদাসকে। দুই পরিবারই নির্বাচনের কাজটি করেছে সমাজ ও ধর্মের পক্ষ থেকে। সমাজে বাস করে সেই বরাদ্দের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। সে জন্যে নিরুপায় কপিলা ফিরে গেছে শ্যামাদাসের খাঁচায়। সেখানে সে পরিচিতি পেয়েছে, কিন্তু পায় নি যথার্থ মর্যাদা। সে কারণেই ক্ষুব্ধ কপিলা কুবেরের বলয়ে ফিরে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এসেছে মনেরই টানে। শ্যামাদাসের কাছে তার দেহের ক্ষুধা কিছুটা মিটলেও মন থেকেছে অতৃপ্ত। কুবের তার উভয় ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রার্থিত উৎস। এ সব কারণে কপিলা, শ্যামদাসের বাড়িতে, পরোক্ষভাবে কুবেরের কাছে প্রকাশ করেছে তার মনোভাব। সবার অগোচরে সে কুবেরকে বলেছে:

> চুপ কর মাঝি, বেবাকে শুনব। যাইবা যাও, ... দিদিরে কথাটা কইও ! কইও, কপিলা পরের ঘরের বৌ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নাই। অতিথ কই থাকব, অতিথ কী খাইব, কপিলারে কেডা তা জিগায় ? দুষী কইরো মাঝি, শাইপো কিন্তু এই কথাডা কইও— দিদিরে, মাথা খাও মাঝি, কইও। ...যাওগা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি! [৬]

কপিলার প্রেম তৃষ্ণার কাছে সমাজ ও ধর্মীয় অনুশাসন শেষ পর্যন্ত যেন হয়েছে পরাজিত। বাপের বাড়িতে পুকুরে সে হয়ে ওঠে উদ্বেল। কুবেরের কাছে কপিলার এই সমর্পণে যেন মেলে তার মানসিক পরিতৃপ্তি। তাদের এই প্রেমের সম্পর্ক একটি অনিবার্য পরিণতির দিকে ছুটে গিয়েছে কুবেরের বিরুদ্ধে রাসুর মিথ্যা মামলার মধ্য দিয়ে। প্রেমের কারণে কুবেরের সঙ্গে কপিলার ময়নাদ্বীপ যাওয়াকে সঙ্গত ভাবা যায়। কিন্তু অন্য ভাবে তা বেমানান। কারণ, আপন বোন মালা সম্পর্কে তার উদ্বেগহীনতা তাকে করেছে অসামাজিক ও নৈতিকতাশূন্য। কুবেরের সঙ্গে ময়নাদ্বীপ না গিয়ে স্বামী শ্যামাদাসের মধ্যে মনের ক্ষুধা মেটানোর উপকরণ খুঁজলে সে-ই হয়ত হতো কপিলার প্রকৃত আশ্রয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তার হৃদয়ের সায় না থাকায় সে যায় নি ঐ পথে। তা ছাড়া, শ্যামাদাসের এক সময়কার অবহেলা তার দেহমনে যে বিতৃষ্ণা তৈরি করেছিল তা অস্বীকার করা তার পক্ষে বোধ করি সম্ভব হয় নি।

হোসেন মিয়া 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ; উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র অনেক খানি তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এ উপন্যাসের পরিণতিও ঘটে তারই হাতে। সে তার আসল মতলব আড়াল করে জনগণের মধ্যে পরিচালনা করে তার সকল কার্যক্রম। তার সাফল্যের কথা কেতুপুরের সবাই জানে। কিন্তু সে কি সব করে অর্থ উপার্জন করে কেউ তা জানে না। কেউ কেউ অনুমান করলেও মুখে বলে না সে কথা। ময়নাদ্বীপ সম্পর্কেও মানুষ বেশি কিছু জানতে পারে না। মানুষ যতটুকু জানে তা হলো তার অতীতের কথা, কেতুপুরে প্রথম আগমনকালের হোসেন মাঝির কথা। তার সব ব্যবসা-বাণিজ্য অদৃশ্যে-অগোচরে হয় বলে সে মানুষের কাছে হয়ে ওঠে রহস্যময়। কেতুপুরের মানুষেরা তাকে ভালোবাসে সম্মান করে ; তবে তা তাদের মন থেকে নয়। ধনী হোসেন মিয়া তাদের কাছে ভয়েরও উৎস। হোসেন মিয়াকে তারা অনন্ত বাবুদের সমপর্যায়েরই

---

৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে। অর্থ উপার্জন করে দরিদ্র জেলেদের মধ্যে নানাভাবে নানা কৌশলে সাহায্যের কারণেই সে একই সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাকে সে পর্যায়ে উপস্থাপিত করেছেন। সে দিনের হোসেন মাঝি আর আজকের হোসেন মিয়ার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। হোসেন মিয়াকে তারা অনন্তবাবুদের মতো ভাবলেও সে ঠিক তাদের মতো নয়। সে তাদের সঙ্গে কোন দূরত্ব বজায় রাখে না। কেতুপুরের দরিদ্ররা সহজেই তাই হোসেন মিয়ার সাহচর্যে আসতে পারে। সে কেতুপুরের দরিদ্র মাঝিদের জীবনের সঙ্গে নদীর জলের মতোই যেন সম্পর্কিত। তবু সে কেতুপুরের জেলেদের কাছে আধেক জানা, আধেক অজানা। এই জানা-অজানার মধ্যে নিহিত হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ পরিকল্পনা। ময়নাদ্বীপ পরিকল্পনার প্রধান ভিত্তি কেতুপুরের দরিদ্র জেলেরা। ময়নাদ্বীপ যাওয়ার জন্যে সে কাউকে জোর করে না। ইচ্ছাকৃতভাবে যারা ময়নাদ্বীপ যেতে চায় সে তাদেরকেই সেখানে নিয়ে যায় পরম যত্নে। তবে মানুষ ভাগিয়ে নেওয়ার কৌশল সে জানে। যেন সে আসামের চা বাগানের কুলি ভাগিয়ে নেওয়ার আড়কাঠি। আমিনুদ্দি-নছিবনের মতো মৃতপ্রায় মানুষদের বিয়ে দিয়ে সেখানে সে বসতি বসায় ; সে ভাবে, তাদের মধ্য দিয়ে আগত সন্তানরাই গড়ে তুলবে ময়নাদ্বীপ রাজ্য। সে জন্যে সন্তান জন্মদানে অক্ষম বশিরকে হারাতে হয় তার ময়নাদ্বীপের বসতি, পাশাপাশি বশিরের তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে যুবক এনায়েতের অবৈধ সম্পর্ক নিমিষেই হয়ে যায় বৈধ। এর মূল কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ময়নাদ্বীপ রূপান্তরিত হবে জনপদে—এটাই আশা করে হোসেন মিয়া। দক্ষ নাবিক হোসেন মিয়া ক্ষমতা ও বুদ্ধির সঙ্গে কৌশলও ব্যবহার করেছে তার ময়নাদ্বীপের স্বপ্ন পূরণের জন্যে। সে আসামীকে জেল থেকে মুক্ত করে পাঠিয়েছে ময়নাদ্বীপ। নিরক্ষর জেলেদের কাছ থেকে অনুকূল 'খত' লিখে নিয়ে সে তাদের ঘর তুলে দিয়েছে। আবার ঘরের খুঁটি বেয়ে চালের মধ্যে আফিম লুকিয়েও রেখেছে। এ সবই করেছে সে ময়নাদ্বীপ নামের রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। নিজের প্রয়োজনের বেলায় সে এমন কঠোর ও কৌশলী। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে সে অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে আফিম ও চোরাচালানের ব্যবসা করে। সে ময়নাদ্বীপের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আপস করে না কোথাও, ছাড়ে না কোন সুবিধাও গ্রহণ করতে। সুযোগ মতোই সে কুবেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে ময়নাদ্বীপ, সঙ্গে গিয়েছে কপিলা। এর পরে বঙ্কু, গোপী ও কুবেরের স্ত্রী-সন্তানদেরও সে ময়নাদ্বীপ নিয়ে যাবে। শেষ পর্যায়ে হোসেন মিয়া তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় কুবের ও সংশ্লিষ্টদের ময়নাদ্বীপ পাঠাতে সক্ষম হলেও ময়নাদ্বীপ নামক এক ভুবন প্রতিষ্ঠা করতে সে সম্পূর্ণ সফলকাম হবে কি না বলা কঠিন। কখনও কখনও প্রতীয়মান হয় যে, হোসেন মিয়া যেন লেখকের মানস প্রতিনিধি। কিন্তু বিষয়টি তা

Dhaka University Institutional Repository

নয় ; বাস্তববাদী লেখকের দৃষ্টিতে হোসেন মিয়া সমাজ বাস্তবতারই একটি প্রতিমূর্তি। ঔপন্যাসিক একটি ধূর্ত চরিত্রের রূপায়ণ করেছেন হোসেন মিয়া নামের ক্যানভাসে। মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলেই হয়তো প্রকৃতির প্রায় অসীম ক্ষমতাই জয়ী হয় কখনও কখনও। নিরন্তর শক্তিধর প্রকৃতির সঙ্গে হয়তো এঁটে উঠতে পারছে না হোসেন মিয়া। মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য মধ্য সাগরের এই দ্বীপ হোসেন মিয়ার এক স্বপ্নরাজ্য। ময়নাদ্বীপ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় হোসেন মিয়াকে মনে রেখে বলা যায় :

> হোসেন মিয়া সুদূরের হাতছানি, সে অনাগত আগামীর সঙ্কেতবাহী, বর্জনে যেমন সে নির্মম গ্রহণে তেমনি আগ্রহী।[৭]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের ছোট ছোট চরিত্রগুলো আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সে গুলোর বাস্তব ভিত্তি উপন্যাসকে দিয়েছে শৈল্পিক মর্যাদা। গণেশ, রাসু, পীতম, শীতল, জহর, আমিনুদ্দি, এনায়েত, সিধু, বশির প্রভৃতি সবার জীবনের সঙ্গেই রয়েছে পদ্মা নদীর নিবিড় সম্পর্ক।

গণেশকে ছাড়া কুবেরের পথচলা একাকীত্বে ভরা ; অন্য দিকে, কুবেরের ওপর গণেশের নির্ভরতা চরিত্রটিকে করেছে বাস্তবসম্মত। ময়নাদ্বীপ থেকে ফিরে আসা রাসুর হিংস্রতা ও স্বার্থপরতা অস্বাভাবিক ভাবা যায় না। প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হারিয়ে বেঁচে আছে সে। কেতুপুরে ফিরে আবার সংসার সাজানোর উপলক্ষ্যেই সে চুরি করেছে নিজের মামা পীতম মাঝির টাকা ভর্তি ঘট। গোপীকে তার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে কুবের : এই প্রতারণার কারণে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত রাসু কুবেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। তার এই হিংস্রতাও বাস্তবসম্মত। পীতমের অহংবোধ, শীতলের লাম্পট্য, শঠতা আমাদেরই সমাজ-জীবনের বাস্তব রূপ। সিধু দাসের প্রতারণার চিত্রটিও অপরিচিত নয়। আমিনুদ্দির জীবন বিপর্যয় এবং তার কিছুটা নিরাসক্ত জীবনধারা কাহিনীর সঙ্গে অনেকখানি সঙ্গতিপূর্ণ। ময়নাদ্বীপে এনায়েতের দুঃসাহসী কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সন্তান উৎপাদনে বশিরের অক্ষমতা। উপন্যাসের ছোট ছোট চরিত্রগুলো বাক্যস্থিত পদগুলোর মতো যেন পরস্পর-অন্বিত। এক জন ছাড়া অন্য জনের ভূমিকা হয়ে যায় নড়বড়ে। সমাজ তথা নারীর মর্যাদা নষ্ট করে যুগী হয় মুহুরীর রক্ষিতা। সচ্ছল জীবন কাটাতে গিয়ে তার এ ভিন্ন অন্য পথ নেই। কেতুপুরের অন্যান্যদের কাছে এ যেন স্বাভাবিক ঘটনা। উলুপী, গোপী এরাও বহমান কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চরিত্র। বশিরের তরুণী স্ত্রী আরও বিশেষ ভূমিকায় উপস্থাপিত এ উপন্যাসে। তাকে ছাড়া ময়নাদ্বীপে মানুষ বৃদ্ধির স্বপ্ন

৭. অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় না। একই ভাবে মমিনও উপন্যাসে পেয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। 'বাপজান', 'বাপজান' বলে তার কান্না আমাদের বেদনার্ত করে তোলে। আমাদের চৈতন্যে স্থান করে নেয় তার দুঃখক্লিষ্ট মুখ :

> আমিনুদ্দির মেয়ে যখন ঘাটে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, নৌকা তফাতে সরিয়া গিয়াছে। বাপজান, বাপজান, বলিয়া আকুল হইয়া মেয়েটা কাঁদিতে লাগিল, নদীতে বুঝি সে ঝাঁপ-ই দিয়া বসে।[৮]

উপন্যাসের নাম 'পদ্মানদীর মাঝি'। স্বাভাবিকভাবেই, এ উপন্যাসে নদীর ভূমিকা মুখ্য হওয়ার কথা। এ উপন্যাসে পদ্মা তার শক্তিমান অস্তিত্ব নিয়েই তীরবর্তী মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত। তার প্রবাহের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন হয়েই দু-তীরের মানুষের বসবাস। পদ্মার অস্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারে না বলেই এ উপন্যাসে পদ্মা একটি জীবন্ত চরিত্র যেন।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের পটভূমি উপস্থাপিত হয়েছে বাস্তব ও শিল্পসম্মতরূপে। কেতুপুর গ্রামে ভূ-স্বামীদের দখল করা জমিতে জেলেদের অধিকার নেই। পূর্ব পুরুষের সময় থেকেই তারা জেলে পাড়ার খুব ক্ষুদ্র পরিসরে ঘর তুলে জীবন যাপন করে। শত ইচ্ছা থাকলেও তারা এ পরিবেশের বাইরে যেতে পারে না। তাদের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মতো আর্থিক ও সামাজিক দৈন্যও দারিদ্র্যের একই দেয়ালে ঘেরা। দরিদ্র জেলেদের বেঁচে থাকার উপায় পদ্মা এবং পদ্মার সঙ্গে মিলিত খালগুলোতে মাছ ধরা। কেউ কেউ নৌকোয় মানুষ ও মালামাল পারাপারের কাজও করে। নদী-নির্ভর এই পেশা ছাড়া তাদের উপার্জনের অন্য কোন পথ নেই। বর্ষা ঋতুতে নদীর পানি বৃদ্ধি পায়, পদ্মা ও তার দু তীর প্লাবিত হয় ; নদীর তীরবর্তী মানুষেরা তখন হয়ে পড়ে অসহায়। জেলেদের আয় যায় বন্ধ হয়ে। প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশে তাদের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা। তাদের জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো অভাবের সে বাস্তব রূপ শুধু মালার আঁতুড়ঘরেই নয়, তা কুবেরের বাবার জীবনেও ওতোপ্রোতভাবে ছিল জড়িয়ে। সে বঞ্চনার জীবন্ত ছবি কুবেরের ঘরের ঢেঁকিটির সঙ্গেও রয়ে গেছে। কেতুপুরের জেলেদের দরিদ্র জীর্ণ জীবনের সঙ্গে নদীর যে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তা উপন্যাসে উপস্থাপিত চিত্রসমূহের মাধ্যমে অত্যন্ত সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কুবেরের ঘরের ঢেঁকির ইতিহাস চিত্রে উপন্যাসের পরিবেশের রয়েছে সম্পর্ক :

> ছোট একটি নৌকায় ছেলেকে সঙ্গে করিয়া হারাধন পদ্মা পার হইতেছিল। নদীর মাঝামাঝি

---

৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

> পুরানো নৌকার তলাটা হঠাৎ কি করিয়া ফাঁসিয়া যায়। তখন আশ্বিন মাস, সেখানে পদ্মার এ-তীরের ও-তীরের ব্যবধান তিন মাইলের কম নয়। পদ্মা যাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে পদ্মার বুকে যত ঢেউ থাক মাইল দেড়েক সাঁতার দিয়া তীরে উঠা তার পক্ষে কষ্টকর কিন্তু অসম্ভব নয়। হারাধন একা হইলে ভাবনা ছিল না। কুবের আর একটু বড় এবং শক্ত-সমর্থ হইলেও সে বিপদে পড়িত না। কিন্তু ছেলে-মানুষ কুবের ভয় পাইয়া সাঁতার দিতে চাহে নাই, দিশেহারা হইয়া ক্রমাগত হারাধনকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন যে লম্বা কাঠের গুঁড়িটা হাতের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া দিয়াছিল, হয়তো তাহা চিতা রচনার জন্যই কেহ শ্মশানে আনিয়াছিল। হারাধন কিন্তু কাঠটি ফেলিয়া দিতে পারে নাই, ঘরের আসবাবে পরিণত করিয়া সাদরে গৃহে স্থান দিয়াছে।[৯]

হারাধনের সাংসারিক অভাবই নদীতে ভেসে যাওয়া কাঠকে কুবেরের সংসার পর্যন্ত নিয়ে এসে আসবাবে পরিণত করেছে। নদীর মধ্যে মৃত্যু মুখেও বেঁচে গেছে তারা। তাদের জীবন ধারার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছে নদী যে, জন্ম-মৃত্যুর মতো অজান্না অধ্যায়েও থাকে তার ভূমিকা।

এ বছর বন্যা ও বর্ষার পানি একত্র হয়ে ডুবে গেছে চিন্নার চর। গ্রামগুলো পাঁচ-সাতদিন ধরে পানির নীচে। কুবেরের শ্বশুর বাড়ি চরডাঙাও ডুবে গেছে পানিতে। বন্যায় ডুবে যাওয়া এলাকার মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকে না যেন। মাচা বেঁধে তার ওপর মানুষ ও পশু একত্রে বেঁচে আছে কোন মতে। এমন কি মায়ের কোল থেকে সন্তান ঘরের মধ্যে পানিতে পড়েও মারা গেছে। ফসলের জমিতে বোনা ফসল নষ্ট হয়েছে, ঘরে তোলা ফসলও জায়গার অভাবে গেছে নষ্ট হয়ে। মানুষ ও পশুর একত্রে বেঁচে থাকার এই করুণ দৃশ্য অবশ্য নদীমাতৃক বাংলায় প্রায় প্রতি বছরই দেখা যায়। বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার সমুদ্র উপকূলে নদীর প্রমত্ততার সঙ্গে রয়েছে পদ্মার ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সম্পর্ক। চরডাঙায় বন্যার সময় মানুষের অসহায়ত্ব প্রসঙ্গে উপন্যাসের এক জায়গায় বলা হয়েছে :

> মাচা হইতে বৈকুণ্ঠ, চালা হইতে অধর, মই হইতে কপিলা আর সাঁকো হইতে উলঙ্গ ছেলে-মেয়েগুলি নৌকায় আসিয়া আরাম করিয়া বসিল।[১০]

বন্যার পানিতে ভাসমান এই দরিদ্র জনপদের জীবন বিপর্যয়ের চিত্র উপন্যাসের প্রতিবেশকে সমর্থন করে নিবিড় ভাবে। কুবের চরডাঙা থেকে কপিলাসহ অন্যান্য বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে

---

৯. ঐ, পৃ. ১৫-১৬
১০. ঐ, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

এসেছে কেতুপুরে, তার শ্বশুরের সাময়িক ভাবে হলেও সাহায্যের জন্যে। দারিদ্র্য-পীড়িত কুবেরের সংসারে এত মেহমান পরিণামে কুবেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। কপিলা কেতুপুরে এসে কুবেরের সংসারে নানা কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে চলছে। সে কুবেরের জন্যে নদীর ঘাটে আসে ঘরে ফেলে যাওয়া তামাক পৌঁছে দিতে। সে সময় কুবেরের প্রতি কপিলার মনে জেগে ওঠে প্রেম। নির্জন সন্ধ্যায় নদীর ঘাটের আবহাওয়া কপিলার প্রেমের সহায়ক। ভরা পদ্মার বুকে বয়ে যাওয়া বাতাস, ঢেউ, শেষ বিকেলের আকাশে ছড়িয়ে পড়া আলো কপিলার মনের ওপর প্রভাব ফেলেছে সহজেই। ফলে কপিলা হয়ে ওঠে অশান্ত। সে কুবেরের হাত ধরে টান দেয়। তাকে নৌকোয় নেয়ার কথা বলে এবং 'আরে পুরুষ' বলে কুবেরের পৌরুষকে ব্যঙ্গ করে। কপিলার প্রেমের এই অসংযত প্রকাশে প্রকৃতি ও নদীর রয়েছে ভূমিকা এবং তা উপন্যাসের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের শর্ত পূরণ করেছে।

নদীর ওপর নির্ভরশীল জেলেদের জীবন পদ্মা ও তার প্রকৃতির মধ্যেই যেন আবর্তিত। নদীই তাদের জীবনের আশা-নিরাশার দুই মেরু। নদীতে মাছ ধরে তারা জীবন চালায়, আবার বন্যায় নদীর পানিতে ভেসে গিয়ে তারা সর্বস্ব হারায়। কখনও বন্যার সঙ্গে ঝড় বয়ে নিয়ে আসে তাদের জীবনে মহা দুর্গতি। এমনই এক ঝড়ের ছোবলে বিপর্যস্ত হয়েছে কেতুপুরের জেলেরা। বন্যা তাদের সর্বনাশ করেছে। প্রায় প্রতিটি ঘর-বাড়িই পড়েছে ঝড়ের কবলে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আমিনুদ্দির, তার স্ত্রী-সন্তান গাছের নীচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। পায়ে আঘাত পেয়ে অচল হয়েছে গোপী। কেতুপুরের মানুষের এমন দুর্দিনে হোসেন মিয়া এসেছে তাদের সাহায্য করার জন্যে। সে ময়নাদ্বীপ গড়ার জন্যে সবই পারে। তাই হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপ-পরিকল্পনা মাথায় রেখে ঋণ দিয়ে টিপসই নিয়ে তাদের ঘর তুলে দিয়েছে। এ ভাবে ধারে বাঁধা পড়া মানুষগুলোই হয়ে পড়বে আরও অসহায় এবং তখন ময়নাদ্বীপ যাওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না—এই লক্ষ্যে হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে এক সুদূরপ্রসারী নক্সা। ময়নাদ্বীপের ভিত্তি গড়ার ক্ষেত্রে হোসেন মিয়াকে সাহায্য করেছে প্রাকৃতিক ঝড়-জলোচ্ছ্বাস। নদীতে তুফান আর ডাঙায় ঝড়ের কবলে ক্ষতিগ্রস্তদেরই ঋণ দেয় হোসেন মিয়া এবং তাদেরকেই সে ময়নাদ্বীপ নিয়ে যাওয়ার কৌশল করে। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং বিপন্ন মানুষগুলোর হোসেন মিয়ার সাহায্য নিতে বাধ্য হওয়া এ সবই হোসেন মিয়ার অনুকূলে।

Dhaka University Institutional Repository

কুবের হোসেন মিয়ার সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ দেখতো সন্দেহের চোখে। কিন্তু যে দিন সে অর্থ কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য চাকরি নেয় তার নৌকোয়, সে দিন থেকেই কুবের হয়ে পড়ে হোসেন মিয়া-নির্ভর। পদ্মার উজান ভাঁটায় কুবের নৌকা নিয়ে চলাচল করেছে ; এমন কি ময়নাদ্বীপও গিয়েছে সে। এ ভাবে কেতুপুরের বাইরেও বৃহৎ পানি অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে কুবের, গণেশ ও অন্যান্যদের। এই পানি অঞ্চল কেতুপুরের বাইরে হলেও তা উপন্যাসের পরিবেশ ব্যাহত করে নি। কুবেরদের সঙ্গেও হোসেন মিয়া সারারাত মেঘনার মোহনার দ্বীপগুলো সম্পর্কে গল্প করে এবং ময়নাদ্বীপে পৌছানোর পথ নির্দেশ করে। চতুর্দিকে পানিবেষ্টিত অঞ্চলের মাঝে জেগে ওঠা ক্ষুদ্র দ্বীপগুলো ভাসমান ভেলার মতো। ময়নাদ্বীপও তেমনি একটি দ্বীপ। ময়নাদ্বীপের ভৌগোলিক পরিচিতি উপন্যাসের পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুকূল :

> দ্বীপের খানিকটা ডিম্বাকৃতি, খানিকটা ত্রিকোণ। দ্বীপের দীর্ঘতম পরিসর প্রায় এগার মাইল—হোসেন নিজে মাপিয়া দেখিয়াছে। দ্বীপে যেখানে নৌকা ভিড়িয়াছিল, সেদিকে খানিকটা অংশ পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপিত হইয়াছে, চাষ হইতেছে, বাকি অংশ জঙ্গলে ঢাকা। পশ্চিম দিকে অসংখ্য নারিকেল গাছ, সমস্ত দ্বীপে ছড়াইয়া না পড়িয়া গাছগুলি একস্থানে ঘন হইয়া মাথা তুলিয়াছে কেন, বোঝা যায় না।
>
> জমি অত্যন্ত নীচু, এত নীচু যে আশঙ্কা হয় যেদিন খুশী হইবে সেই দিনই সমস্ত দ্বীপটিকে সমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিবে। দ্বীপের মাঝখানে এক মাইল পরিমিত একটা লোনা জলা আছে, সমুদ্রের চেয়েও ওখানটা বুঝি নীচু, খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দিলে সমুদ্রের জল আসিয়া ভরিয়া ফেলিবে।[১১]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের পরিবেশে অনির্দেশিতভাবেই নদী ও প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। নদী ও প্রকৃতির অনুগত একদল মানুষ এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সে মানুষেরাই হোসেন মিয়ার সঙ্গে বসবাসের অনুপযুক্ত ময়নাদ্বীপে গিয়েছে। এবং সে স্থানটির অবস্থা হলো :

> কেতুপুরের তীরবর্তী পদ্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মেঘনা ও তার বুকের বিস্তৃত জলরাশি অতিক্রম করে নদীর বুকে জেগে উঠা তীর ময়নাদ্বীপ অতিসাধারণ, জনহীন, সুবিধাহীন।[১২]

উপন্যাসটির বর্ণনা অংশে সাধু ও চলিত গদ্যরীতির মিশ্রণ মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও তার গদ্য সাধারণভাবে ত্রুটিহীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলা উপন্যাসের একাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের গদ্য সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে সাধু ও চলিত রীতির, মিশ্রণ যেন তাঁদের

১১. ঐ, পৃ. ১২৭-১২৮
১২. আশিস কুমার দে, উপন্যাসের শৈলী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

একটি অভ্যাস। হয় তাঁরা বিশুদ্ধ বাংলা গদ্য লিখতে সক্ষম নন, না হয় তাঁরা ইচ্ছে করেই এ কাজটি করেছেন। তাঁদের এই ইচ্ছা হয়তো প্রভাবিত হয়েছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালীদের ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। এ কথা বলা হয়তো বেমানান হবে না যে, 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে লেখক বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষ্যযোগ্য যে, সাধারণ বাঙালীরা সাধু-চলিত মিশ্রিত ভাষাই বেশি ব্যবহার করে থাকে। সে সময় সাধু-চলিত রীতি মিশ্রিত গদ্যে উপন্যাস রচনা করা হতো ; সাধু রীতিতে রচিত সংলাপেরও বহুল প্রচলন ছিলো। শিক্ষার মাধ্যম সাধুরীতির গদ্য থাকায় পাঠকবৃন্দের সাধু রীতির প্রতি আগ্রহ অস্বাভাবিক নয়। প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে'ও রয়েছে সাধু চলিত রীতির মিশ্রণ। স্পষ্ট করেই বলা যায় 'আলালের ঘরের দুলাল' বইটি আসলে সাধু রীতিতেই রচিত। পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকরাও সাধু-চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে যেন একটা মিশ্র ভাষা তৈরি করেছেন। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সাধু ও চলিতের মিশ্রণ করতে গিয়ে 'তাহার' স্থানে 'তার', 'যাহার' স্থানে 'যার', 'যাহাকে তাহাকে'র স্থানে 'যাকে তাকে', 'ধরিবার' স্থানে 'ধরার', 'কাহারও' স্থানে 'কারো' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করেছেন সাধুরীতির বাক্যের মধ্যে। যেমন :

ক. পদ্মায় ইলিশ মাছ *ধরার* মরসুম *চলিয়াছে*।[১৩]

খ. শরীর *থাক* আর *যাক*, এ সময় একটা রাত্রিও ঘরে *বসিয়া থাকিলে* কুবেরের *চলিবে* না।[১৪]

গ. দুখানা কুঁড়ে *যার* সম্বল *তার* স্ত্রী আর কোথায় সন্তানকে জন্ম *দিবে*।[১৫]

ঘ. *তার* যতখানি সাধ্য সে *তা করিয়াছে*।[১৬]

ঙ. সোনাখালির একটি পাত্র হোসেন ঠিক *করিয়া* দিয়াছে গোপীর জন্য, নাম *তার* বঙ্কু, বয়স বেশী নয়। এ জগতে বঙ্কুর আপনার *কেহ* নাই বটে কিন্তু হোসেন মিয়া আছে। হোসেন মিয়া *যার* মুরব্বি, কিসের অভাব *তার* ?[১৭]

যে কোন বাংলা উপন্যাসের মতো 'পদ্মানদীর মাঝি'তে তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে দুর্বোধ্য তৎসম শব্দ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পারতপক্ষে ব্যবহার করেন নি। তার একটি কারণ সম্ভবত এই যে, সে সময় সরল ও সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো, মানিক নিজেও ঋজু ও সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার পছন্দ করতেন। বিষয়টি যাচাই করার জন্যে উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদের একটি করে পৃষ্ঠার

১৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১
১৪. ঐ. পৃ. ৪
১৫. ঐ, পৃ. ২০
১৬. ঐ, পৃ. ২১
১৭. ঐ, পৃ. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

শব্দাবলি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তাতে আমাদের বক্তব্যই প্রমাণিত হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত শব্দ প্রায় দেড় শ থেকে দুশ। কোন পৃষ্ঠাতেই বিশ পঁচিশটির বেশি তৎসম শব্দ নেই। সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলোতে ব্যবহৃত কয়েকটি তৎসম বা তৎসমজাত শব্দের উল্লেখ করা হলো :

প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১ বর্ষার, দিবারাত্রি, অনির্বাণ, রহস্যময়, দুর্বোধ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১৮ পর্যন্ত, স্থলপথ, জলপথ, প্রথম, পণ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৪৮ অকারণ, ত্রাসে, বিপদ, রাত্রে, প্রকাণ্ড।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৬৭ গতি, আবদ্ধ, নীভূত, শয্যায়, স্বপ্ন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৭৩ প্রবল, বৃষ্টি, নিবিড়, গর্জন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৯৫ ঘুমন্ত, স্নান, লজ্জা, স্বামী এবং

সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১০৩ সন্দেহ, চিন্তিত, চিরদিন, বপন, জীবিকা ইত্যাদি।

লক্ষ্যযোগ্য যে, তিনি পারত পক্ষে দুর্বোধ্য তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন নি তাঁর ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই বহু লেখকের রচনায় বার বার ব্যবহৃত এবং সে কারণেই সকল পাঠকেরই নিত্য পরিচিত। যে সব তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন সে গুলো একই কারণে সহজবোধ্য। বস্তুত, তাঁর লক্ষ্য ছিলো প্রায় প্রত্যেক পাঠকের কাছে বক্তব্য পৌছানো। সে কারণে তাঁর শব্দ ব্যবহারে সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতা প্রাধান্য পেয়েছে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মা ও জেলেদের সম্পর্ক এবং প্রকৃতির অধীন অসহায় মানুষের অবস্থা মূর্ত হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষায়। সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ চরিত্রে আরোপ করেছে বাস্তবতা ও শৈল্পিক সুষমা। উপন্যাসটির ভাষার বৃহত্তম অংশ জুড়ে রয়েছে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সংলাপ। চরিত্র অনুযায়ী ব্যবহৃত এ ভাষা ও সংলাপ উপন্যাসের গতিকে করেছে প্রবহমান। তবে, উপন্যাসে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা নিপাট আঞ্চলিক নয়, ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই সব মানুষের বোধগম্য আঞ্চলিক শব্দাবলি নির্বাচন করেছেন। সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে চরিত্রে আরোপিত হয়েছে বাস্তবতা ও শৈল্পিক গুণ। মানব রিপুর বহিঃপ্রকাশে অনেক আঞ্চলিক শব্দ হয়েছে খুবই মোক্ষম। গীতগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিক ভাষা। ঔপন্যাসিক প্রায় নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন পদ্মার জেলেদের পেশাগত ভাষা। তরঙ্গায়িত শব্দের সাহায্যে তারা ব্যবহার করে সাংকেতিক ভাষা। ধ্বনি-তরঙ্গ-নির্ভর এ ভাষা পদ্মার মাঝিরা সহজেই বুঝতে পারে। অন্যান্য দেশে নিশ্চয়ই জেলেদের মধ্যে এক ধরনের সাংকেতিক ভাষা চালু আছে। পদ্মায় ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দগুলো জেলেদের

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের সঙ্গে যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। যেমন, শ্লেষ মিশ্রিত আঞ্চলিক ভাষায় নকুল কুবেরকে বলে :

> শ্যাষ রাইতে তর বৌ খালাস হইছে কুবির। ...তুই ত দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা ? ঘরে ত থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।[১৮]

মানব-সম্পর্কের প্রতিটি বিষয় প্রকাশেই সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সংলাপ। বাপের বাড়িতে পুকুরে কপিলা কুবেরকে বলেছে :

> ক্যান মাঝি ক্যান ? আমারে ভাব ক্যান ? সোয়ামীর ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি—পুরুষের পরাণ পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি; ভুইলো আমারে। ছাড় মানুষ আহে।[১৯]

'পদ্মানদীর মঝি' উপন্যাসটির ভাষা সম্পর্কে আলোচনা কালে উল্লেখ্য যে:

> ... মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের উপভাষাও ব্যবহার করেছেন, আবার পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন উপভাষা চরিত্রের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে (পরিপ্রেক্ষিতে?) দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ... দেখা যাচ্ছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চল থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী যশোর, খুলনা অঞ্চলের উপভাষার যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি আবার পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, কুমিল্লা এবং ঢাকা জেলার উপভাষাও ব্যবহার করে তাঁর চরিত্রগুলোকে আরও বিশ্বস্ত করে তুলেছেন। আবার পাহাড়ী অঞ্চলের বিশেষ পেশার মানুষের মুখের ভাষাও হুবহু উচ্চারিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে।[২০]

বলা বাহুল্য, অনুরাগের এমন শিল্পসম্মত প্রকাশে আঞ্চলিক ভাষা কোন অন্তরায় হয় নি। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে গ্রথিত দুটি গীতের কথায়ও রয়েছে আঞ্চলিক ভাষা। গীত দুটো আঞ্চলিকতার সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যকেও স্মরণ করিয়ে দেয় :

> আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
> বোনধু কত ঘুমাইবা।
> বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা অকাল ফসল রোও
> মিয়া কত ঘুমাইবা।
> মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার কুপি,

---

১৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
১৯. ঐ, পৃ. ১৬৭
২০. সালিম সাবরিন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ব্রাত্যজীবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭৩-৭৪

Dhaka University Institutional Repository

উঠ্যা দেখবা না। ...
তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ-নাও
দিল-জাগানি আলেন যিনি, মিয়া,
চিরা-মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কনে যাও? ...
মাঝি কত ঘুমাইবা।

এবং

পিরীত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই!
আগুন যাওন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ!
আ লো সই!
থাকলি ঘরে ছ্যাচন কেমন, ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি, মনের পোড়ন ভাইজা করে খৈ।
আ লো সই।[২১]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে যারা কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপ গিয়ে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছে, তারাও পারে নি সেখানে কোন আলাদা ভাষা তৈরি করতে। কেতুপুর ও ময়নাদ্বীপের ভাষা একই। প্রত্যেক মানুষই বহন করে তার মাতৃভাষা। কেবল কেতুপুরের মানুষই যদি বসতি গড়ে তোলে ময়নাদ্বীপে, তা হলে সেখানকার ভাষাও যে হবে কেতুপুরের ভাষাই তা সহজবোধ্য।

'পদ্মানদীর মাঝি'তে লেখক প্রয়োজন মতো অনুপ্রাস, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। তবে সেগুলোর পরিমাণ বেশি নয়। এ ধরনের উপাদান ব্যবহারের সময় লেখক বেশি লক্ষ্য করেছেন সেগুলোর অর্থময়তা। খিলখিল, সাঁসাঁ, ফুটফুটে, ছমছম, থৈ থৈ, খাঁ খাঁ, কনকন, হাউমাউ, বিড়বিড় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের ঐ মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে। অনেক সময় দ্বিরুক্ত বা দ্বৈতশব্দ বাক্যের ধ্বনি মাধুর্য এবং অর্থের গৌরব বৃদ্ধি করে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বহু শব্দদ্বৈত বাক্যের ধ্বনি মাধুর্য ও অর্থের স্পষ্টতা সৃষ্টিতে পালন করেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। ঘুরিয়া ঘুরিয়া, মাঝে মাঝে, কাঁপিতে কাঁপিতে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, বলিতে বলিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, হাঁটিতে হাঁটিতে, মাখিতে মাখিতে প্রভৃতি শব্দদ্বৈত এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এ উপন্যাসের বাক্যের মধ্যে আছে বহু অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা। বিভিন্ন শব্দে একই আদ্যক্ষর থাকার কারণে তৈরি অনুপ্রাসের সুর বাক্যের মধ্যে ছড়ায় কাব্যিক সৌরভ। 'সংকীর্ণ সংসার' এর মত অনেক অনুপ্রাসজাত বাক্যাংশ রয়েছে এ উপন্যাসে। আলোচ্য উপন্যাসের শৈল্পিক সৌষ্ঠব নির্মাণে উপমা-চিত্রকল্পের রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। নিম্নে কয়েকটি উপমা প্রয়োগের নমুনা দেওয়া

২১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০, ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

হলো :

ক. মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নিলাভ মণির মত দেখায়।[২২]

খ. পাখির ছানার মত অবসন্ন ছেলে দুটি।[২৩]

গ. বাঁশের কঞ্চির মত অবাধ্য কপিলা।[২৪]

এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের উক্তি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন :

> প্রতীকধর্মিতা আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২৫]

প্রায়ই সাধু ও চলিত রীতিমিশ্রিত একটি তৎসম-তদ্ভব-দেশী-বিদেশী ও আঞ্চলিক শব্দে সমৃদ্ধ ভাষা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কমনীয় গদ্যশৈলী। তা ছাড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, উপমা প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার এর গদ্যশৈলীকে দিয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ শিল্প-সুষমা। বস্তুত, বস্তুবাদী ও বাস্তববাদী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি এ উপন্যাসকে যেন দিয়েছে অনন্য শৈল্পিক গৌরব। লেখক ইচ্ছা করলে এ উপন্যাসের পরিচ্ছেদ বৃদ্ধি করতে পারতেন ; এমন কি সাতটি পরিচ্ছেদেই তিনি আরও বর্ণনা সংযোজন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি ; বরং নির্মোহ দৃষ্টিতে পরিমিত পরিসরে তার প্রায় হুবহু চিত্র তিনি এঁকেছেন এ উপন্যাসে। ফলে উপন্যাসের ভাষাশৈলী লাভ করেছে এক অসাধারণ শিল্প-মর্যাদা। এ প্রসঙ্গে জসীম উদ্‌দীনের 'নক্‌শী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি উল্লেখ করা যায়। ট্রাজিক এ কাহিনী-কাব্যটি রচিত হয়েছে মাত্র তেরটি কবিতা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যেও এই পরিমিতি বোধ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি বিবেচনায় আনা যায় :

> মালার কাছে বসিয়া তাহারা ভাত খায়, এক ছেলের মুখে স্তন গুঁজিয়া রাখিয়া আর দুজনকে ভাত মাখিয়া গ্রাস মুখে তুলিয়া খাওয়ানোর শখ মালার একার নয়, এমনিভাবে খাওয়াইয়া না দিলে ওরা খাইতে চায় না। আর হ, মালা রূপকথা বলে। মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়, তাই এ সময়টা সে যে কত বড় নিখুঁত ভদ্রমহিলা, অসামঞ্জস্য তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়। লখা ও চণ্ডী উলঙ্গ, চকচকে ভিজা-ভিজা গায়ের চামড়া। ডিবরির শিখাটি ঊর্ধ্বগ ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরের চাল পচা শণের, চারি পাশের দেয়ালে চেরা বাঁশের স্যাঁতসেঁতে ঢেউতোলা মাটির মেঝে। আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী। অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার।[২৬]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের ভাষা ও সংলাপ সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> কখনো বিবৃতির, কখনো ভাষা টিপ্পনির। সাংবাদিকের টীকা, বৈজ্ঞানিকের প্রতিবেদন, চিকিৎসকের নির্ণয়গ্রাহী মন্তব্য, একই সঙ্গে এ ভাষার সম্বল। লেখক কখনো চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছেন, চরিত্রের সংলাপকেই কখনো লেখকের মন্তব্যে অনূদিত করে দিয়েছেন।

২২. ঐ, পৃ. ১
২৩. ঐ, পৃ. ৫৭
২৪. ঐ, পৃ. ১৭২
২৫. রামেশ্বর শ', আধুনিক বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৮১
২৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

> আবার কখনো চরিত্রের পাশে দাঁড়িয়ে চরিত্রের ভিতরটাকে এক নজর দেখিয়ে দিয়েছেন কোন সংকোচ ভণিতা না করেই—নিজেই নিজের সৃষ্ট চরিত্রের অসংগতি নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন—যেন তিনি স্রষ্টা নন, নিছক দ্রষ্টা মাত্র।[২৭]

'পদ্মানদীর মাঝি'র মনোহরী ভাষা আসলে কোন কৃত্রিম ব্যায়ামসৃষ্ট নয়। এ ভাষা ছিল ঐ এলাকার মানুষের মুখে, ছিল যেন মানিকের হৃদয়েও। সে কারণেই এ উপন্যাসটির ভাষা লাভ করেছে অপরূপ এক শোভা। একজন সমালোচকের ভাষায় :

> যে ভাষা ঘটিরাম ডেপুটির মুখে পশ্চিমবঙ্গে কেরিকেচারের 'অপভাষা' হয়েই বিরাজ করছিল, সেই ভাষাই সাহিত্যের সুখ-দুঃখের বাহন হয়ে দেখা দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাপার, তার ব্রাত্য মানুষ সজীব হয়ে উঠল। মানিক এদের চিনতেন, এদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম দরদ, তাই এই অমর রূপায়ণ সম্ভব হল। তিনি বলেছেন, বালিকা বালিগঞ্জে, অসংস্কৃত লেকের ধারে বসে তিনি ভাবতেন এদের কথা। 'ভেসে আসত খালের ধারে, নদীর ধারে, গ্রামের ধারে বসানো গ্রাম—চাষী, মাঝি, জেলে তাতীদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ, ... ঐ মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাঁচাত—ভাষা দাও, ভাষা দাও।' তাই ভাষাই তিনি দিলেন—আর তা অমর ভাষা। পরিবেশে এল বাস্তবতা।[২৮]

সার্থক ঔপন্যাসিকের জীবনবোধের পরিচয় মেলে তাঁর রচনায়। কাহিনী, চরিত্র, ভাষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে লেখকের জীবনাদর্শের ছাপ পড়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের কথা উল্লেখ করা যায় :

> ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ গড়ে ওঠে তাঁর সময় জ্ঞান, ইতিহাস জ্ঞান এবং ব্যক্তি-মানুষের জ্ঞান ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে। লেখকের এই সামগ্রিক জ্ঞানই জীবন দর্শন রূপে প্রতিফলিত হয় উপন্যাসের প্রতিটি অংশে।[২৯]

বাস্তবতার ভিত্তিতে লেখকের নিবিড় দৃষ্টির অন্তরঙ্গ আলোকে উন্মোচিত হয়েছে কেতুপুরের জেলেগোষ্ঠীর জীবনচিত্র এ উপন্যাসে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মানুষের আশা-সংগ্রাম, সফলতা-ব্যর্থতার কথা বলেছেন। এবং সেটাই প্রার্থিত। একজন সমালোচক বলেছেন :

> উপন্যাসের প্রথম ও শেষ অন্বিষ্ট মানুষ, তার জীবন। সুতরাং উপন্যাস জীবন সংলগ্ন আলেখ্য।[৩০]

---

২৭. নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা.), মানিক সাহিত্য-সমীক্ষা, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৯৭
২৮. মানিক গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, আলোচনা ও গ্রন্থ পরিচয়, গ্রন্থ- পরিচয়: অশোকগুহ, কলকাতা, ১৩৭০, পৃ. ধ
২৯. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ: বাংলা কথা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৭০
৩০. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সন্ধান, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

এ আলেখ্য নির্মাণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক নির্ভরশীল হয়েছেন :

> তাঁর শৈশব থেকে ঘুরে ঘুরে দেখা বাংলার মানুষের বাস্তব জীবনের উপর। সে জীবন সংগ্রামের কঠোর নগ্ন বাস্তবতা।[৩১]

পদ্মা তীরবর্তী জনগোষ্ঠী জেলেদের জীবন বঞ্চনার রহস্যই যেন উন্মোচিত হয়েছে হোসেন মিয়ার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। হোসেন মিয়াও এক ধরনের সামন্ত-অবশেষ, সে কৌশলে শোষণ করে জেলেদের ; বিভিন্ন অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করে প্রভাব বিস্তার করে। জেলেগোষ্ঠীর জীবনে। মেজকর্তা ও হোসেন মিয়া দুই শোষকের ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও শোষিতদের জন্য তা একই রকম বিষময়। হোসেন মিয়া নিজ উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে ময়নাদ্বীপ নামের এক সাম্রাজ্য। হোসেন মিয়ার সারা জীবনের ন্যায়-অন্যায় সব কাজের মূলে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে এই ময়নাদ্বীপ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। হোসেন মিয়ার জীবন সংকল্পের এই বাস্তবতার সঙ্গেই তুলনীয় বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানস-প্রবণতা। কেউ কেউ ময়নাদ্বীপকে মনে করেছেন 'ইউটোপিয়া'; এবং ঐ ইউটোপিয়ার কল্পকার ও রূপকার হচ্ছে হোসেন মিয়া। এ বিষয়টি আজও রয়ে গেছে রহস্যময়। সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> হোসেন মিয়ার ইউটোপিয়া-প্রীতির উল্লেখেই তার চরিত্রের ব্যাখ্যা কার্য শেষ করতে চাই বলে হোসেন মিয়ার সম্যক তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। ...হোসেন মিয়ার মত কল্পনাসিদ্ধ চরিত্র বাংলা উপন্যাসের চরিত্রমালায় আর একটিও নেই।[৩২]

আর একজন সমালোচক হোসেন মিয়ার আমূল রূপান্তর হয়েছে বলে মনে করেন। ঐ 'ইউটোপিয়া'য় শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে যাঁরা মনে করেন বোধ করি তাঁদেরই সমর্থনে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, " 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন মিয়ার ব্যক্তিত্বের রূপান্তর সাধিত হলো অহিংসার সত্যানন্দে...।"[৩৩] একজন তরুণ সমালোচকও 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ময়নাদ্বীপের প্রতীকে অসাম্প্রদায়িক সাম্যবাদী... সমাজের আভাস দিয়েছেন'[৩৪] বলে মন্তব্য করেছেন।

সমালোচকদের এ সব মন্তব্য শিথিল হয়ে যায় যখন হোসেন মিয়াকে মতলববাজ বলে মনে হয়। সে তার স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যে ধারাবাহিকভাবে লিপ্ত হয়েছে নানা অপকর্মে। হোসেন মিয়া আফিমের চোরাকারবারী। এটি নৈতিক স্খলনের প্রমাণ। অথচ সুযোগ বুঝে সে আবার ঝড় বিধ্বস্ত কেতুপুর-

400637

৩১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য করার আগে, মানিক গ্রন্থাবলী, ১২শ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৬০
৩২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৭৮-২৭৯
৩৩. নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ৩৭
৩৪. সালিম সাবরিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

বাসীর ভাগ্য বিধাতা রূপে প্রতিষ্ঠা পাবার অপচেষ্টা করেছে। সে জেলেদের বিপদে টাকা দিয়েছে, ঘর তুলে দিয়েছে। কিন্তু সুযোগ মতো খতে টিপসই নিতে ভুল করে নি। এই খত আসলে দাসখত, এই খত জেলেদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়ার এক নিশ্চিত কৌশল। এখানেই হোসেন মিয়ার চাতুর্য ও প্রতারণা ধরা পড়ে। এ জাতীয় ঋণ ব্যবস্থাকেই দাদন বলা হয়। এক ধরনের চতুর লোক এই দাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ সরল মানুষকে ঠকিয়ে টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। এই ব্যবস্থা রদ করার জন্য শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের চেষ্টায় আইনসম্মতভাবে গঠিত হয় ঋণসালিশি বোর্ড যার মাধ্যমে বহু ঋণগ্রস্ত মানুষ হয় ঋণমুক্ত। হোসেন মিয়ার দাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> তারপর একখানা খত বাহির করিয়া বলিল, টিপসই দেও কুবির—একুশ টাকা দশ আনার খত লিখিছি—বাদ দিছি দুই টাকা। টিপ সই দিয়া রাখ, যখন পারবা দিবা—না দিলি মামলা করুম না বাই! — হোসেন মিয়া মৃদু হাসিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, খত কিসির? লিখা থুইলাম, হিসাব থাকব—না-ত কিসির কাম খত দিয়া?[৩৫]

জীবনযাত্রার অনুপযোগী সামুদ্রিক দ্বীপ ময়নাদ্বীপ নামের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার রূপে হোসেন মিয়া কেতুপুরের গরীব জেলেদের ব্যবহার করেছে। নিষ্ঠুরের মতো সে নির্বাসনে পাঠিয়েছে কেতুপুরের দরিদ্র জেলেদের। হোসেন মিয়ার কাছে তারা যেন দাস শ্রমিক। ময়নাদ্বীপের সামাজিক নিয়ম-কানুন শিথিল, ধর্মীয় বিধি-বিধানের নেই বিশেষ কোন বালাই। যে দিন ময়নাদ্বীপ উপযুক্ত হবে মনুষ্য বসবাসের, সে দিন তৈরি হবে কঠোর জীবনবিধানও। হোসেন মিয়ার স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় দেখা যায় অর্থের কাছে সকলের পরাভব মানার দৃশ্য। কুবের মাঝি হোসেন মিয়ার সাহায্যকে দেখতো সন্দেহের চোখে, সে আজ হোসেন মিয়ার নৌকার প্রধান মাঝি। কুবের আজ হোসেন মিয়ার স্বপ্ন পূরণের সহায়ক উপকরণ যেন। অর্থের কাছে, হোসেন মিয়ার ক্ষমতার কাছে কুবের বার বার হেরেছে, সে তার কন্যা গোপীকে তাই হোসেন মিয়ার পছন্দের ছেলে বঙ্কুর সঙ্গে দিয়েছে বিয়ে। এই অর্থ-ক্ষমতার কাছে নিবেদিত সকলেই, এমন কি যোগীও অর্থলোভে হয়েছে সম্পদশালী মুহুরীর যৌনাকাঙ্ক্ষার দাসী। যৌনতার স্পষ্ট প্রাধান্য উপন্যাসে না থাকলেও উপন্যাসের গভীরে রয়েছে তার প্রভাব। যৌনতা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করলেও তজ্জাত অতৃপ্তি মানুষের জীবনে গভীর শূন্যতা তৈরি করতে পারে। সে রকম শূন্যতা বহন করেই কপিলা

---

৩৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

কেতুপুরে আসে। কপিলার রঙ্গ-রসধর্মী আচরণে কুবের মুগ্ধ হয়, ফলে পঙ্গু নারী মালার ভক্তিপূর্ণ প্রেমের আবেদন ক্রমে কুবেরের কাছে আসে কমে। এ ছাড়া মালাকে জড়িয়ে মেজকর্তার প্রসঙ্গ কুবেরকেও করে মাঝে মাঝে উত্তেজিত, কপিলার সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়ার কারণে তা ওঠে আরও জ্বলে। সে কারণেই কুবের কপিলার দেখা পেতে ছুটে যায় আকুরটাকুর। কুবের ও কপিলার প্রেম অবশেষে গন্তব্যের পথে যাত্রা করে পুলিশের ভয়ে। রাসুর প্রতিহিংসা কুবেরকে জড়িয়েছে পুলিশি মামলার ফাঁদে। এ মামলা-জেল-জরিমানা থেকে বাঁচতেই শেষাবধি কুবের কপিলাকে সঙ্গে করে হোসেন মিয়ার তত্ত্বাবধানে ময়নাদ্বীপে যায় পালিয়ে। নিজ স্ত্রী-সন্তান-চেনাজন, সমাজ-সংসার ফেলে মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত ময়নাদ্বীপ মেনে নেয় কুবের।

কেতুপুরের দরিদ্র মাঝিদের জীবনে বঞ্চনার পটভূমি তাদের গরিবী জীবন। এই গরিবী জীবনের ওপর হোসেন মিয়ার প্রভুত্ব কেতুপুরবাসীর জন্যে সুখের হয় নি। অর্থ-ক্ষমতা-যৌনতা সব কিছুতেই হয়রানির শিকার তারা। ধূর্ত হোসেন মিয়া সমাজ বাস্তবতার মূর্ত প্রতীক, তার-ই মনোবাসনা পূরণের জন্যে তার-ই তৈরি বলয়ে ঘুরপাক খেয়েছে কেতুপুরের নিঃস্ব অসহায় মানুষগুলো। তাদেরই মর্মবেদনায় বিদ্ধ ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ ; এবং সে বাস্তবতারই প্রায় মহাকাব্যিক কাহিনী 'পদ্মানদীর মাঝি'।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন চিত্র : নদী ও নারী

পদ্মা নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন বাস্তবতা অবলম্বনে হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) 'নদী ও নারী' উপন্যাস (১৯৪৫) রচনা করেন। নদীপ্রবাহ জীবনপ্রবাহ ও সময়প্রবাহকে একীভূত করে জীবনের সমগ্রতা নির্মাণের প্রচেষ্টাধন্য এ উপন্যাস।[১] নদীর গতিশীল প্রবাহ পথে ভাঙনে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে নদী তীরবর্তী মানুষেরা হয় বিপন্ন। আবার তারা সে নদীর বুকে জেগে ওঠা পলল তীরেই ঘরবাড়ি তৈরি করে নতুন জীবনের স্বপ্ন বোনে। নদীর এ দ্বিমাত্রিক আচরণের অধীন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও সফলতা-ব্যর্থতার ছবি এ উপন্যাস। উপন্যাসের বিশাল ভৌগোলিক ক্যানভাসের মানুষেরা পদ্মার প্রমত্ততার কাছে যেমন পরাভূত, তেমনি তারা পদ্মার ওপর নির্ভরশীলও। 'নদী এখানে কেবল বিনাশী শক্তি নয়, প্রাণদায়িনীও বটে'।[২] পদ্মার প্রচণ্ড বৈরিতার বিরুদ্ধে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সংগ্রামশীল জীবনসন্ধানী নজুমিয়া, আসগর ও মালেক। এ তিনটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'নদী ও নারী'। এখানে মাটি, নদী ও নারীর ঐক্যসূত্রে সামষ্টিক জীবনের অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছে। যথাক্রমে নজুমিয়া, আসগর, নূরু ও মালেক নামে তিন খণ্ডের উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত চরিত্রদের জীবনযুদ্ধই এ উপন্যাসের বিষয়। নজুমিয়ার আশা-নিরাশা তথা জীবন সংগ্রাম পরিকল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে পদ্মা তীরবর্তী মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রকৃত প্রয়াস। এ উপন্যাস সম্পর্কে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> পদ্মার নিষ্ঠুর বৈরিতার বিরুদ্ধে তীরবর্তী মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়াস পায় ; কিন্তু নির্মম পদ্মা, গ্রিক-ট্রাজেডির অমোঘ নিয়তির মতো, মানুষের স্বপ্নকে দেয় ভেঙে।[৩]

তবু এ পদ্মার প্রতিবেশী সংগ্রামী আর স্বাপ্নিক নজুমিয়া-আসগর-বসির-মালেক-কুলসুম- নূরু প্রমুখ কেউ-ই মাথা নত করে না পদ্মার প্রমত্ততার কাছে। পদ্মার ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়েও আবার তারা আশায় বুক বাঁধে, পাড়ি দেয় সুদূর পদ্মায় ভেসে ওঠা অন্য কোন স্বপ্নময়ী দ্বীপে।

---

১. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ: কথাসাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১১২
২. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৮
৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মার তীরে দাঁড়িয়ে নজুমিয়া তার অতীত দরিদ্র জীবনের কথা মনে করে। বিদেশী বিত্তহীন দারিদ্র্যপীড়িত নজুমিয়া ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলো পদ্মার তীরে। সে জেনেছিলো সেখানে জমি পাওয়া যায়। সে জমি আবাদ করে ফসল ফলিয়ে ভালো ভাবে জীবন ধারণ করা যায়। নজুমিয়া পদ্মার চড়ায় গিয়ে আশ্রয় পায় সর্দার রহিম বখসের কাছে। রহিম বখস পদ্মার তীরের সকল কৃষককে ভালো-মন্দের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। তার ভাবনা জীবনমুখী। সে সকলের বাসস্থানের কথা ভাবে, প্রত্যেকের ফসল ফলানোর কথা চিন্তা করে। সর্দার সবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে, সামর্থ্য অর্জন না করে কেউ বিয়ে করতে পারবে না। জমি ও স্ত্রী একত্রে বশে আনা যায় না বলে সর্দারের ধারণা। জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি চাষের উপযুক্ত করে তুলতে শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, সংগ্রাম ও সাধনার দরকার। সে জন্য ভুলতে হবে স্ত্রীর ভাবনা । নজুমিয়া নিজের জীবনের উন্নতির জন্যে সর্দারের নির্দেশ মেনে নিয়েছে। জীবনের প্রতি নজুমিয়ার ছিল অপরিসীম মমতা। অর্থ-সম্পদ উপার্জনের তাগিদ নজুমিয়াকে উৎসাহিত করেছিল হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করতে। জঙ্গল কেটে আবাদ করলে দু তিন গুণ ফসল পাওয়া যায়। বর্ষার সময় আউশ ধান আর চৈত্র বৈশাখে চৈতালী ফসল পাওয়া যায়। এ ফসল ফলাতে চাই পরিশ্রম। আর পরিশ্রম করেই নজুমিয়া সর্দারের আশীর্বাদ লাভ করেছে। দরিদ্র, সর্বস্বান্ত নজুমিয়ার ভাগ্যের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে মূল সহায়তা মিলেছে সর্দারের কাছ থেকে। নজুমিয়ার সংগ্রামশীলতা তীব্র আন্তরিকতাপূর্ণ। তাই এক জোড়া গরু দিয়ে পালাক্রমে সবাই জমি চাষ করে। কিন্তু সমস্যার হয় না সমাধান। চাষের ক্ষেত্রে এ সীমাবদ্ধতা দূর করতে নজুমিয়া বন্ধু আসগরের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেরাই জোয়াল কাঁধে তুলে নেয়। তাদের এ সাফল্যে স্থানীয় সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> বুড়োর দলকে তাজ্জব বানিয়ে হালে কাঁধ দিল নজুমিয়া আর আসগর, দেখাদেখি আরো কয়েকজন শুরু করে দিল। বলদের অভাবে তাদের চাষ আর ঠেকে থাকবে না।[৪]

এমন বাস্তব ও জীবনমুখী সংগ্রামের জন্যেই নজুমিয়া আর্থিক ও সামাজিক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়। পদ্মার তীরে দাঁড়িয়ে নজুমিয়ার অতীত স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে পদ্মার তীরবাসীদের অস্তিত্ব

---

৪. হুমায়ুন কবির, নদী ও নারী, ঢাকা ও কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষার সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এবং এ পটভূমিতেই নির্মিত হয়েছে এ উপন্যাসটি। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> নদী ও নারী, ভিটে ছাড়া জমিহীন গতরসর্বস্ব ক্ষেতমজুরের জীবন সংগ্রামের কাহিনী, প্রকৃতিকে জয় করার কাহিনী।[৫]

প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়ে নদী ও মানুষ যেন হয়েছে একাত্ম। এবং জীবন সংগ্রামের নানা পরিচয়ে সফলতা-ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তা প্রতিফলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। হত দরিদ্র ক্ষেতমজুরেরা শ্রম দিয়ে দিনে দিনে প্রকৃতিকে যেন করেছে জয়। নদী, খাল প্রভৃতিকে পরম আত্মীয় ভেবে তার কোল ঘেঁষে নজুমিয়া গড়েছে নিজের দহলিজ। উপন্যাসে নজুমিয়ার ঘরবাড়ি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> বড় নদীর বাঁকের মুখ থেকে বেরিয়েছে উজান ডাঙ্গার খাল। সেই খালের কোলে নদীকে আঁকড়ে ধরে নজুমিয়ার দহলিজ।[৬]

নজুমিয়ার ঘরটি মাটির হলেও ঘর, উঠোন, বাড়ির আনাচে-কানাচে সব জায়গায় রয়েছে পরিচ্ছন্নতার ছাপ। নজুমিয়ার বৃদ্ধা মা আয়েষা এ বাড়ির ভেতরকার সব কাজ দেখাশোনা করে। নজুমিয়া তার কর্মকাণ্ডে মেনে চলে তার মায়ের পরামর্শ । বাড়ির মধ্যে কাজের লোক কুলসুম ও গোলাপীকে নিয়ে আয়েষা সংসারের কাজকর্ম করে। বাড়ির মধ্যে সে পাট খড়ির বেড়া দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করেছে। আয়েষা ধর্মভীরু নারী। মায়ের প্রতি নজুমিয়ার শ্রদ্ধা ভক্তির কমতি নেই। তবু মা ও সন্তানের মধ্যে ঘটে মান-অভিমান নজুমিয়ার ছেলে মালেকর বিয়ে দেয়া প্রসঙ্গে। নাবালক মালেককে নজুমিয়া বিয়ে দিতে নারাজ। কিন্তু আয়েষার ইচ্ছা ভিন্ন। সে নাতবৌ ঘরে এনে আমোদ-আহ্লাদ করবে, তার পর তাকে বুঝিয়ে দেবে সংসারের দায়-দায়িত্ব। আয়েষা এ ভাবেই খোঁজ করে তার সুখের ঠিকানা। আয়েষা যুক্তি দিয়ে নজুমিয়াকে বোঝাতে চায় এবং বলে :

> কচি বয়সে এক ফুটফুটে বউ আনবো, তাকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করব, নিজের হাতে তাকে মনের মত তৈরি করে নেব।[৭]

---

৫. রফিকুল ইসলাম, হুমায়ূন কবিরের 'নদী ও নারী' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অনাদৃত রত্ন, উত্তরাধিকার, এপ্রিল-জুন, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৬

৬. হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৭. ঐ, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

নাতি সম্পর্কে আয়েষার অতিরিক্ত উৎসাহ নজুমিয়া প্রশ্রয় দেয় নি। সংসার পরিচালনায় কর্মঠ ও দায়িত্বশীল হয়েও সমাজ বা জীবন সচেতন হতে পারে নি আয়েষা। মালেকের প্রতি তার যেমন রয়েছে স্নেহ-মমতা মালেকেরও তেমনি দাদীর প্রতি রয়েছে ভক্তি এবং রয়েছে তাঁর কাছে আবদারেরও অধিকার। সে কারণেই মালেক বড়শিতে শিকার গেঁথে ছুটে গেছে দাদীর কাছে। ইদ্রিস কোনভাবেই ছিপ টেনে তুলতে পারছে না। গ্রামের সব লোকই এর মধ্যে এসেছে নদীর ঘাটে। নজুমিয়ার ভক্তরা অনেকেই ছিপ টেনে তুলতে চেয়েছে, কিন্তু সে কারও হাতে একক দায়িত্ব দেয় নি। কারণ মালেকের কারণে গ্রামের কোন মানুষের যদি ক্ষতি হয় তা হলে নজুমিয়াই যেন দায়ী হয়ে যাবে। পঞ্চায়েত পদে নজুমিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আসগর তা হলে চারিদিকে বদনাম ছড়াবে। আসগর মিয়ার ষড়যন্ত্রের সে পথ বন্ধ করার জন্যে নজুমিয়া নিজেই নৌকা নিয়ে শিকার তুলতে নদীতে যায়। দলবদ্ধভাবে নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন যাপনের নানা প্রতিকূলতার প্রতীক মালেকের কুমির শিকার। তাদের জীবনের অসংখ্য বিরূপ অবস্থা সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন:

> শুধু নদী আর জমিকেই বশ করতে হয়নি তাদের আরও প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। ... যে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে ঐ মানুষগুলোকে বাঁচতে হয়েছে কুমির শিকারতো তারই প্রতীক।[৮]

আয়েষার বক্তব্যে অবশ্য প্রকাশ পায় গভীর মমতা ; সে বলে, 'দাদুর ধরা প্রথম কুমির'।[৯] যেন মালেকের এ শিকার তার জীবনের প্রথম সাফল্য; সে আগামীতেও জীবন সংগ্রামে অংশ নিয়ে জয়ী হতে চায় সব জায়গায়। 'প্রথম কুমির' বলার মাধ্যমে আয়েষা যেন মালেকের আরও কুমির শিকারের কথাই বলতে চেয়েছে।

মালেকের কুমির শিকারের খবর ছড়িয়ে যায় চারদিকে। বিশেষ করে ধূলদীর হাটেই এ খবর গুরুত্বসহ প্রচার পায়। ধূলদীর হাট যেন রহিমপুরের মানুষের প্রাণকেন্দ্র। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রী কেনাবেচার জন্যে সবাই এখানে জমায়েত হয়। ক্রমে ক্রমে ধূলদীর হাট স্থানীয়

---

৮. রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
৯. হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

জনজীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। গ্রামের মানুষের উপস্থিতিতে নিত্যদিনের খবরাখবর সহজেই এখানে এসে পৌঁছে যায়। বিয়ে ঠিক করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও এ হাটের মধ্যে আলাপ আলোচনায় সুসম্পন্ন হয়। এ ভাবেই এ হাটে পৌঁছেছে মালেকের কুমির শিকারের খবর। নজুমিয়া হাটের সীমানায় যেতেই এ প্রসঙ্গে নানা কথাবার্তার সম্মুখীন হয়। এক পর্যায়ে নজুমিয়া হেকিম সাহেবের কাছে আটকে পড়ে। নজুমিয়া অবশ্য কোন সাহায্য করতে পারে নি হেকিম সাহেবকে। কারণ ইতোমধ্যেই নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে কুমিরের কলিজা, গুর্দা প্রভৃতি। ফলে দুষ্প্রাপ্য ঔষধ তৈরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তিনি। হেকিম যে সময় ব্যস্ত ছিলেন নজুমিয়ার তোষামোদে, সে সময়ই নদীতে চলে গেছে কুমিরের গুর্দা ও কলিজা। সে জন্যে হেকিম সাহেব হয়েছেন মর্মাহত, যেন তাঁর জাত্যভিমান হয়েছে আহত। হেকিম সাহেব নিজেকে সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোক বলে মনে করেন। এবং সে দৃষ্টিতেই তিনি নজুমিয়াকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াসী হয়েছেন। পক্ষান্তরে হেকিম সাহেবের ডাক্তারির দৌরাত্ম্যের কথা ভাবলে তাঁকেই বরং নিম্ন শ্রেণীর মানুষ হিসেবে ধরতে হয়। তাঁর ডাক্তারি শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> দরজিপাড়ার এক ছেলে পালিয়ে পশ্চিমে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে হিন্দুস্তানী বকুনী আর দু'চারটা দাওয়াইয়ের নাম শিখেছে, আজ তারই জোরে সে হাকিম সাহেব। কেউ বলে হিন্দুস্তান ফিন্দুস্তানতো দূরের কথা, বাঙলামুলুকের বাইরে কোনদিন পা বাড়ায় নি। তবে নাপিতের ছেলে, চালাক-চতুর, এক বিদেশী হাকিমের তলপী বয়েছিল বছরখানেক, সেই তার বিদ্যার দৌড়।[১০]

এ রকম তথাকথিত স্বশিক্ষিত হেকিমের চরিত্রটি আমাদের সমাজ বাস্তবতারই এক ছবি। গ্রাম-বাংলার হাটে-বাজারে-বন্দরে এ রকম হাতুড়ে হেকিম দেখা যায়। উন্নত শিক্ষা ও রুচির ধারেকাছেও নেই তিনি। তাঁর কথা ও আচরণ তাই স্থূলতারই নামান্তর। তাঁর প্রত্যাশিত কুমিরের

---

১০. ঐ, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

গুর্দা, কলিজা না পাওয়ায় হেকিম তাই বেসামাল কথা বলে বসেন নজুমিয়াকে :

> তা জুতো পরতে যদি এতই কষ্ট, তবে ভদ্দর লোকের ফরাসে বসার সখ কেন ? আর বসতে হলেও অন্ততঃ পা দুটো তো ধুয়ে নেওয়া যায়।[১১]

হেকিমের এ অবমাননাকর কথায় 'পঞ্চায়েত' নজুমিয়া রাগান্বিত হয়েছে ; কিন্তু সে তা প্রকাশ করে নি ; বরং ভেবেছে , নিজেই মারামারিতে জড়িয়ে পড়লে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং তার ভাবমূর্তি হবে ক্ষুণ্ন। সে কারণে সে অনেক ভেবে চিন্তে বিজ্ঞ পঞ্চায়েতের মতোই জবাব দিয়েছে :

> আমরা চাষী–চাষীর ছেলে ভদ্দর লোকের রেওয়াজ জানি না। ঘরে ডেকে এনে মানুষকে অপমান করাই বোধ হয় আপনাদের মতন ভদ্দর লোকের ব্যবহার।[১২]

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নজুমিয়াদের ক্ষমতার এক উৎস। চাষাবাদ করে আর্থিক মান বজায় রেখে জীবন যাপনের বুদ্ধি তাদের কারও চেয়ে কম নয়। তাদের কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও নেই বুদ্ধির কোন ঘাটতি ; চালাক-চতুরও কম নয়। সে খবর অবশ্য জানা নেই হেকিম সাহেবদের। সে কারণেই হেকিম সাহেব পঞ্চায়েত নজুমিয়ার সঙ্গে এমন নীচ আচরণ করতে সাহসী হয়েছেন। অপমানিত ও ক্ষুব্ধ নজুমিয়া হেকিমের কাছ থেকে তার মায়ের জন্যে ব্যথার মালিশ না নিয়েই ফিরে আসে তার নৌকোয়। এ দিকে আর এক ঝামেলা পাকিয়ে বসে তার কামলা রমজান। ধান কাটার জন্যে কিষাণ না নিলে দু এক দিনের মধ্যেই ফসলের ক্ষতি হবে। অথচ বেশি মজুরি চায় বলে কিষাণদের ভাড়া করে নি রমজান। ফলে তারা চলে গেছে আসগর মিয়ার নৌকোয়। আসগর মিয়া নজুমিয়ার জানের দুশমন। এই ঘটনায় সঙ্গত কারণেই আহত ও ক্ষুব্ধ নজুমিয়া। ঐ হাটেই যে এক ভণ্ড ফকিরের আস্তানা গড়ে ওঠে, তা সমাজ বাস্তবতারই একটি চিত্র। ফকিরকে কেন্দ্র করেও নজুমিয়া ও আসগর মিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশ তৈরি হয়। বাংলাদেশে ফকিরের চিকিৎসা অব্যর্থ বলে প্রায়ই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চলে এবং লোকেরা তা বিশ্বাসও করে। ধর্ম ও সংস্কারের প্রভাবেই এমনটি ঘটে। ধূলদীর হাটে দুই চিকিৎসকের বসবাস ; হেকিম ও ফকির দু জনই হাতুড়ে ও ভণ্ড। তবু, ঔষধ ও ফিকির নিতে আসা মানুষেরা

---

১১. ঐ, পৃ. ৩৫
১২. ঐ, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সব সময়ই ভীড় করে থাকে, গ্রামের অজ্ঞ-অশিক্ষিত মানুষই হয় এ ধরনের চিকিৎসকের রোগী। ধূলদীর হাটের অশিক্ষিত মানুষেরা তাই সহজেই মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে হেকিম-ফকিরের । নজুমিয়াও ফকিরের দাওয়াত পেয়ে সেখানে উপস্থিত না হয়ে পারে নি। আসগর মিয়াও এসেছে একই ফকিরের কাছে। এখানেই দুজনে সামনা-সামনি হয়ে পড়লে নিমেষেই উপস্থিত মানুষের মধ্যে দুটি পক্ষের সৃষ্টি হয় দলগত আনুগাত্যের ভিত্তিতে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এ সমাজের বহিরঙ্গে নজুমিয়া বা আসগর মিয়ার আধিপত্য থাকলেও অন্তরঙ্গে রয়েছে ছদ্মবেশী হেকিম, ফকির। নজুমিয়া ও আসগর মিয়ার মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলে কে কি ভাবে হেকিম-ফকিরের প্রিয়ভাজন হবে। সেহেতু ধরে নেওয়া যায় যে, অজ্ঞতা তাদের জীবনে তথা সমাজের একেবারে গভীরে প্রোথিত। তাই, গভীর আস্থার ভিত্তিতেই ছয় সন্তান ও স্ত্রী হারানো হামদু চাচা ফকিরের কাছে দাওয়াই চায়। তার ধারণা, ফকিরের দাওয়াই সেবন করলে সে ফিরে পাবে তার স্ত্রী-সন্তান। অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রয়েছে ফকিরের হামদু–চাচার এ ধরনের অবাস্তব বিশ্বাসের ভিত্তি হলো অশিক্ষা-কুশিক্ষায় ভরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কুসংস্কারাচ্ছান্ন মন-মানসিকতা। বলা বাহুল্য, এ ধরনের সমাজেই হেকিম-ফকিররা তাদের ব্যবসা ভালোই জমিয়ে বসে।

ধূলদীরহাটে নজুমিয়ার সঙ্গে হেকিম, ফকির ও আসগর মিয়ার ঝগড়া হয়। নজুমিয়া তার সঙ্গী রমজান ও বসিরকে এ ঝগড়ার কথা আয়েষার কাছে গোপন করতে বললেও আয়েষা তা রমজানের কাছ থেকে জেনে নেয় কৌশলে। ধর্মভীরু আয়েষার ফকিরের ওপর খুব বিশ্বাস। তার ধারণা, ফকিরদের অভিশাপ-আশীর্বাদ সহজেই কাজে লাগে। আয়েষা নজুমিয়াকে তাই পদ্মার ওপারে যেতে দেয় না। ভরা পদ্মায় ভাদ্র মাসে তুফান ওঠে, ফকিরের কাছে মাফ চেয়ে তাকে সন্তুষ্ট না করে পদ্মা পাড়ি দিলে বিপদ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা–এমনই ভাবে আয়েষা। কিন্তু পদ্মার ওপারে নজুমিয়াকে যেতেই হবে। কারণ, পদ্মার বুকে চর জেগেছে ; জেগে ওঠা নতুন চরে জমি দখল নিতে হবে নজুমিয়ার। নতুন চরে জমি দখল নিতে ব্যর্থ হলে নজুমিয়া হেরে যাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আসগর মিয়ার কাছে। কিন্তু কোনমতেই আয়েষা নজুমিয়াকে পদ্মার ওপারে যেতে দিতে রাজি নয়। অবশেষে নজুমিয়া আয়েষাকে কথা দিয়েছে, ফিরে এসে ফকিরকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

খাওয়াবে এবং মিলাদ পড়াবে। চর দখল সম্পর্কে নজুমিয়া আয়েষাকে বুঝিয়েছে, ছেলে মালেকের ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা বলেছে :

তুমি কি চাও যে তোমার মালেক আসগরের ছেলেপুলের কাছে মাথা নীচু করে থাকবে ?[১৩]

আয়েষা নজুমিয়ার বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারে নি। সে অমূলক একটা আতঙ্কে, সন্তানের অমঙ্গলের দুর্ভাবনায় অস্থির। কিন্তু নজুমিয়ার বাস্তব চিন্তা ভিন্ন। আসগরের কাছে হেরে যাওয়ার অর্থ নজুমিয়ার অস্তিত্বের বিপর্যয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিযোগিতা সবখানেই কমবেশি লক্ষ্য করা যায়। তবে, চর দখল নিয়ে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটে নি। পুবের চর অনেক দিন টিকে থাকে বলে বসিরের পরামর্শে পুবের চরই দখল করেছে তারা। নতুন চর দখল করে নজুমিয়া বাড়ি ফিরেছে। বাড়িতে ফসল তুলে সব কিছু গোছগাছ করে সে যায় ধূলদীরহাট, ফকিরকে দাওয়াত দিতে। তত দিনে ফকিরের আস্তানার বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে । এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> বটগাছের চেহারা একেবারে ফিরে গেছে। গতবার যখন এসেছিল তখন সামান্য একটু ঝোপড়া, এখন বটগাছ ঘেরাও করে মস্তবড় চালাঘর, নতুন বাঁশের বেড়া চকচক করছে। ঘরের উপরে মস্তবড় সবুজ নিশান।[১৪]

কুসংস্কার রাজত্ব করে এ ভাবেই। ফলে, অশিক্ষিত ও বাস্তবতাবোধশূন্য সমাজে ফকির তথা ধর্মব্যবসায়ীদের উন্নতি হয় শনৈঃ শনৈঃ। সমাজের গভীরে প্রোথিত এই অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রভাব শিক্ষা ও বিজ্ঞান-চেতনার প্রসারে দূর হতে পারতো। কিন্তু তার আপাতত কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার চলছে অতি ধীর গতিতে। ফলে, পীর ফকিরদের ধর্ম ব্যবসা প্রায় অপ্রতিহতই রয়ে যাচ্ছে। এই পটভূমিতে যে ধর্মশিক্ষা প্রচলিত তা-ও সম্পূর্ণ অন্ধত্বের মধ্যে নিপতিত। নজুমিয়া ছাত্রদের পড়তে থাকা কোরাণের অর্থ জানতে চাইলে তারা অবলীলাক্রমে জানায় :

> খোদার কালাম পড়ছি, হেফজ করে মুখস্থ করছি, তার আবার মানের কথা ভাবে কে ?[১৫]

---

১৩. ঐ, পৃ. ৬৫
১৪. ঐ, পৃ. ৬৯
১৫. ঐ, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কোরাণ পড়ার এ পদ্ধতি বহুকাল ধরেই চলে আসছে। লেখক তার-ই প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন এখানে। নজুমিয়ার এই জিজ্ঞাসায় জানা তথ্যটি বেরিয়ে এসেছে পুনরায়। নজুমিয়া মূর্খ হলেও বুদ্ধিমান। সে ফকিরের ভণ্ডামি ও কেরামতি বুঝতে পারে ভালোভাবেই। তার পরও তাকে প্রায় বিনা কারণে ফকিরের কাছে মাফ চেয়ে তাকে বাড়িতে খাওয়ার জন্যে দাওয়াত করতে হয়। আসন্ন কার্তিকের পূর্ণিমা রাতে ফকির নজুমিয়ার বাড়িতে ওয়াজ করবে। এই উপলক্ষে সে হিন্দু-মুসলমান সবাইকে তার বাড়ি দাওয়াত করেছে। পাঁচশ মানুষকে সে খাওয়াবে। এক সঙ্গে এত মানুষের খাওয়ার জন্যে সে আমলে বাসন পাওয়া ছিল কঠিন। সে কারণেই হয়তো সেকালে বড় ধরনের যে কোন অনুষ্ঠানে খাবার পরিবেশন করা হতো কলা পাতায়। তবে ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যেও পাতা ব্যবহার করা হতো। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

গাদা গাদা কলাপাতা কাটা হলো, তা নইলে এত লোকের জন্য বাসন মিলবে কোথায় ?[১৬]

এই মিলাদকে কেন্দ্র করে নজুমিয়ার বাড়ি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। ফকিরের বসার জন্যে তাকিয়া পাতা, তার ওপর সামিয়ানা টাঙিয়ে নীচে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে আতরদান, গোলাবদানসহ আগরবাতি জ্বালানো হয়। এ সবের মধ্য দিয়ে পদ্মা তীরবাসী মানুষদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটি চিত্র পাওয়া যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে ফকির সাহেব কোরাণ পড়ছেন ; কিন্তু কেউ তার অর্থ বোঝে না। বাংলায় অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার কোন রেওয়াজ নেই। ভক্তিই এখানে প্রধান প্রবণতা :

সবাই জানে খোদার কালাম, ভক্তিতে শ্রদ্ধায় তাদের মন পরিপ্লুত।[১৭]

এ ধরনের পরিবেশে ফকির সাহেব ইসলামের নানা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছে তার নিজের মতো করেই। এ ক্ষেত্রে তাকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। ধর্মভীরু মানুষেরা ফকিরকে বিশ্বাস করে। ফকিরের জ্বিন ছাড়ানোর কারদানি তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে তোলে। তারা অবশ্য ফকির কর্তৃক রোগীকে প্রচণ্ড প্রহারটি লক্ষ্য করে নি। তারা কেবল যেটা আমলে আনলো সেটি হলো, ফকির কেরামতির সাহায্যে ঝাড় ফুঁক দিয়ে ইব্রাহিমের মেয়েকে জ্বিনের কবল থেকে মুক্ত করলো।

---

১৬. ঐ, পৃ. ৭৩
১৭.ঐ, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে লেখক উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন :

> দাঁত দিয়ে কলস তুলে সাত পা হেঁটে গেল। তারপর বেহুঁস হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, কলস ভেঙে জলে সমস্ত দেহ ভিজে গেল, সেই জলের মধ্যেই সে পড়ে রইলো।[১৮]

কারও ওপর জ্বিনের আছর এবং পীর-ফকিরের সাহায্যে তা ছাড়ানোর মহড়া গ্রামে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু সবাই যে তা বিশ্বাস করে এমন নয়। অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন লোকজনদেকেই ফকির ও ওঝারা তাদের কেরামতি দেখায়।

নজুমিয়ার বাড়িতে জিয়াফত শেষে নজুমিয়ার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেও তার সব চেয়ে বড় দায়িত্ব পালন করা হয় নি। পদ্মার ওপারে বিলি করা জমির খাজনা তুলেই সে জমিদারের পাওনা মিটিয়ে দেবে। কিন্তু পদ্মার রূপ দিনে দিনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ; যে কোন সময় ফুঁসে উঠতে পারে সে। যখন তখন সে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে জীবন ও জনপদ। বয়স্ক আয়েষা দীর্ঘদিন দেখেছে পদ্মার চরিত্র। সে বুঝতে পারে, কখন পদ্মা হয়ে ওঠে প্রলয়ংকরী। পদ্মার ভয়াবহ রূপ দেখে আয়েষা নজুমিয়াকে নদীতে যেতে দিতে রাজী না ; কিন্তু নদীর ওপারে বিলি করা জমির খাজনা সংগ্রহ করে জমিদারকে তার পাওনা মেটাতে হবে। ধূলদীর হাটে জমিদারের পাওনা মেটাতে না পারলে সমূহ বিপদ। তাই অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে, মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও, নজুমিয়াকে নিরুপায় হয়ে পদ্মা পাড়ি দিতেই হবে। এই বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হয়ে নজুমিয়া বসির, ইদ্রিস ও রমজানকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মা পাড়ি দিতে রওয়ানা হয় ; কিন্তু প্রকৃতি নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে, প্রচণ্ড ঝড়-তুফানে পদ্মা হয়ে ওঠে প্রাণ সংহারী। প্রমত্ত পদ্মার সে রূপ সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> তিনজনে বৈঠা হাতে নৌকা বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করতে লাগলো। নদীর প্রচণ্ড ঢেউএ নৌকার দুপাশ থেকে জল উঠতে শুরু করলো। নজুমিয়া বলল, বৈঠা ছেড়ো না। যদি নৌকা ডোবেও, বৈঠা ধ'রে হয়তো কোন চরে গিয়ে উঠতে পারবো।
>
> তাকে ব্যঙ্গ করেই যেন বাতাসের গর্জ্জন আরও তীব্র হয়ে উঠলো। বিরাট এক ঢেউয়ের মাথায় নৌকা যেন আকাশের দিকে ফুলে উঠল, পর মুহূর্ত্তেই নৌকা আবার পাতালে নেমে গেল। যখন ঢেউ ভাঙলো তখন নৌকার আর কোন চিহ্ন নাই।[১৯]

---

১৮. ঐ, পৃ. ৮২
১৯. ঐ, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

শেষ পর্যন্ত আয়েষার আশঙ্কাই সত্যি হলো। অনেক স্বপ্ন নিয়ে একদিন নজুমিয়া এই পদ্মার তীরে এসে দাঁড়িয়েছিল ; সর্দার রহিম বখসের সহায়তা নিয়ে সে তার আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পদ্মার অপার কৃপায় সে পেয়েছিলো সুখ-সমৃদ্ধি। আবার সেই পদ্মারই নির্মম বৈরিতায় তাকে প্রাণ দিয়েই যে ঋণ পরিশোধ করতে হলো। নজুমিয়ার সঙ্গী মাঝিদের মধ্যে ইদ্রিস ও রমজান জীবন্ত ফিরতে পারে নি। শুধু অভিজ্ঞ মাঝি বসির মৃতপ্রায় অবস্থায় জেলেদের সাহায্যে উদ্ধার পায়। এ নির্মম সংবাদে ধূলদীবাসী মানুষদের মধ্যে শোকের ছায়া নামে। এবং গভীরভাবে মর্মাহত, শোকাহত হয় নজুমিয়ার মা আয়েষা।

নজুমিয়ার মৃত্যু এক গভীর সংকট তৈরি করে আয়েষা ও মালেকের জীবনে। গোলাপী, কুলসুম ও বসির অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। নজুমিয়ার সম্পত্তি ও সংসার রক্ষা করা আয়েষার পক্ষে হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। সে পুত্র শোকে দিন দিন হয়ে ওঠে পাগল প্রায়। তার দুশ্চিন্তা মালেককে নিয়ে, গভীর দুঃখ ও হতাশা নিয়ে আয়েষা বলে :

> কে তোকে এখন দেখবে—কে বিপদে আপদে পাহারা দেবে ? হাট থেকে তোর জন্যে ভাল গামছা, লাল পিরাণ কিনে দেবে কে ? পদ্মার দুকূল ছাপিয়ে বছর বছর জোয়ার ভাটা ফিরে আসবে, কিন্তু তোর বাবাতো আর ফিরবে না।[২০]

আয়েষা প্রতিদিনই সন্ধ্যা হলেই, নদীর ধারে ছুটে যায়, নদী পথে তার ছেলে নজুমিয়ার ফেরার আশায়। অপেক্ষা ও হতাশায় ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> জীবন্ত অথচ যেন প্রাণের সাড়া নেই, জাগ্রত কিন্তু জাগরণের কোনও লক্ষণ নেই—এরকম জীবমৃত্যু যে মরণের চেয়েও ভয়ঙ্কর।[২১]

এ সময় দাদী ও নাতির দিন কাটে দুঃখে ও নিরানন্দে। আয়েষার মাথার চুল সাদা হয়ে যায় সাত দিনের মধ্যে। সে একমাত্র নদীর ঘাটে গিয়েই স্বস্তি পেত ; সে জন্যে সব সময় সে ছুটে যেত সেখানে। আয়েষার শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় নদীর তীরে মূর্ছা গিয়েই। আয়েষার মৃত্যুতে নজুমিয়ার সংসার ভেঙে যাওয়া আরও সহজ হয়ে ওঠে। নাবালক মালেকের জীবনও হয়ে যায় অনিশ্চিত। কুলসুম ও গোলাপী হয়ে পড়ে নিরাশ্রয়। এমন দুর্দিনে বৃদ্ধ বসির মাঝিকেই এ সংসারের হাল ধরতে হলো। নজুমিয়ার অভাব সবার জীবন করে দিয়েছে এলোমেলো। নদী তীরেই নজুমিয়ার সাফল্য, এখানেই তার ভরাডুবি। নদীর এই ভাঙা-গড়ার চিরকালীন স্বভাবের সঙ্গে তাল মিলিয়েই তাদের জীবন। নজুমিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সবারই জীবনে নদীর এই প্রভাব বিদ্যমান। শত

---

২০. ঐ, পৃ. ৯৬
২১. ঐ, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিকূলতাকে মনে রেখেই নজুমিয়ার ঐতিহ্য, মালেকের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্যে আত্মনিবেদিত হয় বসির। অন্য দিকে ঘরের কাজ করে এবং মালেককে স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করে কুলসুম ও গোলাপী। ঐ সংসারে এই দুই নারীর জীবন যে আর নিশ্চিন্ত নয় আগের মতো, তারাও তা বুঝতে পারে। সে জন্যে তাদের দুর্ভাবনা আরও বাড়ে ; তারা স্পষ্ট দেখতে পায় সামনের দুঃখময় দিনগুলো। তবু, তাদের জীবন চলতে থাকে এবং একে অপরের সঙ্গে রঙ-তামাশা করা বন্ধ থাকে না। এই দুই গৃহকর্মী নারীর কাছে স্বামী-সংসার অনিবার্যভাবে প্রত্যাশিত ; কিন্তু তারা এ ক্ষেত্রে হতে পারে নি কামিয়াব। এই ব্যর্থতার চিত্রের মাধ্যমে লেখক হতদরিদ্র নারীদের অসহায় জীবনের হাহাকারই যেন ফুটিয়ে তুলেছেন প্রকারান্তরে। তাদের বঞ্চিত জীবনে মালেক যেন একটি মরূদ্যান বিশেষ। সেই যেন তাদের ভবিষ্যতের আশ্রয়দাতা, সহায়। কিশোর মালেককে কুলসুমই বেশি আদর করে, মালেকও কুলসুমের কাছেই করে নানা আবদার। বসির তাকে তীর ধনুক বানিয়ে দেয়। আপনহারা মালেকের মনে যাতে কোন কষ্ট না হয়, সে জন্যে তারা সদা-তৎপর। অবশ্য, কিশোর মালেকের দুরন্তপণা মাঝে-মধ্যে অসহনীয় মনে হয়। সে পাড়ার ছেলে নূরু, সাবু ও অন্যান্যদের সঙ্গে খেলা করে, কখনও কখনও ঝগড়া বাধায়, ঝগড়া হয় সাবুর সঙ্গে মালেকের। বস্তুত, মালেক, নূরু, সাবু ও অন্যান্য কিশোরের দুরন্তপণার বাস্তব চিত্র আঁকা হয়েছে এ উপন্যাসে। বিশেষ করে কিশোরদের স্নান করার দৃশ্য, তাদের একে অপরের শরীরে কাদা ছুঁড়ে মারা, সারা শরীরে কাদা মেখে সঙ সাজা—প্রভৃতি নানান চিত্র আছে গ্রন্থটিতে। দুরন্ত কিশোর সাবু ডুব দিতে দিতে ছড়া কাটে। অন্যেরাও একে অপরের হাত ধরাধরি করে ছড়া কাটতে থাকে সুর করে। ছড়া গানের মাধ্যমে রহিমপুরবাসীর লোক-সংস্কৃতির পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। কিশোররা ছড়ায় বলেছে :

ক. এতটুকু পানি
ঝপর জানি।[২২]

খ. এ গাঙে কুমীর নাই
ঝুপুর ঝাপর নেয়ে যাই।[২৩]

নুরু ও মালেক পানিতে নামে নি। কিন্তু সাবু মালেককে ভীতু বলে তিরস্কার করায় সে জিদের মাথায় নদীর মাঝে অনেক দূর সাঁতরিয়ে যায়। এবং প্রমাণ করে সে ভীতু নয়। নিজের বীরত্ব

---

২২. ঐ, পৃ. ১২১
২৩. ঐ, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ করে মালেক তারুণ্যের জয় দেখিয়েছে। বসির নজুমিয়ার সম্পত্তি রক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেও যেন ব্যর্থ। জমিদারের খাজনা মেটাতে যে টাকার প্রয়োজন তা প্রজাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। দিনে দিনে বসির আয়েষার রেখে যাওয়া গহনাও বিক্রি করে জমির খাজনা মেটাতে চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে বসির বলেছে :

> আম্মাজানের গয়নাগাটি ত আগেই গেছে। তোমাদেরও যে দু'চারটে রূপোর হাঁসুলি বাজু ছিল, তাও গেছে। সেই থেকে রায়ত প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করছি।[২৪]

কিন্তু প্রজারা হাটের মধ্যে জানিয়েছে যে, তারা খাজনা দেবে না। এ ব্যাপারে কুলসুম ও গোলাপীর কোন পরামর্শ আশার আলো দেখায় না। বরং তারা পঞ্চায়েতের কাছে না যাওয়ার জন্যে বলেছে বসিরকে। কুলসুম ও গোলাপী পঞ্চায়েত-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থাকে স্বার্থান্বেষী বলেই মনে করে । এ প্রসঙ্গে গোলাপীর মন্তব্য :

> এ সব কেবল ঢং। আসলেতো মাতবররা পঞ্চায়েতের কথায় উঠ্‌বোস করে।[২৫]

শেষ পর্যন্ত নজুমিয়ার সম্পত্তি রক্ষা করা বসিরের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন কুলসুম, গোলাপী ও বসির ঠিক করে যে, নজুমিয়ার সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব দিতে হবে আসগর মিয়াকে। তার সম্পর্কে বসির বলে :

> তা ছাড়া তোমরা জান না, তার কোন বেটাছেলে নাই, আছে এক মেয়ে—নুরু ; নূরু আর মালেক দুটাতে খুব ভাব, যেন এক বোঁটায় দুটি ফুল। আমার মনে হয় একদিন তাদের বিয়ে হবেই হবে। নিজের জামাইকে কি আর তখন ঠকাতে চাইবে আসগর মিয়া।[২৬]

বসির মালেককে খুঁজতে খুঁজতে মসজিদের সামনে উপস্থিত হয়। গ্রামীণ মসজিদভিত্তিক সমাজে সবাই একই মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ে। আসগর মিয়ার দেখা পায় বসির। ও দিকে মালেককে না পেয়ে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার পর লাঠি ও আলো হাতে আবার তাকে খুঁজতে বের হয় বসির। কুলসুম ও গোলাপী তার জন্যে চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। পথে বসিরের সঙ্গে দেখা হয় গলু পাগলার। সে ফিসফিস করে বলে বসিরকে :

---

২৪. ঐ, পৃ. ১১৯
২৫. ঐ, পৃ. ১৩৩
২৬. ঐ, পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

কাউকে বলোনা কিন্তু, এপথে যেতে আমার ট্যাঁক থেকে একটি থলিয়া পড়ে গেছে। না পেলে ভারী লোকসান হবে, তাই সেই থলিয়া খুঁজছি।[২৭]

গলু মিয়ার এ বক্তব্যে তার মৌলিক অভাবের কথাই যেন ধ্বনিত হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের পাগলা আছে অনেকেই যারা খাদ্যের অভাবে, বাসস্থানের অভাবে কঠোর দারিদ্র্যের পীড়নে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পরিণত হয় গলু পাগলায়। মালেকের বন্ধু মতিন, সাবু ও অন্যান্যদের কাছেও বসির খুঁজে পায় নি মালেককে। কারণ সে গিয়েছিল আসগর মিয়ার মেয়ে নূরুর সঙ্গে তার বাড়িতে। রাতে আসগর মিয়া নিজেই তাকে কাঁধে করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। বসির মালেকের ভবিষ্যৎ ও তার জমি-জমা নিয়ে উদ্বিগ্ন। মালেকের ব্যাপারে সাহায্য নিতে সে একদিন উপস্থিত হয় আসগর মিয়ার বাড়িতে। সেখানে সে দেখলো গরু দাগানো দৃশ্য। উপন্যাসে বলা আছে :

পাঁচ ছয়জন লোক গরুটীকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরে আছে, তার পা গুলিও দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর বৈদ্য মালসার আগুনে লোহা রাঙিয়ে গরুটীকে দাগা দিচ্ছে।[২৮]

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে চাষাবাদের জন্যে গরু এখনও নির্ভরশীল প্রাণী। গরু অসুস্থ হয়ে পড়লে কৃষকের দুর্ভাবনার শেষ থাকে না। এ সময় কৃষকেরা গরুর রোগ সারাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তবে, সাধারণত হাতুড়ে ডাক্তাররাই ব্রতী হয় এ কাজে।

মালেক ও তার সম্পত্তি রক্ষার বিষয়ে আসগর মিয়া অনাগ্রহী নয়। কিন্তু নজুমিয়ার সঙ্গে অতীতের ঘটনা তাকে যেন থমকে দিয়েছে। আসগর মিয়া মনে মনে ভাবে, যদি কোন ভাবে মালেকের সম্পত্তি নষ্ট হয়, তা হলে গ্রামের মানুষ ভাববে যে, হাতে পেয়ে আসগর মিয়া পূর্ব শত্রুতার জের মিটিয়েছে। বসির ও আসগর মিয়া অনেক আলাপ-আলোচনা শেষে স্থির করলো, গ্রামের সব মানুষের সামনে মালেকের এ সমস্যা তুলে ধরবে এবং যে কোন লোক মালেকের দায়িত্ব নিতে পারবে। কিন্তু বৈঠকে উপস্থিত কেউ-ই মালেকের দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। অবশেষে আসগর মিয়া মালেকের দায়িত্ব গ্রহণ করে গ্রামবাসীদের উদ্দেশে বলে :

মালেকের স্বত্ব প্রাণপণে দেখব। যদি ইচ্ছা করে জেনে শুনে কোনদিন তার হকের বিরুদ্ধে কাজ করি, তবে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ে। প্রত্যেক বছর বৈশাখী পূর্ণিমায় সকলের

---

২৭. ঐ, পৃ. ১৪৯
২৮. ঐ, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সামনে হিসাব দাখিল করব। যদি অন্যায় করি, গাফলতি করি, তবে তোমরা যা শাস্তি মনে আসে তাই দিও। আমি বিনা ওজরে তোমাদের শাসন মাথায় করে নেব।[২৯]

আসগরের সংসারে মালেক যেন ফিরে পায় হারানো বাবা-মার আদর। আগের থেকেই নূরুর সঙ্গে মালেকের ছিল সখিত্ব। আসগরের বাড়িতে মালেকের সঙ্গে কুলসুম ও বসির এসেছে, গোলাপী আসেনি ; সে আশ্রয় নিয়েছে তার এক সম্পর্কীয় ভাইয়ের কাছে। কুলসুম মালেকের মায়া ছেড়ে যেতে পারে নি কোথাও। কিন্তু এখানে ক্রমে ক্রমে মালেকের দায়িত্ব, ভালো-মন্দের ভার যেন আসগরের স্ত্রী আমিনা অধিকার করে নেয়। মালেকের প্রতি কুলসুমের স্নেহ পড়ে যায় প্রতিযোগিতার মুখে। এ প্রসঙ্গে কুলসুমের মনের দুঃখ বোঝাতে ঔপন্যাসিক বলেছেন :

হাঁড়ির মধ্যে বন্ধ সাপের মতন আপন মনে ফুঁসতে থাকে।[৩০]

কুলসুমের এই মাতৃহৃদয়ের প্রতি আমিনার দৃষ্টি পড়েছে। যৌবনে বিধবা কুলসুমের তখনও ছিলো বিয়ের বয়স, তাই তাকে আমিনা বিয়ে, স্বামী-সংসার সন্তানের স্বপ্ন দেখায় এবং আসগর মিয়া ও বসিরকে বলে কুলসুমের বিয়ের ব্যবস্থা করতে। বিয়ের অনুষ্ঠানে বর আজিজ ও তার বন্ধু-বান্ধবের আগমন, আপ্যায়ন, বরকে নানা প্রসঙ্গে লজ্জা দেয়া, রহিমপুরবাসীর সাধারণ জীবনের এক চালচিত্র। আজিজ ও কুলসুমের বিয়ের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় কুলসুমের নতুন জীবন। অন্য দিকে মালেককে নিয়ে আমিনা-আসগরও আছে সুখে। কিন্তু এক দিন সব স্বাভাবিকতা ভেঙে, রহিমপুরের জনগণের জীবনে নেমে আসে দুর্যোগ। অনাবৃষ্টির কারণে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, হারিয়ে যায় গাছ-পালার সবুজ রঙ, শুরু হয় চারদিকে শুধু অভাব। অবশেষে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। আসগর মিয়া পড়ে যায় মহা চিন্তায়। আসগর মিয়া গত বছর মেয়ে বউয়ের গোট হাঁসুলী বিক্রি করে কোন মতে দিন কাটিয়েছে। এক বছরের ফসল ওঠে নি যাদের ঘরে সে সব ছোট-ছোট গৃহস্থে-রাও তাদের গহনা বেচে খেয়েছে। সে কারণে, গত বছরও গ্রামে চোর ছিলো না। কিন্তু এ বছরের অভাবে চোর বেড়েছে। কিন্তু চোরদের বিরুদ্ধে আসগর মিয়া শক্ত কোন অবস্থান নিতে পারে না। আসগর মিয়া ভাবে :

যারা আজ চুরি করছে, তারাও এককালে গেরস্ত ছিল, নিজের জমি জমা চাষ করেছে, এখন অনটনে দিশে না পেয়ে পরের হাঁড়িতে হাত দিচ্ছে। তাদের বাড়ীর বউ, বাড়ীর

---

২৯. ঐ, পৃ. ১৬৬
৩০. ঐ, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেমেয়ের দল বনে বাদাড়ে শাকপাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে, বন জঙ্গলের ফলমূল যা পাচ্ছে, তাই হাতড়ে নিয়ে আসছে।[৩১]

দুর্ভিক্ষ কবলিত রহিমপুরবাসীর করুণ বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত মানুষেরা এক হাঁড়ি পানিতে এক মুঠ চাল ফুটিয়ে মাড় তৈরি করে খেয়েছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের তৃতীয় বছর তাদের হাতে বাকি নেই কিছু। ঔপন্যাসিক দুর্ভিক্ষের তৃতীয় বছরের দুর্বিষহ অভাব ও যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন এ ভাবে :

বাসন কোসন বেচতে চায়, ঘরবাড়ি বেচতে চায়, গাই বলদ বেচতে চায়, জরু মেয়ে বেচতেও রাজী।[৩২]

কিন্তু কে কিনবে, কিনেই বা কি লাভ ? কোথাও খাবার নেই। মানুষের জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার। তীব্র এ সংকট কাটিয়ে বাঁচার উপায় একমাত্র বৃষ্টি। বৃষ্টির জন্য তাই নূরু অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে পথে পথে বৃষ্টির গান গেয়ে বেড়ায় :

(ক) কচুর পাতায় হলদি,
বৃষ্টি নাম জলদি।[৩৩]

(খ) কচুর পাতায় করমচা
আয় বৃষ্টি নেমে যা।[৩৪]

ছড়া গানের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রত্যাশা প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করলেও আসগর মিয়া তা বিশ্বাস করে না। সে কারণে, নূরুর ওপর সে রাগ করে এবং ভাবে বৃষ্টি হলে গত তিন বছরেই হতে পারত। এখন আর কোন তুকতাকে কাজ হবে না। কিন্তু আসগর মিয়ার এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। এবং অঝোর ধারায় নামে বৃষ্টি। একটানা চার দিন বৃষ্টি আর প্রবল বাতাসে পদ্মার পানি গেল বেড়ে। ক্রমে শুরু হলো প্লাবন। গ্রামের পর গ্রাম গেল তলিয়ে । প্রায় সব কিছুই গেল ভেসে। মানুষ আশ্রয় নিলো গাছের ডালে, ঘরের চালে। দুর্ভিক্ষ কবলিত মৃতপ্রায় মানুষেরাই পড়লো ভয়াবহ বন্যার কবলে। সবার মতো আসগর মিয়াও হারালো সহায়-সম্বল সবই। শুধু প্রাণ নিয়ে নৌকোয় ভেসে সপরিবার সে রওয়ানা হলো অজানার পথে। এমন দুঃসহ যন্ত্রণাময় জীবনে

৩১. ঐ, পৃ. ১৮৩
৩২. ঐ, পৃ. ১৮৬
৩৩. ঐ, পৃ. ১৮৮
৩৪. ঐ, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

আসগর মিয়াকে সান্ত্বনা দেয় মালেক। সে স্বপ্ন দেখে অন্য কোন নতুন দেশে ঘর বাঁধার। মনোবল ভেঙে যায় আমিনার। সে অনিশ্চিত যাত্রার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে এবং বলে :

আবার নতুন করে ঘর বাঁধতে হবে নতুন দেশে।[৩৫]

আমিনার বিষাদময় এ বাক্যটিতেই যেন মূর্ত হয়ে ওঠে নদী-সিকস্ত মানুষের দুঃখময় জীবনের ছবি। নদী তীরবর্তী মানুষের জীবনে **নদী** যেন জীবন ও মৃত্যু নিয়ে খেলা করে। নজুমিয়া-আসগর মিয়াদের জীবন সাজায় যে নদী, সেই নদীই আবার ভেঙে ফেলে তাদের সাজানো সংসার। ভাঙা গড়ার বিচিত্র ঘটনার মধ্যে নদীই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে মহাশক্তিধর, তাদের জীবনের নিয়ন্তা। এ বিষয়ে একজন সমালোচক বলেছেন :

'পদ্মানদীর মাঝি'র কুবের, কপিলা, মালার মত নজুমিয়া, আসগর, কুলসুমেরও পদ্মার সঙ্গে নিয়ত লুকোচুরি খেলা, ভাঙাগড়ার প্রতিনিয়ত এক সংগ্রাম এবং পরিশেষে এক স্বপ্নের সোনালী দ্বীপে আশ্রয়ের আশ্বাস।[৩৬]

কিন্তু জীবন তো থেমে থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হয় পরিবর্তন প্রকৃতিতে ও মানুষের জীবনে। সে দিনের বিপন্ন মালেকের জীবনেও আসে নতুন দিন, সাফল্যের দিন। পৈত্রিক সূত্রেই মালেক নদী তীরবাসী। পিতা নজুমিয়ার মতো সে-ও বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে রচনা করে নিজ ভাগ্য। সাহসী ও সংগ্রামী মালেকের জীবনে সাফল্যের আভাস পাওয়া গিয়েছিল কৈশোরে কুমির ধরা প্রসঙ্গে তার দাদী আয়েষার মন্তব্যে। মালেকও তার বাবা নজুমিয়ার মতো সাফল্যের দিন নদী তীরে এসে দাঁড়ায়। আত্মতৃপ্ত মালেক তাকিয়ে থাকে শান্ত নদীর দিকে। নদীর সঙ্গে তাদের জীবন বাঁধা, মেজাজ-মর্জিও বাঁধা। নদীর শান্ত স্বভাবের তলে লুকিয়ে থাকে তার যে জীবন বিনাশী ভয়ঙ্কর রূপ, তা নদী সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাই কঠিন। যারা বাঁচে নদী সম্পৃক্ত হয়ে, তারা জীবন মৃত্যুর ঐ খেলার অধীন হয়েই বাঁচে। ধ্বংস ও মৃত্যুকে ভয় করলে তাদের চলে না। নজুমিয়া, আসগর মিয়া, মালেক সবাই তাই একই পথের পথিক। একই যুদ্ধের সৈনিক। জীবন তাদের কারও জন্যে তৈরি করে না অনুকূল কোন স্রোত। বিয়ানচরের নতুন জমি চাষ উপযোগী করে গড়ে তুলতে আসগরের মনে পড়ে অতীত দিনের স্মৃতি। প্রথম যৌবনের উদ্যমে বন্ধু নজুমিয়াকে নিয়ে হাড়-ভাঙা খাটুনি করে চরের জমি আবাদ করেছে আসগর মিয়া। সে

---

৩৫. ঐ, পৃ. ১৯২

৩৬. অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

দিনের সে সাহস, সে উদ্যম আজ আর নেই। তবু জীবনের তাগিদে একটু ঠাঁই গড়ে তুলতে আসগর মিয়া প্রচেষ্টারত। তার সঙ্গে রয়েছে নবীন যুবা কর্মঠ মালেক। মালেক আসগরের সঙ্গে তার সবটুকু সামর্থ্য ঢেলে দিয়ে কাজ করেছে।

আসগর মিয়া তার পুত্রতুল্য মালেকের সহায়তায় কঠিন পরিশ্রম ও সুকৌশলে বিয়ানচরে বিস্তার করে আধিপত্য। তার সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পুরনো দিনের কোন কোন পরিচিত মানুষ এসেছে বিয়ানচরে বসবাস করার জন্যে। আসগর মিয়ার এ সাফল্যের সময় নূরুর মা আমিনা উপস্থিত নেই। সে দুর্ভিক্ষের পর রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। ফলে আমিনার অনুপস্থিতিতে সাংসারিক কাজের দায়িত্ব নেয় নূরু। সে দক্ষতার সঙ্গে সংসারের সব কাজ কর্ম সামলাতে থাকে। সুখেই কাটে আসগর, মালেক ও নূরুর জীবন। সময়ের ব্যবধানে নূরু আর আগের মতো ছোট নেই ; সে এসে দাঁড়িয়েছে বয়ঃসন্ধিক্ষণে। যৌবনের ঊষা লগ্নে নূরুর মধ্যে মন উচাটন ভাব লক্ষ্য করে বিপাকে পড়ে মালেক। নূরুর অভ্যস্ত আচার-আচরণের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মালেকের মধ্যেও জেগে ওঠে কৌতূহল। সে বিনা কারণে হাসে, বিনা কারণেই মন খারাপ করে, গুণগুণিয়ে গানের সুর ভাঁজে। লাজ-নম্র মেয়ে নূরু নক্‌শী কাঁথায় রঙিন সুতোয় ছবি আঁকে। সে ছবিতে যেন মালেকের মুখই ফুটে ওঠে। নূরুর মনোভাবে মালেকও হয় তার প্রতি মুগ্ধ, অনুপ্রাণিত। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> এ যে তার বিয়ের কাঁথা—ফুল শয্যার রাতে—নতুন বর বধূর বিছানায় ফুলকাটা রঙীন নকসী কাঁথা বিছিয়ে দেয়, আর সেই কাঁথা বধূকে নিজের হাতে সেলাই করতে হয়।[৩৭]

রহিমপুর বসবাসের সময় থেকেই নূরু ও মালেক পরস্পরের প্রতি মমতা পোষণ করে আসছে। তারা একই সংসারে বড় হয়ে উঠেছে। নানা সূত্রে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ শোভন নৈকট্য। তাদের বাল্য-কৈশোরের ভালো লাগা যৌবনে এসে যেন ভালোবাসায় রূপ নিয়েছে। তারা আর আগের মতো সহজে যেন মিশতে পারে না পরস্পরের সঙ্গে। এরই মধ্যে একদিন দেখা গেল মালেক ধানের ছড়ায় গাথাঁ একটি মালা পরিয়ে দিচ্ছে নূরুর গালায়, এক জায়গায় একান্তে দেখা

---

৩৭. হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

করতে এসে। এ চিত্রটি ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন নিম্নরূপে :

> নূরু মাথা নীচু করে দাঁড়াল, মালেক যত্নে তার গলায় হার পারিয়ে দিল। নূরু নত হয়ে তাকে সালাম করল, কিন্তু মালেক তাকে ধরবার আগেই লঘু পায়ে পালিয়ে গেল। দরজার পাশে গিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়াল, তার চোখ মুখ হাসিতে উজ্জ্বল।[৩৮]

গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে নিষ্পাপ গ্রাম্য তরুণ তরুণীর অকৃত্রিম অনুরাগের চিত্রই এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। মালেক ও নূরুর এই নব অনুরাগ যে আনন্দের আয়োজন করে তার মাধুর্যে আসগর মিয়ার প্রাত্যহিক সংসার জীবন যেন আরও সাবলীল ও মধুময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আনন্দের বাস্তবতা আসগর মিয়া গ্রহণ করতে উৎসুক নন। তাদের সম্পর্ক ভাই-বোনের অতিরিক্ত কিছু বলে সে মনে করে না। আসগর মিয়ার এই ভাবনার অন্তরালে অকাট্য কোন যুক্তি থাকলেও মালেক ও নূরুর কাছে তা অজানা। সে কারণে তারা পরস্পরের প্রতি আরও আকৃষ্ট হতে অনাগ্রহী হয় নি। ইতোমধ্যে মালেকের জীবনে নেমে এলো এক দুঃখময় অধ্যায়। সে অপহৃত হলো জলদস্যুদের দ্বারা। এক দিন বাইরের জমি-জমার কাজ সেরে প্রতিদিনের মতো মালেক বাড়ি ফিরছে না দেখে আসগর, নূরু সবাই চিন্তিত। ক্রমে রাত বাড়ে ; তবু মালেক বাড়ি ফিরছে না। অবশেষে সবাই তাকে খুঁজতে বেরোয়। ঘটনার এ পর্যায়ে মঞ্চে আবির্ভূত হয় আজিজ। সে দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বন্যায় দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার স্ত্রী কুলসুম কন্যা সন্তান প্রসবকালে মৃত্যু বরণ করে। তারপর ছেলে দুটোও মারা যায় অসুখে। সবাইকে হারালেও আজিজ পদ্মার বলয়ের বাইরে যেতে পারে নি। তবে, জীবনের বার বার নিষ্ঠুর আঘাতে সে যেন হয়ে গেছে পাগলপারা। ঘটনার আবর্তে সে আবার ফিরে আসে বিয়ানচরে। নদী যেন তাকে বেঁধে রেখেছিল এক অদৃশ্য সুতোয়। তারই টানে আজিজ যেন ফিরে আসে নদীরই কাছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মালেকের কোন খবর সংগ্রহ করা যায় নি। চিন্তিত আসগর বিভিন্ন দিকে দলে দলে লোক পাঠায় মালেককে খুঁজতে। আসগর মিয়া নিজেও অনেক চেষ্টা করে তার কোন সন্ধান পায় নি। আসগর মিয়া গভীর বিষাদে নিপতিত পুত্রতুল্য মালেককে হারিয়ে। কন্যা নূরুর মুখ শুকিয়ে যেন চৌচির। তার খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে, পড়ে আছে সে অজ্ঞান হয়ে ; মালেকের অনুপস্থিতিতে শোকের ছায়া নেমেছে বিয়ানচরে। দিনের পর দিন অপেক্ষায় রয়েছে তারা মালেকের জন্যে। আসগরেরও ভেঙে গেছে মন, কিন্তু মেয়েটির ভাঙা মনে সাহস যোগাতে প্রতিদিন সে আজিজকে নিয়ে টিলায় যায়।

---

৩৮. ঐ, পৃ. ২১১

Dhaka University Institutional Repository

টিলায় যেতে যেতেই আজিজ আসগর মিয়ার সঙ্গে মালেক ও নূরুর প্রেম সম্পর্কে কথা তোলে। কিন্তু মালেক ও নূরুর সম্পর্ক ভাই-বোনের। এর বাইরে অন্য কোন সম্পর্ক বিবেচনা করতে পারে না আসগর মিয়া। আসগর মিয়া মলেক ও নূরুর প্রেমের সম্পর্ককে মানতে না চাওয়ার মধ্যেই রয়েছে যেন এক গোপন সত্য। শেষ পর্যন্ত এক দিন মালেক ফিরে আসে জেলেদের নৌকোয় চড়ে। নৌকা থেকে নেমে এলে আসগর মিয়ার সব দুঃখ যেন হয় অন্তর্হিত। মালেকের অনুপস্থিতিতে বিয়ানচরের মানুষের মনে যেমন নেমেছিলো শোকের ছায়া, তার ফিরে আসায় তাদের মনে তেমনই জেগেছে আনন্দের জোয়ার। আসগর মিয়া গ্রামের মানুষদের দাওয়াত দিয়ে জেয়াফত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে :

> পুরুষ্ট দেখে একটা বাছুর জবাই করে কালিয়া আর কবাবের আয়োজন হল, সমুদ্রের রকম বেরকমের মাছ ভেজে তাতে শুকনা লঙ্কা কাঁচা মরিচের বাটনা বেটে নানা রকমের ঝালঝোল অম্বল তৈরী হল।[৩৯]

আসগরের বাড়িতে উৎসবের আনন্দে আহারাদি সেরে সবাই মালেকের নিখোঁজ হওয়ার প্রকৃত কারণ জানতে চাইল। জানা গেল, মংপো জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল মালেক। দস্যুদের সঙ্গে মালেক চতুর ও সাহসী আচরণ করে বিয়ানচরের মানুষদের রক্ষা করেছে ডাকাতের কবল থেকে। ডাকাতদের সে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। মালেক তাদের জানিয়ে দিয়েছিলো, পঞ্চায়েত শক্তিশালী এবং ভয়ানক হিংস্র চরিত্রের। সে কারণেই হয়তো তারা অতি ভয়ে এ বিয়ানচরে হামলা চালিয়ে লুঠ-তরাজ করতে আসে নি। সে সময় জলদস্যুরা নদী তীরবর্তী লোকালয়ে হামলা চালিয়ে ধন-সম্পদ লুঠ করত এবং মেয়েদের সম্ভ্রমহানি করত। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> হার্মাদের হাতে মালেকের বন্দী হওয়া নিম্ন বঙ্গের এক নিমর্ম উপদ্রবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সে মোগল আমল থেকে পর্তূগিজ আর আরাকান বা মগ জলদস্যুদের আক্রমণে নিম্ন বঙ্গের মানুষ বারবার নিপীড়িত হয়েছে, বহু জনপদ তাদের লুণ্ঠন আর অপহরণে বিরাণ হয়ে গেছে, কোম্পানির আমলেও জলদস্যুদের উৎখাত শেষ হয় নি। মহারানী ভিক্টোরিয়া এ দেশ শাসনভার সরাসরি বৃটিশ সরকারের হাতে গ্রহণ করার পরেও জলদস্যুদের

---

৩৯. ঐ, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচার কমে নি। নিম্ন বঙ্গের মানুষের সেই দুর্ভাগ্যের কথা 'নদী ও নারী' উপন্যাসে রয়েছে।[৪০]

জেলেদের জন্যেই মালেক দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ঝড়ের কবলে দস্যুদের নৌকা ডুবে যাওয়ার অবস্থা লক্ষ্য করেছিলো জেলেরা। জেলেরা তাদের স্বভাবমত নদীতে বিপদগ্রস্ত নৌকা ঢেউয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছিল ; কিন্তু, দস্যুদের কাছে সে উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য হয় নি। সে কারণে, তারা তাদের স্বভাবসুলভ হিংস্রতায় জেলেদের আক্রমণ করে। কিন্তু জেলেরা সংখ্যায় বেশি থাকায় এবং ঝড়-তুফানে নদীতে লড়াই করে টিকে থাকার যোগ্যতা ডাকাতদের চেয়ে জেলেদেরই বেশি থাকায় ডাকাতরা সুবিধে করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত ডাকাতরাই ধরা পড়ে জেলেদের হাতে এবং নৌকার ভেতর থেকে জেলেরা মালেককে উদ্ধার করে বিয়ানচরে টিলার ওপরে পৌঁছে দেয়। আসগর মিয়া জেলেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জেয়াফতে দাওয়াত দিয়েছে তাদেরও ; এমন কি, তাদের নানা উপহার দিয়ে সম্মানিতও করেছে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> নতুন ধানের চিড়ে, নতুন গুড়ের পাটালি, সবার জন্য আনকোড়া কাপড় আর জেলের সর্দ্দারের বউয়ের জন্য ছাপাপেড়ে শাড়ী, আরশী, কাঁকন, পুঁতির মালা।[৪১]

এ সব সামগ্রী উপহার প্রদানের মধ্যে আসগর মিয়ার কৃতজ্ঞ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সবের মাধ্যমে অবশেষে বিয়ানচরের মানুষের মধ্যে নেমে আসে শান্তি, মালেকের অভাবে উদ্বিগ্ন সবাই হয় শান্ত। কিন্তু অশান্ত হয়ে ওঠে মালেকের মন। সে আজিজের মাধ্যমে জেনেছে, নূরুর প্রতি তার ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা পাবে না কোনদিন। শৈশব থেকে যৌবন অবধি যে দুজন মানুষের ভালোবাসায় লালিত হাজারো স্বপ্ন, অনিবার্যভাবে তাদের ভুলে যেতে হবে সে স্বপ্ন-সহ তাদের প্রেম ও প্রণয়ের প্রত্যাশা। এমন এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি মালেক ও নূরুকে উপস্থিত করেছে আসগর মিয়া। আসগর মিয়ার যৌবনকালের বন্ধু নজুমিয়া আসগরের সঙ্গে করেছিলো বিশ্বাসঘাতকতা। আসগর মিয়া তার আত্মীয়া আমিনাকে ভালোবাসতো, এ কথা নজুমিয়াও জানত। এ সত্য জেনেও সে আমিনাকে বিয়ে করার ব্যবস্থা পাকা করে প্রশাসন ও আমিনার মায়ের অর্থ-সম্পত্তির লোভ কাজে লাগিয়ে। নজুমিয়া ও আমিনার সে সংসারের সন্তান মালেক। এক পর্যায়ে

---

৪০. রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬
৪১. হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

নজুমিয়া সন্তান মালেককে রেখে আমিনাকে তাড়িয়ে পাঠিয়ে দেয় বাপের বাড়ি। এর কারণ হিসাবে নজুমিয়া অপবাদ দিয়ে বলেছে যে, আমিনা ও আসগর মিয়ার মধ্যে সম্পর্ক তখনও অব্যাহত। মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা নিয়ে আমিনা এসে দাঁড়ায় নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়ে। সে সময় অসহায় এ নারীর প্রতি এক দিকে মানবিক, অন্য দিকে পূর্ব প্রেমিকার জন্যে স্বাভাবিক আকর্ষণের কারণে আমিনাকে বিয়ে করে আসগর। আসগর ও আমিনার এ সংসারে জন্ম হয় নূরুর। এই জন্মসূত্রে মালেক ও নূরু একই মায়ের সন্তান। জীবন-বিড়ম্বিত এই নারীকে আসগর মিয়া দিয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সময়ের বিবর্তনে অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে কাহিনী এখানে এসে পৌঁছেছে। মালেক ও নূরু আসগর মিয়ার মুখ থেকে অতীতের এই ইতিহাস জেনে স্তব্ধ হয়ে গেছে গভীর বেদনায়। 'নদী ও নারী' উপন্যাসে প্রেমের মাধুর্যে লেখক শেষ পর্যন্ত যেন ভরে দিয়েছেন তীব্র বিষে। প্রেমের এই অস্বাভাবিক উপস্থাপনার মধ্যে এক ধরনের প্রতীকী ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। নদীর ভাঙা-গড়ার কবলে পড়ে জীবনের ওলট-পালট হওয়া শুধু বৈষয়িক ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, হৃদয়বৃত্তিও যেন সেখানে হয় বিপর্যস্ত। বেদনার্ত, বিধ্বস্ত একটি মন নিয়ে মালেক আসগর মিয়ার আশ্রয় ছেড়ে চলে যায় দূরে, অজানার পথে। বুকভরা আশা তার পাথেয়। এক নিষ্ঠুর সত্যকে নিরবেই সইতে হলো তিনজনকে। আসগর নূরুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে :

> নদীর বুকের মানুষ আমরা—জল আর কাদার সঙ্গে আমাদের কারবার। বালু চরের উপর ঘর বাঁধি, নদীর স্রোতে সে ঘর বার বার ধুয়ে মুছে ভেসে যায়। তবু আমরা হার মানি না, নতুন করে আবার ঘর বাঁধি। অ-ভাঙা জমিকে আবাদ করি, ভাঙা জমির বুকে ফলাই সোনার ফসল। নদী যতবার সব ভেঙে ফেলে, ততবার আমরা নতুন করে গড়ি।[৪২]

মালেক যেন সর্বস্বান্ত। তাকে আসগর মিয়া ও নূরুর সাহচর্য ত্যাগ করতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে, মালেকের এই চলে যাওয়া মন থেকে আসগর মিয়া ও নূরু কেউ-ই সমর্থন করে না। কিন্তু উপস্থিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতির বাস্তবতা মালেককে চলে যেতে বাধ্য করে যেন ; তাই নিরব, ভাষাহীন আসগর মিয়া ও নূরু। মালেক চলে যেতে যেতে প্রত্যয়দীপ্ত হয়ে ওঠে, ভাবে নতুন করে গড়ে নেবে তার জীবন। অসহায় আসগর মালেকের এই বিদায়কে উৎসাহিত করে নিজেকে প্রবোধ

---

৪২. ঐ, পৃ. ২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে, মানুষের জীবনের ভাঙা গড়া নদীর ভাঙা-গড়ার সঙ্গে সমান্তরাল বিবেচনা করে বলে :

> নদীর ধারা বদলাবেই। এ পাড় ভাঙলে ও পাড় গড়বে। পুরানো খাদ ছেড়ে নতুন খাদ খুঁজবে—নদীর রীতিই এই। কিন্তু তবু পুরানো খাদকে ভোলে না নদী—বার বার পুরানো খাদে ফিরে আসে।[৪৩]

বলা বাহুল্য, এ সব কথায় মালেকের মন প্রবোধ পায় না, হয় না তার অবস্থানেরও পরিবর্তন। সে তাই বেরিয়ে পড়ে তার জীবনকে নতুন করে গড়ার লক্ষ্যে।

---

৪৩. হুমায়ুব কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পসাফল্য : নদী ও নারী

'নদী ও নারী' তিন খণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাস। খণ্ডগুলোর নাম: 'নজুমিয়া', 'আসগর', এবং 'নূরু ও মালেক'। নজুমিয়া আট, আসগর আট এবং নূরু ও মালেক ছয় পরিচ্ছেদ সংবলিত। প্রতিটি খণ্ডের রয়েছে কাহিনী-সংক্ষেপে। শেষ খণ্ডের শেষেও রয়েছে 'শেষ' নামে একটি অংশ।

উপন্যাসের মূল কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ না করে নায়ক নজুমিয়া পদ্মানদীর তীরে দাঁড়িয়ে তার অতীত দিনের নানা ঘটনার স্মৃতিচারণ করছে। সর্দার রহিম বখস্, বন্ধু আসগর মিয়াকে নিয়ে জঙ্গল সাফ করে অনাবাদী জমি চাষ করার কঠিন পরিশ্রমের কথা মনে করে নজুমিয়া। পরবর্তীতে সাফল্যের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত হিসেবে সে পেয়েছে স্বীকৃতি ; এক সময়কার দারিদ্র্য-পীড়িত নজুমিয়া পদ্মার তীরে এসেই জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করেছে ; সেই ফসলই তাকে ক্রমান্বয়ে দিয়েছে অর্থনৈতিক শক্তি। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ নজুমিয়ার দহলিজ এবং উজান ডাঙ্গার খালের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। নজুমিয়ার সংসারে রয়েছে তার মা আয়েষা ও ছেলে মালেক ; এ ছাড়া রমজান, বসির, ইদ্রিস, কুলসুম, গোলাপী সবাই এ পরিবারের কাজের লোক। আয়েষার বুদ্ধিতে চলে নজুমিয়ার সংসার। মালেক নজুমিয়ার মাতৃহীন ছেলে। সে ব্যাঙের চার দিয়ে বড়শিতে একটি কুমির ধরেছে। এ কুমির ডাঙায় তোলার প্রস্তুতির মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। আয়েষা নাতির কুমির শিকারকে স্বাগতম জানিয়ে মৌলুদ শরীফের ব্যবস্থা করতে বলেছে নজুমিয়াকে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুমির শিকারের ঘটনাটি অতি দ্রুত ধূলদীর হাটের মানুষেরা শুনে ফেলে। নজুমিয়া হাটের মধ্যে হেকিম সাহেবের কাছে আটকে পড়ে। হেকিম সাহেব কুমিরের কলজে আর গুর্দা পাওয়ার জন্যে অনেক যত্ন করেছে নজুমিয়াকে। কিন্তু নজুমিয়া হেকিম সাহেবের ঔষধ তৈরির কাজে কলজে আর গুর্দা দিতে পারে নি। সেগুলো আগেই ফেলে দেওয়া হয় নদীতে। সে কারণে নজুমিয়াকে অপমান করেছে হেকিম সাহেব। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধূলদীর হাটের গুরুত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। নজুমিয়া কিষাণ চুক্তি করতে এসেছিলো সেখানে। রমজান কিষাণের সঙ্গে কথা বলেও তার সঙ্গে চুক্তি না করায় সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। কিষাণেরা চলে গেছে আসগরের নৌকোয়। কিষাণ না পাওয়া এবং হেকিমের সঙ্গে ঝগড়—এ

Dhaka University Institutional Repository

সব কারণে নজুমিয়ার মন খারাপ। ঠিক তখনই রমজানের মাধ্যমে বাজারের ও প্রান্তে অস্তানা গড়ে তোলা এক ফকিরের নিমন্ত্রণ পায় নজুমিয়া। ফকিরের আস্তানার সামনে অনেক মানুষ। ফকিরের দাওয়াই চেয়ে বসে গরিব হামদু চাচা। ফকির তাকে দাওয়াই দিতে সম্মত হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে নজুমিয়া ফকিরের আস্তানায় যায়। সেখানে ফকির ও নজুমিয়া ভাব বিনিময় করে অনেক আন্ত রিকতার সঙ্গে ; কিন্তু পরে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে। নজুমিয়া যখন বুঝতে পারল যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আসগর মিয়াকেও আসতে বলেছে ফকির তখন নজুমিয়া স্বাভাবিকভাবেই হলো রাগান্বিত। এক পর্যায়ে নজুমিয়া ও আসগর মিয়ার মধ্যে সৃষ্টি হয় মারমুখী পরিস্থিতি। কোরাণ তেলাওয়াতের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামলে নেয় ফকির। সে নজুমিয়াকে বেওকুফ বলেছে, একই সঙ্গে দিয়েছে অভিশাপও। পঞ্চম অধ্যায়ে ধূলদীর হাট থেকে বাড়ি ফিরেছে নজুমিয়া। তার আগেই আয়েষা কৌশলে রমজানের কাছ থেকে ধূলদীর হাটের ঘটনা জেনে নিয়েছে। তাই সে নজুমিয়াকে পদ্মার ওপারে নতুন জেগে ওঠা চর দখল করার জন্যে যেতে দিতে চায় না। কিন্তু তাকে যেতেই হবে। শেষ পর্যন্ত আয়েষাকে নজুমিয়া কথা দিয়েছে যে, সে ফিরে এসে ফকিরকে দাওয়াত করে খাওয়াবে, মিলাদ দিয়ে তাকে খুশি করবে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে ফকিরের আগমন উপলক্ষে প্রস্তুতি, ফকিরের আগমন ও দোয়া প্রসঙ্গ। পদ্মার ওপারে বসিরের কথায় নজুমিয়া পুবের চর দখল করেছে। পুব দিকের চর দীর্ঘদিন টিকে থাকে। বাড়ি ফিরে ধূলদীর হাটে গিয়ে নজুমিয়া ফকিরকে দাওয়াত করে। আসন্ন পূর্ণিমার দিন ফকির আসবে রহিমপুরে নজুমিয়ার বাড়িতে। নির্দিষ্ট তারিখে ফকিরের আসার আগে সাজ-সজ্জা করা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করা, ফকিরের ওয়াজ, ওয়াজ শেষে মোনাজাত ইত্যাদি পর্বসমূহ সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে এ পর্যায়ে। সপ্তম পরিচ্ছেদে ফকির চলে যায় মিলাদ শেষ করে। ফকির অন্দর মহলে প্রবেশ করে আয়েষার সঙ্গে কথা বলে, মালেককে আশীর্বাদ করে। তখন দূর হয় আয়েষার মনের সন্দেহ । এ পরিচ্ছেদে ইব্রাহিমের মেয়েকে জ্বিনের আছর থেকে মুক্ত করার জন্যে চিকিৎসা করেছে ফকির সাহেব। অষ্টম পরিচ্ছেদে আছে বিলি করা জমির খাজনা তুলতে নজুমিয়ার পদ্মা পাড়ি দেয়া এবং ঝড়ের কবলে পড়ে তার মৃত্যু। ঘটনার বিবরণে আছে, মেঘমুক্ত আকাশ হঠাৎ কালো মেঘে ছেয়ে যায়, শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়। ঝড় আসতে পারে বলে সন্দেহ হয়েছিল আয়েষার সেজন্যেই নজুমিয়াকে সে পদ্মা পাড়ি দিতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু জমির খাজনা তুলে জমিদারের পাওনা মেটাতে না পারলে জমি বাজেয়াপ্ত হতে পারে। সে কারণে প্রাণের মায়া ভুলে নজুমিয়া পাকা মাঝি বসিরকে নিয়ে পদ্মা

Dhaka University Institutional Repository

পাড়ি দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু প্রকৃতির সেই ভয়াল শক্তির মোকাবেলা করে নজুমিয়া বাঁচতে পারে নি। কেবল পাকা মাঝি বসির মৃতপ্রায় অবস্থায় নদীতে জেলেদের সাহায্যে প্রাণে বেঁচে যায়।

'নদী ও নারী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের নাম আসগর। এ খণ্ডের মূল কাহিনী শুরুর পূর্বে ঔপন্যাসিক নজুমিয়া ও আয়েষার মৃত্যু ঘটিয়ে যেন এ অংশের একটি ভূমিকা তৈরি করেছেন। পুত্র শোকে কাতর আয়েষা, উদ্বিগ্ন মালেকের ভবিষ্যৎ নিয়েও। উদভ্রান্ত আয়েষা ছুটে যায় নদীর ধারে। তার ছেলে নজুমিয়া যেন নদী পথে ফিরে আসবে বাড়ি, এমনই মনোভাব এই পুত্রহারা মায়ের। এক দিন গভীর রাতে নদীর ঘাটে গিয়ে মুর্ছা গিয়ে সেখানেই মারা যায় আয়েষা। আয়েষার মৃত্যু আর বসিরের বেঁচে থাকা পাল্টে দেয় উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি। এর পর দ্বিতীয় খণ্ডের মূল কাহিনী শুরু। দ্বিতীয় খণ্ড আসগর-এর প্রথম পরিচ্ছেদে ডানপিটে কিশোর মালেকের কাহিনী দিয়ে অগ্রসর হয়েছে উপন্যাসের প্রসঙ্গ। বসির, কুলসুম, গোলাপী– তিন জনের কাছেই থাকে মালেক। মালেকের জন্যে অপেক্ষা করে আছে কঠিন এক সত্য। সেটি উন্মোচিত হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে। সবার স্নেহে মালেক ধন্য, তাকে বসির তীর ধনুকও তৈরি করে দেয়। এ পরিচ্ছেদের শেষে দেখা যাচ্ছে বসিরের সঙ্গে আসগর মিয়ার মেয়ে দুরন্ত নূরুর সঙ্গে পরিচয় হয়। এক সময় কিশোর মালেকের ও সাবুর মধ্যে ঝগড়া হলে তা মিটিয়ে দেয় বসির। তাদের এই দুষ্টমি আরও প্রলম্বিত হয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। মালেক কুল গাছের মগ ডালে উঠে কাঁচাপাকা কুল ছিড়ে তা কুলসুমের শরীরে ছুঁড়ে দেয়। এ ছাড়াও এই পরিচ্ছেদের রয়েছে সাবুর মতো দুঃসাহসী এক কিশোর। তারা বড় নদীতে নৌকায় ঘুরে বেড়ায়, মাছ ধরতে যায়, সাঁতার কাটে ; সাঁতার প্রসঙ্গে সাবু মালেককে তিরস্কার করে, সাবুর সে তিরস্কারের উত্তর মালেক দেয় নদীতে সাঁতার কেটে সাবুকে ঠকিয়ে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে লক্ষ্য করা যায়, নজুমিয়ার সংসারের দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে বসিরের চিন্তা, অস্থিরতা। সে ভাবে মালেকের সম্পত্তি ও নজুমিয়ার অতীত ঐতিহ্যের কথা। সে কুলসুম ও গোলাপী সম্পর্কেও চিন্তা করে, তাদের কাছে পরামর্শ চায় ; কিন্তু তারা পরামর্শ দিতে পারে না। বসির ভাবে অন্য কিছু, সে সব জমির দায়িত্ব আসগর মিয়াকে দিতে চায়। আসগর মিয়া খাজনা উঠাতে বসিরের মতো ব্যর্থ হবে না। ফলে জমিদারের পাওনা মিটিয়ে জমি বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। তা ছাড়া বসির মালেক ও নূরুর বিয়ের কথা ভাবে। এবং সে ভাবনার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়ে সে ভরসা পেতে চায় এই ধারণায়-- দু পক্ষের সন্তানদের বিয়ের মাধ্যমে কখনও কখনও গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির পূর্ব শত্রুতা দূর করা যায়। এখানে মসজিদ-ভিত্তিক গ্রাম্য সমাজের কথা

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে মালেককে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয় বসির। গ্রামের পথে অন্ধকার রাতে আলো ও লাঠি হাতে বসির মালেককে খোঁজার সময় গলু পাগলার দেখা পায়। অবশেষে মালেককে আসগর মিয়া তার বাড়ি থেকে কাঁধে করে পৌঁছে দিয়ে যায় বসিরের কাছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বসির নজুমিয়ার সমস্ত সম্পত্তির ভার আসগর মিয়ার ওপর অপর্ণ করার প্রস্তাব দেয়। আসগর মিয়া এ কথা শুনে তার সামাজিক দায়িত্বের কথা ভাবে, ভাবে নজুমিয়ার সঙ্গে তার পূর্ব শত্রুতার কথাও। সামাজিক ভাবেই বসিরের উত্থাপিত এ সমস্যাটির সমাধান চিন্তা করে আসগর মিয়া। গ্রামের মানুষদের নিয়ে একটি বৈঠক করে সে। সেখানে উপস্থিত সবাই আসগর মিয়াকেই মালেকের দায়িত্ব নিতে বলে। আসগর মিয়া তার নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে সবার সাক্ষাতে মালেক ও তার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়। সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে, মালেক আসগরের বাড়িতে আশ্রিত। নূরুর মা আমিনা মালেককে সন্তানের মতো স্নেহ-যত্ন করে। নূরুর সঙ্গেও তার সম্পর্ক বন্ধুত্বের। আসগর মিয়াও তাকে অল্প সময়ের মধ্যে আপন করে নেয়। বসির ও কুলসুম আসগর মিয়ার বাড়িতে এসেছে মালেকের সঙ্গে। এ পরিচ্ছেদে কুলসুমের জীবনে ঘটে একটি পরিবর্তন। আমিনার উদ্যোগে কুলসুমের বিয়ে হয় আজিজের সঙ্গে। আসগর মিয়া ও বসির অনেক চেষ্টা করে কুলসুমের এ বিয়ের ব্যবস্থা করে। অষ্টম পরিচ্ছেদে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও বন্যার তাণ্ডব দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টিতে রহিমপুরের মাটি হয় ফসলহীন। ফলে, খাদ্য ঘাটতি এবং দুর্ভিক্ষের সূচনা ঘটে। পরিণতিতে মানুষ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বেঁচে থাকার চেষ্টায় রত। অবশেষে বৃষ্টি নামলো অঝোর ধারায়। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে পদ্মায় বান ডাকলো। ফলে, গ্রামের পর গ্রাম হলো ক্ষতিগ্রস্ত। গাছের ডালে, ঘরের চালে, নৌকোয়—যে যেভাবে সম্ভব জীবন রক্ষায় ব্যস্ত। আসগর মিয়াও সর্বস্ব হারিয়ে সপরিবারে—নৌকোয় রওয়ানা দেয় অন্য কোথাও ঘর বাঁধার আশায়।

'নদী ও নারী' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের নাম 'নূরু ও মালেক'। তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর মতো একটি অংশ রয়েছে, যা মূল খণ্ডের বাইরে।

এ অংশে উনিশ বছর বয়সী মালেক একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে তার অতীত জীবনের কথা মনে করছে। সে একজনকে ভালোবাসে, একজনের ভালোবাসা পেতে চায়। মালেক আসগর মিয়ার জীবনের ভাঙা-গড়ার কথাও চিন্তা করে। সে বিয়ানচরের পঞ্চায়েত ; পরিশ্রম ও বুদ্ধির মাধ্যমেই তার আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কিন্তু আসগর মিয়ার এই সুখের ভুবনে যেন

Dhaka University Institutional Repository

নেই আমিনা। সংসারের দায়িত্ব নূরুর ওপর, সে ভালোভাবেই সংসার পরিচালনা করছে। এর পরই শুরু হয়েছে তৃতীয় খণ্ডের মূল অংশ।

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে নূরু আসগর মিয়ার সংসারের অভ্যন্তরীণ কর্ত্রী। পরিচ্ছন্নভাবে সংসারে গুছিয়ে সব দায়িত্বই সে পালন করে। নূরু বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপস্থিত, তার আচার আচরণেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সে অকারণে হাসে, গান গায়, কাঁথা সেলাই করে। তার সেলাই করা কাঁথায় মালেকের মুখচ্ছবি ফুটে ওঠে। মালেক ও নূরুর প্রেমের কথা জানা যায় এ পরিচ্ছেদে। মালেক সংগোপনে এসে ধানের ছড়ায় গড়া 'সাতনাড়া' হার পরিয়ে দেয় নূরুর গলায়। আসগর মিয়া যে একজন সার্থক কৃষক তা লক্ষ্যযোগ্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। সে তার সব দায়িত্ব মালেকের হাতে তুলে দিয়েছে। এক দিন জমি থেকে মালেকের বাড়ি ফিরতে দেরি হলে আসগর ও নূরু চিন্তিত হয়ে ওঠে। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। চারদিকে তার খোঁজে মানুষ পাঠানো হয়। আসগর নিজেও নৌকা নিয়ে বের হয় মালেকের খোঁজে। কিন্তু কোথাও তার খোঁজ মেলে না। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মালেকের অনুপস্থিতিতে আসগর মিয়ার বাড়িতে নামে দুঃখের কালো ছায়া। প্রতিদিন আসগর মিয়া আজিজকে নিয়ে টিলার ওপর মালেকের খোঁজে যায়। এক এক করে এক মাস পার হয়ে যায় ; কিন্তু মালেকের কোন খবর মেলে না। অনেকে মনে করে, মালেক আর ফিরবে না; কিন্তু আজিজ বিশ্বাস করে যে মালেক ফিরবেই। এক দিন আসগর মিয়া নূরুকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই আজিজকে নিয়ে টিলার ওপর যায়। এবং সে দিনই মালেক ফিরে আসে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, মালেকের ফিরে আসায় আসগর মিয়ার বাড়িতে বয়ে যায় সুখের বন্যা। আসগর মিয়া খুশী হয়ে গ্রামের সব মানুষকে দাওয়াত করে খাওয়ায়। উপস্থিত সবাই মালেকের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা জানতে আগ্রহী। মালেক মংপো দস্যুর কবলে পড়ার ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে মালেকের বুদ্ধি ও কৌশলের কারণে ডাকাতদের আক্রমণ থেকে বিয়ানচরের মানুষেরা রক্ষা পায়। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে। এখানে জেলেদের সর্দারকে নানা উপহার সামগ্রী প্রদান করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে আসগর মিয়া। এ পরিচ্ছেদেই উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসের ট্রাজেডির কারণ। মালেক ও নূরুর প্রেমের সম্পর্ক যে আসগর মিয়া সমর্থন করতেই পারে নি তার একমাত্র কারণ তারা একই মায়ের সন্তান। এই তথ্য মালেক ও নূরুর জানা ছিলো না ; কিন্তু জানা ছিলো আসগর মিয়ার। কঠোর সত্য প্রকাশ পেলেও ঘৃণায়, বেদনায় মালেক আসগর মিয়ার সান্নিধ্য ছেড়ে চলে যায় অন্যত্র। অজানার উদ্দেশে। এর পর

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের শেষে 'শেষ' বলে একটি ক্ষুদ্র অংশে আসগর, নূরু ও মালেকের জীবনের বাস্তব অথচ করুণ পরিণতির পুনরুল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক।

'নদী ও নারী' উপন্যাসের প্রধান উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলোর মধ্যে পড়ে নজুমিয়া, আসগর, মালেক, বসির, আয়েষা, আমিনা ও নূরু। গৌণ চরিত্রের মধ্যে পড়ে রমজান, ইদ্রিস, কুলসুম, গোলাপী, আজিজ, গলু পাগলা, হামদু চাচা, মতির মা, হেকিম, ফকির, এবং কিশোর চরিত্র সাবু ও মতিন। সর্বোপরি 'নদী ও নারী' উপন্যাসে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'পদ্মা' নিজেই। নদীর অস্তিত্বময় উপস্থিতি প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন, 'এ-উপন্যাসে জীবন প্রবাহ ...নদীর বহমানতার সাথে সমান্তরালভাবে উপস্থিত।[১]

নজুমিয়া দরিদ্র। জেগে ওঠা পদ্মার চরে সে আসে জমি চাষ করে ফসল ফলিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে। নজুমিয়ার এ স্বপ্নের ব্যাপারে সব ধরনের সমর্থন দেয় চরের সর্দার রহিম বখস্। রহিম বখস্ নজুমিয়াকে কাছে ডেকে বলে :

> জমির চেহারা দেখে ভয় পাস নে বেটা। এ তো জমি নয়—এ যে সোনা। এক বার ঘাস কেটে জঙ্গল সাফ করে চাষ করলে দেখবি দুগুণো ফসল পাওয়া যাবে। নতুন চরের মাটি, হেসে খেলেও এতে বর্ষায় ধান আর চোত বৈশাখে চৈতালী পাওয়া যাবে। তবে তার জন্য খাটুনী চাই।[২]

রহিম বখসের আশ্রয়ে ও বন্ধু আসগর মিয়ার সাহায্যে নজুমিয়া পদ্মাতীরে সাফল্য অর্জন করে। আসগর ও রহিম বখস্ নজুমিয়ার যৌবনকালের সহচর। আসগর ও নজুমিয়ার মতো সংগ্রামী ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে দুজনই রাতদিন পরিশ্রম করেছে সমান তালে। তারা দুজন হালের বলদের অভাব মেটাতে কাঁধে জোঁয়াল তুলে নিয়েছে, ফলিয়েছে পর্যাপ্ত ফসল। পরিণামে পেয়েছে সামাজিক মর্যাদাও।

নজুমিয়ার সংসারের সদস্য তার মা আয়েষা এবং মাতৃহীন একমাত্র ছেলে মালেক। এ ছাড়া রমজান, বসির, ইদ্রিস, কুলসুম ও গোলাপী বাড়ির কাজের লোক। মায়ের প্রতি অবিচল ভক্তি নিয়ে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী নজুমিয়া সংসার চালায়। নদী তীরবর্তী এ গ্রামীণ জীবনে ধূলদীর হাটের অনেক প্রভাব। রহিমপুরবাসী মানুষরা ক্রমে হাট-বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। সব ধরনের বেচাকেনা চলে এই হাটে। এমন কি বিয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজও এ হাটের থাকে

---

১. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ : বাংলা কথা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১১২

২. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, ঢাকা ও কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা। সে কারণেই হাটকে কেন্দ্র করে গ্রামের সব-খবরাখবরও সহজে প্রচারিত হয়। এই হাটেই কিশোর মালেকের কুমির শিকারের ঘটনাটি বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়। হাটের মধ্যে হেকিম সাহেব এ কুমিরকে কেন্দ্র করে নজুমিয়ার সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। নজুমিয়া পঞ্চায়েত বলে কোন ক্ষমতা বা শক্তি দেখায় নি, ফকিরকে আঘাত করে নি বরং জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে সে তাকে ব্যঙ্গ করে বলেছে :

> ঘরে ডেকে এনে মানুষকে অপমান করাই বোধ হয় আপনাদের মতন ভদ্দর লোকের ব্যবহার।[৩]

নজুমিয়া স্বাভাবিকভাবে একজন মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু নিজ স্বার্থের বেলা সে অন্য রকম। এক সময় আসগর মিয়াই হয়ে ওঠে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। হাট থেকে নৌকায় এসে রমজানের কাছে যখন সে জানল যে, কৃষাণরা আসগরের কাছে কাজ নিয়েছে, তখন নজুমিয়া প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে পড়ে। নজুমিয়ার ধর্ম বিশ্বাসে বস্তুবাদী মানসিকতার প্রতিষ্ঠা না থাকলেও তাতে যে রয়েছে বাস্তব চিন্তার প্রতিফলন তা আমরা ধূলদীর হাটে ফকিরকে দাওয়াত করার সময়ে উপস্থিত ঘটনায় দেখতে পাই। সেখানে তার সাগরেদদের কাছে নজুমিয়া জানতে চায় তাদের পাঠ করা কোরাণের বিভিন্ন আয়াতের অর্থ। ছাত্ররা উত্তরে বলেছে :

> খোদার কালাম পড়ছি, হেফজ করে মুখস্ত করছি, তার আবার মানের কথা ভাবে কে ?[৪]

মাতৃভাষা বাংলায় অর্থ না বুঝে কোরাণ শরীফ পড়া এ দেশে একটি সাধারণ রেওয়াজ। ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্ম গ্রন্থের অর্থ জানাতে কখনও আগ্রহী নয়। অজানা, অজ্ঞান সব সময়ই তাদের ধর্ম ব্যবসায়ের একটি হাতিয়ার। নজুমিয়ার প্রশ্নটি ধর্মের সেই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ যেন। নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নজুমিয়া সব সময়ই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছে, সে পদ্মার ওপারে জেগে ওঠা চর দখল প্রসঙ্গে তার মাকে বলে :

> তুমি কি চাও যে তোমার মালেক পথে দাঁড়াক। তোমার মালেক আসগরের ছেলেপুলের কাছে মাথা নীচু করে থাকবে।[৫]

অবশেষে বৈশাখের নদী পাড়ি দিতে সম্মতি দেয় আয়েষা। নদীর ওপারে চর দখল শেষে ফিরে এসে হেকিম সাহেবকে দাওয়াত করে মিলাদ দেয় নজুমিয়া এবং গ্রামের মানুষকে দাওয়াত

---

৩. ঐ, পৃ. ৩৬
৪. ঐ, পৃ. ৭০
৫. ঐ, পৃ. ৬৪, ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

করে খাওয়ায়। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নজুমিয়ার সুনাম বেড়েছে। স্বাপ্নিক নজুমিয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় সদা-উদ্বিগ্ন এবং সম্ভবত সে কারণেই নিজের প্রত্যাশা পূরণে বেপরোয়া। তার এই মানসিকতার ভিত্তি হলো অতীত জীবনের বিয়ের ঘটনাবলি। সে ও আমিনা ছিলো বাল্য প্রেমে বিমুগ্ধ। নজুমিয়া গ্রাম্য মাতব্বর ও আমিনার মায়ের সাহায্যে আমিনাকে বিয়ে করে। কিন্তু আসগর ও আমিনার মধ্যেকার হৃদয়ের সম্পর্ক জানার পরও সে এই হঠকারী কাজ করতে পিছপা হয় নি। এই বঞ্চনার-বেদনার কখনও বোধ করি উপশম হয় নি ; এমন কি, পরে আমিনাকে বিয়ে করতে পারলেও। বিয়ের আগে আসগর নজুমিয়াকে অনুরোধ করেছিল আমিনাকে বিয়ে না করার জন্যে ; আসগরের অনুরোধ নজুমিয়া উপেক্ষা করে তাকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পাঠায় জেলহাজতে। আবার বিয়ের অনেক দিন পর প্রায় বিনা কারণেই আমিনার ছেলে মালেককে রেখে দিয়ে নজুমিয়া আমিনাকে পাঠিয়ে দেয় তার গরিব বাপের বাড়ি। নজুমিয়ার এই হৃদয়হীন আচরণ সম্পূর্ণ নৈতিকতা ও মানবতাবোধ বিবর্জিত। প্রকৃতির ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে জেগে উঠা চর নজুমিয়া দখল করেছে অনায়াসে। ঠিক একই ভাবে অন্যের প্রেমিকাকেও সে দখল করেছে এবং পরে তাড়িয়ে দিয়েছে নির্দ্বিধায়। এ ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী, বেপরোয়া। নজুমিয়ার জীবন দর্শনের মূল ভিত্তি হলো ঐ মানসিকতাই। নদীর ভাঙাগড়ায় প্রকৃতি কোন বাছবিচার করে না, নিষ্করুণ, নিষ্ঠুর। পলি জমে, তা দেখে জাগে জীবিকার সম্ভাবনা। কিন্তু মুহূর্তেই তা অনেক সময় উবে যায়। নজুমিয়া নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রকৃতির মতোই বুঝি বা। পদ্মার ওপারে বিলি করা জমির খাজনা উঠিয়ে আনা খুব জরুরী। এ টাকা দিয়ে জমিদারের পাওনা মেটাতে হবে, নইলে জমি হয়ে যাবে বাজেয়াপ্ত। এ কারণে, নদী যতই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিত থাকুক না কেন, নজুমিয়াকে যেতেই হবে পদ্মার ওপার। বাঁচা মরার হিসাব না করে নজুমিয়া তাই পাড়ি দিতে যায় পদ্মা, সঙ্গে পাকা মাঝি বসির, রমজান ও ইদ্রিস। কিন্তু প্রকৃতির ভয়াবহতা এড়াতে পারে নি তারা। ঢেউ তার প্রবল শক্তি দিয়ে নৌকা ভেঙে ডুবিয়ে দিয়েছে তাদের প্রায় সকলকে। বেঁচে যায় কেবল বসির। পদ্মার তীরবর্তী চাষীদের অস্তিত্বের সংগ্রামের প্রতীক নজুমিয়া জীবন-সংগ্রামী। তার জীবনের শেষ মুহূর্তও কেটেছে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে, নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে। তারই প্রতিফলন

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় নজুমিয়ার শেষ উচ্চারণে :

বৈঠা ছেড়ো না। যদি নৌকা ডোবেও, বৈঠা ধরে হয়তো কোন চরে গিয়ে উঠতে পারবো।[৬]

আসগর উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। নজুমিয়ার মৃত্যুতে শোকাকুল আয়েষার মৃত্যু উপন্যাসের কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে অন্য দিকে। নজুমিয়া ও আয়েষার অনুপস্থিতিতে উপন্যাসের সৃষ্ট সমস্যার সমাধান হিসেবেই যেন আসগর মিয়ার উপস্থিতি। নজুমিয়ার মৃত্যুর পর আসগর মিয়াকে গ্রামের পঞ্চায়েত-সহ, সবাই মেনে নেয়। সে সাধু ও পরিশ্রমী। 'ইনসাফ'-এর মাধ্যমেই সে বিচার-আচার করে গ্রামে। নজুমিয়ার মৃত্যুতে কিশোর মালেক ও তার সম্পত্তি—উভয়ই রক্ষার জন্যে বসির অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে আসগর মিয়াকে সে ঐ দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করে। কিন্তু আসগর মিয়া এটিকে তার সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করেও হয় দ্বিধান্বিত। কারণ নজুমিয়ার সঙ্গে ছিল তার শত্রুতা। কোন ভাবে মালেকের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হলে লোকে বলবে, হাতে পেয়ে সে পূর্ব শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছে। সে কারণে গ্রামের মানুষদের নিয়ে নজুমিয়া একটি বৈঠক বসায় এবং যে কোন ব্যক্তিকে মালেকের দায়িত্ব নিতে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু তখন কোন লোকই এগিয়ে আসে না। তারা বরং আসগর মিয়ার ওপরই চাপিয়ে দেয় দায়িত্বটি। শেষ পর্যন্ত নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে আসগর গ্রহণ করে মালেককে। তবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় সে তার গ্রামবাসীদের সাক্ষী মানে।[৭]

মালেকের সঙ্গে বসির ও কুলসুম আসগর মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় পায়। সেখানে যৌবনে বিধবা কুলসুমকে বিয়ে দিয়ে আসগর সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে। এ বিয়ের মাধ্যমে কুলসুম স্বামী-সন্তানের স্বপ্ন দেখছে। পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে রহিমপুর গ্রামে। দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের প্রতি তার দয়ার মনোভাব হয়েছে সম্প্রসারিত। চুরি বেড়েছে গ্রামে। কামলারা কাজ পায় না। কাজের অভাব। ফলে না খেয়ে মরে যাওয়ার উপক্রম হতেই তারা চুরির পথ বেছে নিয়েছে।

---

৬. ঐ, পৃ. ৯৪
৭. ঐ, পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে আসগর মিয়ার মনোভাব নিম্নরূপ :

> কে চোর, আর কে সাধু ; সে এক আল্লাহ জানেন। তেমন বিপাকে পড়লে সে নিজে কি করত, বলতে পারে না। নূরু যদি অনাহারে কাঁদে, নূরুর মা যদি না খয়ে শুকিয়ে যায়, তবে কি সে চুপ ক'রে থাকত ? [৮]

আসগর মিয়ার এ মনোভঙ্গি মানবিক। দুর্ভিক্ষের মধ্যেই রহিমপুরের মৃতপ্রায় মানুষগুলোর জীবনে নেমে আসে আর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। অনাবৃষ্টির পর আসে অতিবৃষ্টি। ফলে প্লাবিত হয় পদ্মার তীর। ক্রমে ভেসে যায় গ্রাম ও জনপদ; মানুষ ও প্রাণী কারও নেই বিপদের অন্ত। মানুষ ঘরের চালে, গাছের ডালে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে । নৌকোয় পরিবারবর্গ নিয়ে আসগর মিয়া রওয়ানা দেয় অজানার উদ্দেশে। তারপর বিয়ানচর নামক স্থানে নতুন করে শুরু করে জীবন। সেখানেও সমৃদ্ধির মুখ দেখে আসগর ও মালেক। এর মধ্যে এক পর্যায়ে গড়ে ওঠে মালেক ও নূরুর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক। এবং তা আসগর মিয়ার অজ্ঞাতসারে। এক সময় বিপন্ন আসগর দুজনকেই জানিয়ে দেয় অতীত জীবনের ঘটনা। মালেক ও নূরু তখন কান্নায় ভেঙে পড়লেও, আসগর মিয়া তার নৈতিক বিচারবোধ দিয়ে তাদের ভুল পথে চলা বন্ধ করতে সক্ষম হয়। আসগর মিয়া তার ক্ষমাশীলতা নজুমিয়ার ক্ষেত্রে দেখিয়েছে। নজুমিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়েও আসগর তা গ্রহণ করে নি। তা ছাড়াও নজুমিয়ার সংসার থেকে বিতাড়িত অসহায় নারী আমিনাকে তখন আসগর মিয়া বিয়ে না করলেও পারত। কিন্তু সে আমিনাকে আত্মহত্যা থেকে ফিরিয়ে এনে সংসার জীবনে ঠাঁই করে দিয়েছে তার স্ত্রী করে। এ তার চরিত্রের মানবিক গুণেরই পরিচায়ক।

বসির 'নদী ও নারী' উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। অপ্রধান চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও সে পালন করেছে তাৎপর্যপূর্ণ এক ভূমিকা। তার উৎকণ্ঠিত বিবেকের তাড়না উপন্যাসের পটভূমিতে লাভ করেছে জীবনধর্মিতা। বসির পাকা মাঝি বলে নজুমিয়ার সঙ্গে থাকে। তাকে নিয়েই নজুমিয়া পদ্মার ওপারে জমি দখল করতে যায়। নদীর ওপারে বিলি করা জমির খাজনা তুলতেও নজুমিয়া বসিরের সাহায্য নেয়। বসির তার প্রায় নিত্যসঙ্গী। বসির মাঝি হলেও সে মানবিক গুণাবলিতে উন্নত একজন মানুষ। পদ্মা পাড়ি দিতে গিয়ে নৌকাডুবিতে নৌকোর যারা মারা যায়, তাদের মধ্যে নজুমিয়াও ছিল। নজুমিয়ার মৃত্যুতে তার মা আয়েষা গভীরভাবে মর্মাহত, এ দুঃখে সে-ও যখন

---

৮. হুমায়ুন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

মারা যায়, তখন এ সংসারের হাল ধরার একমাত্র অবলম্বন ছিল বসির। নাবালক মালেকের সম্পত্তি ও তার জীবন রক্ষার কঠিন দায়িত্ব বসিরই মাথায় তুলে নেয়। সে আন্তরিকভাবে নজুমিয়ার বিষয় সম্পত্তি নিয়ে অনুকূল চিন্তাই করতো। কি ভাবে জমিদারের পাওনা মিটিয়ে জমি বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়, এই হয়ে দাঁড়ায় তার উদ্বেগের বিষয়। প্রজাদের কাছে খাজনার কথা বলেও লাভ হয় না। সুযোগ পেয়ে তারা উল্টো খাজনা দেবে না বলে জানিয়ে হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত আয়েষার গহনাও বিক্রি করতে হয়েছে তাকে। জমিদারের খাজনার টাকা সংগ্রহ করার অন্য কোন উপায় ছিল না। মালেকের সম্পত্তি রক্ষা করার প্রচেষ্টায় হিমশিম খেতে থাকে বসির। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই আসগর মিয়ার সঙ্গে কথা বলে তাকেই মালেকের ও তার সম্পত্তির দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করে বসে। নিজের দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান বসির মালেকের সম্পত্তি রক্ষার জন্যে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই বিকল্প প্রস্তাব দেয়। এক সময় সে জমিদারের নায়েবের কাছে নাবালক মালেকের বকেয়া খাজনার ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে গিয়েছিল। কিন্তু নায়েব তার কোন কথাই শোনে নি। সে বরং জমির খাজনা মিটিয়ে নিজের নামে জমির বন্দোবস্ত করিয়ে নিতে বলেছে। এত বড় সুযোগও গ্রহণ করে নি বসির। শেষাবধি গ্রামের সব মানুষকে নিয়ে বৈঠক করে আসগর মিয়া মালেকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে মালেক, মালেকের-সম্পত্তি ও কাজের মেয়ে কুলসুম স্বাভাবিক নিরাপত্তা পায়। বসিরের পরকল্যাণচিন্তা ও বুদ্ধির ফলে রক্ষা পায় মালেক। পাকা মাঝি বৃদ্ধ বসির একদিন খাজনা তুলতে নদীর ওপারে গিয়েছিল। কিন্তু সে আর ফিরে আসে নি। সম্ভবত ঝড়-তুফানের কবলে পড়ে নৌকাডুবিতে তার মৃত্যু হয়। সংগ্রামী সচ্চরিত্র ও মানববন্ধু বসির যেন নিজ তাগিদেই মালেক ও কুলসুমকে পৌছে দিয়েছে একটি নিশ্চিত জীবন ব্যবস্থার মধ্যে।

মাতৃহীন মালেক দাদীর স্নেহ-যত্নে বেড়ে উঠছিল। কৈশোর থেকেই সে দুরন্ত, চঞ্চল প্রকৃতির। কিশোর বয়সেই সে কুমির শিকার করে নিজের বীরত্ব জাহির করেছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তার বাবা ও দাদীর মৃত্যু ঘটে। তখন মালেকের জীবনে নেমে আসতে পারত দুঃখ-দুর্দশা। কিন্তু, কুলসুমের মাতৃস্নেহে, বসিরের মমতায় পিতা-মাতা-দাদীকে হারিয়েও মালেক সুখেই ছিল। দুরন্ত মালেক কুল গাছে চড়ে কুল ছুঁড়ে মারে কুলসুমের দিকে ; পাড়ার ছেলে সাবু ও অন্যান্যদের সঙ্গে সারাদিন খেলা করে বেড়ায়। খেলার সঙ্গীদের মধ্যে আসগর মিয়ার মেয়ে নূরুর সঙ্গে তার জন্মায় সখ্য। মালেকের সব দায়িত্ব নিয়েছে আসগর মিয়া। ফলে, মালেক ছোটবেলা থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

আসগর মিয়ার সংসারে নিয়েছে ঠাঁই। এখানে সে আসগর ও তার স্ত্রী আমিনার কাছে মাতৃ-পিতৃস্নেহে অভিষিক্ত হয়েছে। নূরু তাদের একমাত্র মেয়ে। তার সঙ্গে আগে থেকেই সুসম্পর্ক মালেকের। সে দিনে দিনে আসগর মিয়ার কাজ-কর্মের সহযোগী হয়ে ওঠে। প্রতিদিন জমি থেকে বাড়ি ফেরার পথে নূরুর জন্যে সে নানা ধরনের খেলনা তৈরি করে নিয়ে আসে। রহিমপুরের বসতি বন্যায় ভেসে যাওয়ার পর আসগর মিয়ার সঙ্গে সে বসবাস করতে থাকে বিয়ানচরে। বিয়ানচরে এসেই মালেকের জীবনে ঘটে নানা পরিবর্তন। আসগর মিয়ার সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনাবাদী জমিতে ফসল ফলিয়ে গড়ে তুলেছে তারা নতুন সুখের সংসার। বিয়ানচরে আসগর মিয়া মালেকের ওপর সব দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছে। মালেকও তার দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান। সে আগামী দিনের সুখস্বপ্নে বিভোর, নূরুর সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক তাকে করেছে স্বাপ্নিক। সে ধানের ছড়ায় 'সাতনড়া' হার গেঁথে গোপনে এসে নূরুর গলায় পরিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের সুখের সৌধে হঠাৎ নেমে আসে দুঃখের কালো ছায়া। নদীতে নৌকা নিয়ে বের হয়ে মালেক মংপো ডাকাতের কবলে পড়ে। সেখানেও সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে কথা বলেছে ডাকাতদের সঙ্গে। বিয়ানচরে তার আপনজনদের রক্ষার জন্য সে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে ডাকাতদের। তাদের কবল থেকে জেলেদের সহায়তায় রক্ষা পায় মালেক। বিয়ানচর থেকে হারিয়ে যাওয়া, এবং মালেকের বিয়ানচরে ফিরে আসার ঘটনা সে শোনায় উপস্থিত সবাইকে। এ উপলক্ষে আসগর মিয়া গ্রামবাসীকে দাওয়াত করে খাওয়ায়, এমন কি জেলেদেরও এ অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করে। তাদের প্রেম সম্পর্কে আসগর মিয়ার বিরূপ অবস্থানের কথা মালেক জানতে পারে আজিজের কাছ থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। মালেক পরে আসগর মিয়ার কাছ থেকে জ্ঞাত হয় সকল ঘটনা। তার পর এক সময় সে চলে যায় অন্য কোথাও। মালেক ও নূরু একই মায়ের সন্তান, ফলে তাদের সম্পর্ক ভাই-বোনের। সে কারণে তাদের এতদিনের লালিত স্বপ্ন ভুল প্রমাণিত হলো, মালেক মেনে নেয় এই অনিবার্য অবস্থা। মালেকের চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণেই পুরো ব্যাপারটি হতে পারে নি জীবনবিনাশী। সে স্বাপ্নিক, কিন্তু বাস্তববাদী শেষ পরিচয়ে। সে কারণেই সে বলেছে :

> আমিও নদীর মানুষ—বালুচরে ঘর আমিও বাঁধব। কিন্তু তার জন্যও সময় চাই। পুরোনো পাতা যতক্ষণ না ঝরে, ততক্ষণ নতুন পাতা দেখা দেয় না।[৯]

---

৯. ঐ, পৃ. ২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

আয়েষা 'নদী ও নারী' ঔপন্যাসের উল্লেখযোগ্য একটি নারী চরিত্র। নজুমিয়ার মা সে। একমাত্র সন্তান নজুমিয়ার সুখই তার কাম্য। আয়েষা ছেলের কাজ-কর্মের তদারকি করত। তার পরামর্শেই চলত নজুমিয়া। নজুমিয়া মাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, মায়ের অবাধ্য হতো না সে। বাড়ির অন্দর মহলে আয়েষা, কুলসুম ও গোলাপীকে নিয়ে চলতো তার গার্হস্থ্য জীবন। কাজ-কর্ম, চলনে-বলনে আয়েষার পরিচ্ছন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যযোগ্য। বৈষয়িক বিষয়ে সে সদাসতর্ক। মা হারা নাতি মালেককে মায়ের আদরে সে মানুষ করেছে। নজুমিয়ার জীবনে ভালো-মন্দের ব্যাপারে আয়েষা এক চালিকা শক্তি। কিন্তু নজুমিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে সে যেন হারিয়ে ফেলে সকল শক্তি। শেষ পর্যন্ত পুত্র শোকে দগ্ধ হয়ে অল্প দিনের মধ্যে মারা যায় আয়েষাও। মৃত্যুর আগের দিনগুলোতে পাগল প্রায় হয়ে নদীর ধারে গিয়ে সে বসে থাকত, ভাবতো নদী পথেই তার ছেলে নজুমিয়া ফিরে আসবে। তারপর এক দিন গভীর রাতে নদীর ধারেই মূর্ছা যায় আয়েষা। তার জ্ঞান আর ফিরে আসে নি। সন্তান-বৎসল আয়েষা সন্তানের মঙ্গল চিন্তায় সব সময় থাকতো উদ্বিগ্ন। আর দশটি মুসলমান নারীর মতো পীর ফকিরের ওপরও তার ছিল গভীর আস্থা। অবশেষে আয়েষাও যখন মারা গেল, তখন নজুমিয়ার সংসার পড়ে যায় ধ্বংসের মুখে। নিরক্ষর একজন নারীও আপন যোগ্যতা ও বুদ্ধি বলে যে সংসারে পালন করতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তার প্রমাণ মেলে আয়েষা চরিত্রের মধ্যে। উপন্যাসে আমিনার উপস্থিতি আসগর মিয়ার স্ত্রী হিসেবে। কাহিনীর শেষ দিকে আসগরের মুখে তার অতীত দিনের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, আমিনার প্রথম স্বামী ছিল নজুমিয়া। আমিনা সুন্দরী ও গুণবতী। নজুমিয়া আমিনার রূপে মোহাবিষ্ট হয়ে অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে আসগর-আমিনার প্রেমের সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করে। এখানে রূপজ কামনাই প্রাধান্য পায়, কোন নৈতিক বাধা নয়। আসগর ও আমিনার ভালোবাসার কথা আমিনার মা-ও জানত, কিন্তু সে নজুমিয়ার অর্থ সম্পদের কথা ভেবে তার সঙ্গেই আমিনার বিয়েতে মত দেয়। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র আত্মীয় আসগর মিয়ার ভালোবাসা মূল্য পায় নি আমিনার মায়ের কাছে। নজুমিয়ার ষড়যন্ত্রে শেষ পর্যন্ত জেলখানায় ঠাঁই হয়েছে আসগরের। নজুমিয়া অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন সুখের মুখ দেখে নি। সে পূর্বাপর সন্দেহ করতো আমিনাকে এবং সেই সন্দেহ-বিষে জর্জরিত হয়েই সে ছেলে মালেককে রেখে এক সময় বিতাড়িত করে আমিনকে। অসহায় আমিনা সে সময় আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাকে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনে আসগর মিয়া;

Dhaka University Institutional Repository

দরদ। নজুমিয়ার সংসারে সে রেখে এসেছিল তার পুত্র সন্তান মালেককে। আসগর মিয়ার ঔরসে জন্ম হয় নূরুর। নজুমিয়া ও আয়েষার মৃত্যুতে মালেকের দেখাশোনার ভার এক পর্যায়ে আমিনার ওপরই বর্তায়। সে আপন সন্তানকে কাছে পেয়ে স্নেহ-মমতা দিয়ে তাকে লালন পালন করেছে। কুলসুমেরও দরদী সে। আসগর মিয়াকে বলে বিধবা কুলসুমের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে সে। কুলসুম প্রথম দিকে বিয়েতে অসম্মত ছিল ; তাই তাকে আমিনা বুঝিয়ে বলেছে :

> বিয়েতে মত দে। আল্লার রহমে তোর নিজের কোলে ছেলে আসবে, তখন দেখবি যে আজকের এ আপত্তির কথা মনে করে হাসবি।[১০]

মাতৃহৃদয়ের গভীর দুঃখ উপলব্ধি করে আমিনা কুলসুমকে প্রেরণা যুগিয়েছে বিয়েতে। স্বপ্ন দেখিয়েছে সুখের, স্বামী-সংসারের। প্রেমময়ী এই নারী আমিনা উপন্যাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। কুলসুম ও গোলাপী নজুমিয়ার মা আয়েষার বিশ্বাসী সহকর্মী । কাজে-কর্মে দুজনই অভিজ্ঞ। সে কারণে, তারা ছিলো আয়েষার পছন্দসই। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের তাড়া করলো নজুমিয়ার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। নজুমিয়া ও আয়েষার মৃত্যুর পর বসিরের অভিভাবকত্বে কিছুদিন সংসার চললেও শেষ পর্যন্ত সংকট দেখা দিলো। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গোলাপী চলে যেতে বাধ্য হলো তার এক সম্পর্কীয় ভাইয়ের কাছে। কুলসুম গেলো মালেকের সঙ্গে আসগর মিয়ার বাড়ি। যৌবনে বিধবা হলেও কুলসুমের স্বামী সন্তান লাভের প্রতি আকর্ষণ অব্যাহত ছিল। সন্তানের মতো মালেককে লালন-পালনের মধ্যে তার সেই আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ মেলে। বিধবা হলেও কুলসুমের চলনে-বলনে শালীনতা বজায় ছিল সবসময়। অবশেষে আসগর মিয়ার মাধ্যমে স্বামী-সন্তান পেয়েছিল কুলসুম ; কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা তা কেড়ে নেয়। মৃত সন্তান জন্মদান কালে কুলসুমের মৃত্যু ঘটে।

উপন্যাসে আজিজ আসগর মিয়ার অনুগত চাষী। তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিয়ের মাধ্যমে উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে সে । কুলসুমের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কারণে উপন্যাসে আজিজের উপস্থাপনা তার চাষী জীবনের চেয়ে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ এ বিয়ের মাধ্যমে কুলসুমের সামাজিক নিরাপত্তা তৈরি হয়েছে। রমজান ও ইদ্রিস নজুমিয়ার একনিষ্ঠ কর্মচারী। প্রভুভক্তি তাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নজুমিয়ার সঙ্গে পদ্মা পাড়ি দিতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে এই দুই বিশ্বাসী কর্মচারীর মৃত্যু হয়। গলু পাগলা, হামদু চাচা, মতির মা, কিশোর সাবু প্রত্যেকের আগমনই উপন্যাসের ঘটনা প্রবহমানতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ

---

১০. হুমায়ুন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যে বিকাশ লাভ করেছে। গলু পাগলা কোমর থেকে পড়ে যাওয়া টাকা খোঁজে পথে পথে। বসির সে সন্ধ্যায় আলো ও লাঠি হাতে মালেককে খুঁজতে বের হয়। পথে গলু পাগলাকে দেখে তার সঙ্গে বসির কথা বলে এবং মালেককে খোঁজ করার পরামর্শ চায়। সময়োপযোগী করে হামদু চাচা, মতির মাকে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। হাটের কোণে বটগাছ তলায় উপস্থিত জনতার নিরবতা ভেঙে ফকিরের সঙ্গে মতির মায়ের কথা বলা, কিশোর সাবুর দুরন্তপণা, মালেকের সঙ্গে সাবুর দ্বন্দ্ব প্রভৃতি চরিত্র বিন্যাসে এনেছে বাস্তব সাবলীলতা।

উপন্যাসের চরিত্রসমূহের যাপিত জীবনের বাইরে থেকে পদ্মাই যেন নিয়ন্ত্রণ করেছে নজুমিয়া-আসগর-মালেকের জীবন। প্রকৃতি যেন তার অপরিমেয় শক্তিতে তাচ্ছিল্যের খেলা খেলেছে নদী তীরবর্তী মানুষগুলোর জীবন নিয়ে। ঢেউ এর মতো উত্থান-পতন প্রজন্মের পর প্রজন্মের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। যখনই তারা পদ্মার কোন চরে ঘর বেঁধেছে, জমি আবাদ করে চাষযোগ্য করে তুলেছে, লোকালয় স্থাপন করে নির্মাণ করেছে জীবনের ভিত্তি, তখনই পদ্মা তার প্রমত্ততা দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে সকল সম্ভাবনা। কিন্তু মানুষ তো পরাভূত হওয়ার নয়। তাই বিপর্যস্ত মানুষগুলো আবারও ঘর তোলে ; জমি চাষ করে, রচনা করে সংসার। জীবনের মায়া বড় কঠিন মায়া। সে মায়া ছাড়তে পারে না তারা কোন অবস্থাতেই। গ্রিক ট্রাজেডির নায়কের মতোই তারা তাই সংগ্রাম করে অনিবার্যের বিরুদ্ধে। পদ্মার তীরে জীবন-যাপন করতে গিয়ে লেখক ভূমিহীনদের জীবনের সমস্যার কথা জেনেছেন আন্তরিকভাবে। সে কারণেই তিনি হতে পেরেছেন প্রায় নিখুঁত এক চিত্রকর। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের একটি সার্থক ছবি তুলে ধরেছেন কবির এই উপন্যাসে। পদ্মানদীর পরিবেশে উপন্যাসটি রচিত। মুসলমান সমাজের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আলোচিত হয়েছে সফলতার সাথে।[১১]

পদ্মা তীরবর্তী এই মুসলমানরা মূলত ধর্মীয় জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ। উপন্যাসে বিধৃত সবগুলো চরিত্রেই এ সত্য প্রমাণিত। তাদের নীতিবোধে তাড়িত জীবনাচরণেই এটি লক্ষ্যযোগ্য। ফকির ও হেকিমের আচরণ কুটিলতায় ঘেরা। রহিমপুরের ধূলদীর হাটে তারাই কেবল কিছুটা শিক্ষিত ; কিন্তু তারা পরে আছে ভদ্রতার মুখোশ। তা ছাড়া উপন্যাসের অন্য সব চরিত্র মানবিক গুণাবলিতে, নীতিবোধে ঋদ্ধ।

---

১১. শাহরিয়ার ইকবাল, হুমায়ুন কবির, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

'নদী ও নারী' উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় ঔপন্যাসিক যে পরিবেশ ও পটভূমি ব্যবহার করেছেন তা বাস্তবসম্মত। পদ্মানদীর বুকে জেগে ওঠা চরে মানুষ বসতি গড়ে তোলে। মানুষের সেই বসতি আবার পদ্মার প্রমত্ততায় ভেঙে যায়, ভেসে যায় মানুষ, পশুপ্রাণী, গাছ-পালা সবই। এ ভাবে ভাঙা-গড়ার অবিরাম বিপর্যয়ে যেন গাঁথা 'নদী ও নারী' উপন্যাস। উত্থান-পতননির্ভর ঢেউয়ের মতোই জেগে ওঠে ও মিলিয়ে যায় যে সব চর সেখানেই জীবন গড়ে তোলে কিছু মানুষ। সেই মানুষের জীবনের গল্প বলতেই যেন প্রয়াসী হয়েছেন হুমায়ুন কবির। এবং সেই সূত্রে পদ্মাতীরবর্তী কিছু মানুষের জীবন ও সংগ্রাম উপস্থাপিত হয়েছে এই উপন্যাসে। সেই উপস্থাপন অর্থবহ করার জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি বাস্তবসম্মত পটভূমি রচনা। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে হুমায়ুন কবির সার্থকতা স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছেন। নজুমিয়া পদ্মার বুকে জেগে ওঠা চর আবাদ করছে ; সর্দার রহিম বখসের প্রেরণায় জঙ্গল সাফ করে, গর্ত ভরাট করে জমি চাষযোগ্য করে তুলেছে। পদ্মার প্রমত্ততার সঙ্গে যেন একাকার হয়ে গেছে তার অমানুষিক পরিশ্রম। বলা বাহুল্য, তার পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নি। পদ্মার সঙ্গে নজুমিয়াদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> পদ্মা যেন ঘরের বউ। কতদিন কত সন্ধ্যা এক সাথে কেটেছে, কত ঝড় ঝাপটা বিপদ-আপদ একসঙ্গে সয়ে আজ মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে।[১২]

জীবনের শেষ বেলায় এসে এই পদ্মার তীরে দাঁড়িয়েই নজুমিয়া ভেবেছে তার ফেলে আসা অতীত দিনের কথা। পদ্মা তীরবর্তী প্রতিটি মানুষেরই প্রতীক যেন সে। যে কোন সময়ই পদ্মা ভেঙে দিতে পারে ঘরবাড়ি, গোয়াল ঘর, রান্নাঘর। তবু, আতঙ্ককে অঙ্গীকার করে ঘরবাড়ি না তুলে চলা যায় না। 'নদী ও নারী' তে এক জায়গায় আছে :

> বড়নদীর বাঁকের মুখ থেকে বেরিয়েছে উজানডাঙ্গার খাল। সেই খালের কোলে নদীকে আঁকড়ে ধরে নজুমিয়ার দহলিজ।[১৩]

রহিমপুরের মানুষের জন্যে ধূলদীর হাটই একমাত্র ব্যবসা কেন্দ্র। কিন্তু ঔপন্যাসিক ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণে যান নি। প্রধানত একটি সরল কাহিনী, একটি সরল পরিবেশ-পটভূমি নির্মাণই ছিল তাঁর লক্ষ্য। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে মৎস্য শিকার ও ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের আচরণ ও চরিত্র সংক্ষেপে হলেও অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সুচারুরূপে উপস্থাপিত করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেক সময়ে চুম্বকে বলেছেন অনেক কথা। সে ধরনের ব্যাপার 'নদী ও নারী'তে খুব একটা দেখা যায় না। গ্রাম্য মানুষদের ঠকানোর জন্যে, শোষণের জন্যে বহু কিসিমের লোক

---

১২. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
১৩. ঐ, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

থাকে সদা তৎপর, তাদের ফসল স্বল্প মূল্যে কিনে নিয়ে যায় মধ্যস্বত্বভোগীরা। তাদের মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে ফেলে টাউট-উকিল-মোক্তার। সরল গ্রামীণ পরিবেশেও তারা অনেক সময় যাপন করতে পারে না সরল জীবন। জোতদার–মহাজনদের লাঠিয়াল বাহিনীর শিকার হয়ে অনেকে হয় নিহত-আহত। তাদের ফসল লুণ্ঠিত হয়, নির্যাতিত হয় ঝি-বউরা। কাহিনীতে উল্লেখিত নদীর ওপারের একটি চর দখল করতে এবং সেখানে বসবাসরত চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে গিয়েছে নজুমিয়া, এর উল্লেখ করা হয়েছে নদী ও নারীতে। সেখানে চাষীরা খাজনা দিতে অপারগতা বা অস্বীকৃতি জানালেও ঘটে নি কোন রক্তপাত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা। অনুরূপ চর দখল নিয়েও ঝগড়া-ফ্যাসাদ, রক্তারক্তির কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। অভিজ্ঞ মাঝি বসির তার বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে নজুমিয়াকে চরের জমি দখলে সাহায্য করেছে। বসিরের উক্তি এ রকম :

> পঞ্চায়েত, আমি বুড়ো মানুষ, প্রায় চার কুড়ি বয়স হতে চলল, রাক্ষুসী পদ্মার অনেক খেলা দেখেছি। পশ্চিমের চর টেকে না –বছর দু'বছরে নদীর ধারে কেটে যায়, আর পুবের চর বিশ বছরেও ভাঙে না।[১৪]

পদ্মানদীর তীরবর্তী রহিমপুরে জীবনের শুরুতে গরু কেনার পয়সার অভাবে এক সময় জোয়ালে কাঁধ ঠেকিয়েছে নজুমিয়া ও আসগর মিয়া। দরিদ্র চাষীদের জীবনে অহরহ এটা ঘটে থাকে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে যেমন রয়েছে সামন্ত শ্রেণীর মেজকর্তারা, 'নদী ও নারী'তে তেমন রয়েছে জমিদাররা। সময় মত খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে যে জমিদাররা জমি বাজেয়াপ্ত করে, সেই তাদেরই কাছ থেকে জমি বরাদ্দ নিয়েছে নজুমিয়া। সে গ্রামের পঞ্চায়েত, সকল বিচার-আচারের ভার তার ওপর। তাই ধূলদীর হাটে ফকিরের সঙ্গে তার বিরোধ দানা বাঁধে নি। এই ধূলদীর হাটই সকল কেনা-বেচার প্রাণ কেন্দ্র। এখানে হেকিম-ফকিরেরও রয়েছে শক্ত ঘাঁটি। লেবাসধারী এই সব হেকিম-ফকিরদের অনেক সময় উঁচু সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয় না ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে দু জন ব্যবসায়ী হেকিম ও ফকির রয়েছে ধূলদীর হাটের দু প্রান্তে, তারা তাই নয় অনুল্লেখ্য। তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি নগণ্য, কিন্তু তারা চাতুর্যের সঙ্গে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সুযোগ বুঝে মানুষের সঙ্গে নানা বাটপাড়ি করতেও তারা পিছ পা হয় না। হেকিম ও ফকির উভয়েই গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্র মানুষদের চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় ঘায়েল করে তাদের কাছে নানা তাবিজ ও ঔষধ বিক্রি করে এবং এর মাধ্যমে হাতিয়ে নেয় অনেক অর্থ। এই হেকিম-ফকিররা গ্রামীণ জীবনের যেন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নদী তীরবর্তী জীবনের সঙ্গে জলদস্যুতার একটি সম্পর্ক আছে। মংপো ডাকাত মালেককে যে ধরে নিয়ে গেল, এ ঘটনাটি সেদিক থেকে বাস্তবধর্মী।

১৪. হুমায়ুন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

মালেকের বন্দী জীবন অনেক প্রলম্বিত এবং তা শেষ হয়েছে নদীতে। জলদস্যুদের হাত থেকে মুক্তি প্রসঙ্গে উপন্যাসে এসেছে জেলে-মাঝিদের কথা। জেলেরা সব সময়ই নদীতে ঝড়-তুফানে বিপদগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। উপন্যাসে মাঝিদের ভূমিকা তাই বাস্তবসম্মত। অনাবৃষ্টির কারণে ফসলহীন গ্রামবাসীদের জীবনে যে দুর্ভোগ নেমে এসেছিল, তা উপন্যাসের পটভূমিকে করেছে বাস্তবধর্মী। ফসলহীন নিরুপায় অনাহারী মানুষেরা শেষ পর্যন্ত যুবতী কন্যাও বিক্রি করে জীবন ধারণের চেষ্টা করেছে। নিরুপায় নিষ্করুণ পরিস্থিতিতে কি ভাবে মানুষ হারায় তার মনুষ্যত্ব সেটাই মূর্ত হয়ে উঠেছে এই ঘটনার মাধ্যমে। এ বিষয়ে উপন্যাসের এক জায়গায় বলা হয়েছে :

> বাসন কোসন বেচতে চায়, ঘরবাড়ি বেচতে চায়, গাই বলদ বেচতে চায়, জরু মেয়ে বেচতেও রাজী। বেচতে চায় সবাই কিন্তু কিনবে কে ? আসগর মিয়ার কাছে দলে দলে লোক আসে, মিনতি করে বলে, কিছু চাল দাও পঞ্চায়েৎ।[১৫]

অবশেষে প্রতীক্ষার বৃষ্টি যখন এলো তখন তা হলো বন্যার উৎস এবং ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঘরবাড়ি। তখন পরিবারসহ আসগর মিয়াকে নৌকোয় ভেসে বেড়াতে হলো আশ্রয়ের সন্ধানে। নতুন আশ্রয়ে বিয়ানচরে আবার সে গড়ে তোলে নতুন সংসার। এভাবে একের পর এক ভাঙন ও গড়নের চিত্র আছে এ উপন্যাস জুড়ে। সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা ঘটে মালেক ও নূরুর জীবনে। তাদের প্রেম সম্পর্ক দারুণ ধাক্কা খায় তাদেরই জন্মের উৎসের কারণে। নদীর জোয়ার-ভাটার মতোই, ঢেউয়ের মতো উত্থান-পতনের মতোই যে মানব জীবন তারই কাহিনী বিধৃত এখানে। উপন্যাস শেষে মালেক মনের দুঃখে অজানার পথে চলে গেছে। তখনও সে ভাবতে পারে নি যে, কোন নগর বা শহরে গিয়ে সে তার জীবন গড়বে। সে ভাবে অন্য কোন নতুন চরের কথা, যেখানে সে গড়ে তুলবে তার অনাগত আগামী। উপন্যাসে আছে সে কথাই :

> আমিও নদীর মানুষ–বালুচরে ঘর আমিও বাঁধব। কিন্তু তার জন্যও সময় চাই। পুরোনো পাতা যতক্ষণ না ঝরে, ততক্ষণ নতুন পাতা দেখা দেয় না। ... একদিন ফিরে আসব।[১৬]

'নদী ও নারী' উপন্যাসটির বর্ণনা ও সংলাপ উভয় অংশেই রয়েছে চলিত ভাষার ব্যবহার। বাংলা উপন্যাসে বহু খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন ভ্রুক্ষেপহীন। অনেক সময় চরিত্র অনুযায়ী সাধু, চলিত বা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার অনিবার্য হতে পারে। সেটাই

---

১৫. হুমায়ুন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬
১৬. ঐ, পৃ. ২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতা। 'পদ্মানদীর মাঝি' বা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস দুটোর মতো 'নদী ও নারী' উপন্যাসে চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের অনুকূলে ভাষা সব সময়ই যে ব্যবহার করা হয়েছে এমনটি বলা যায় না। 'নদী ও নারী' উপন্যাসে একটানা চলিত ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছে। ঘটনার ধারাবাহিকতা, নয়তো কোন চরিত্রের দুঃখ-আবেগ-উচ্ছ্বাস কিংবা কোন দৃশ্যের বর্ণনায়ও লেখক চলিতরীতি ছাড়া সাধু বা আঞ্চলিক ভাষারীতি ব্যবহার করেন নি। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে তাই কিছুটা বাস্তবতার ব্যত্যয় ঘটেছে বলা চলে। উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার চোখে পড়ে না। সে কারণে, বলা যায় 'নদী ও নারী' উপন্যাসটি চলিত ভাষারীতিতে রচিত। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তিনি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে বিশুদ্ধ চলিত রীতিতেই পুরো গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সাধু-চলিতের কোন মিশ্রন এখানে চোখে পড়ে না। উপন্যাসে ব্যবহৃত চলতি ভাষার একটি নমুনা এখানে উপস্থাপিত করা চলে :

> সারা রাত ধরে বৃষ্টি নামলো, শুকনো খাল বিল সব জলে ভরে উঠলো, রাস্তা ঘাট দিয়ে জলের ধারা চলতে শুরু করলো। ধূলি বালি মিলিয়ে গেল, গাছের শুকনো ডালে নতুন সবুজের রেখা দেখা দিলো। গ্রীষ্মের তাপ মিটে গিয়ে চারদিকে সজল স্নিগ্ধতা নামলো। ... নদী, ঘাট, বাট, গাঁয়ের সীমানা সবকিছু জলে একাকার হয়ে গেল। কে জানে জলের তোড়ে গ্রামের ঘরবাড়ীও বুঝি সব ভেসে যায়।[১৭]

অন্যান্য বাংলা উপন্যাসের মতো 'নদী ও নারী'তে তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঔপনাসিক দুর্বোধ্য তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন নি। তাঁর আমলে সরল, সহজবোধ্য, সাবলীল ভাষা ব্যবহারের একটি প্রবণতা ছিল। লেখক নিজে উদারনৈতিক রাজনীতির কারণে ছিলেন গণমুখী। উপন্যাসটির প্রতিটি খণ্ডের একটি করে পরিচ্ছেদের একটি করে পৃষ্ঠার শব্দাবলি পরীক্ষা করে দেখা যায় প্রতিটি পৃষ্ঠার রয়েছে গড়ে দেড় শ থেকে দু শর মতো শব্দ। কোন পৃষ্ঠাতেই তিনি পনের বিশটির বেশি তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন নি। সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো থেকে তৎসম বা তৎসমজাত কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করছি :

প্রথম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ২৪ শিকড়, নদী, হাট, অন্ধকার, পথ, অবিশ্বাস।

দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১৪৭ বাড়ি, চিৎকার, চিন্তা, লজ্জা, প্রত্যেক, উৎকণ্ঠা।

তৃতীয় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ২১৩ সন্ধ্যা, দুঃখ, শ্রদ্ধা, প্রশান্ত, বয়স, কর্ত্তা, ইত্যাদি।

দেখা যায় যে, হুমায়ুন কবিরের ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলো বহুল ব্যবহৃত। সে কারণেই পাঠকের কাছে তা সহজবোধ্য হয়েছে। তা ছাড়াও তাঁর ব্যবহৃত তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ সম্ভারও সহজ সরল এবং পাঠকের জন্যে সহজবোধ্য। তাই তাঁর রচনা পাঠকের সমাদর লাভ করেছে।

---

১৭. ঐ, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

'নদী ও নারী' উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার উপস্থিতি নেই। এ উপন্যাসে ছড়ার আকারে চারটি ছোট গীত রয়েছে যা বিয়ানচরের মানুষের লোকজ ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। সেগুলো হলো :

ক. এতটুকু পানি
ঝপর ঝানি।[১৮]

খ. এ গাঙে কুমীর নাই
ঝুপুর ঝাপুর নেয়ে যাই।[১৯]

গ. কচুর পাতায় হলদি,
বৃষ্টি নাম জলদি।[২০]

ঘ. কচুর পাতায় করমচা,
আয় বৃষ্টি নেমে যা।'[২১]

'নদী ও নারী' উপন্যাসের জনগোষ্ঠী এক চর থেকে অন্য এক চরে গিয়ে বার বার আস্তানা তৈরি করেছে। সেগুলোর সঙ্গে অন্য কোন লোকালয়ের খুব একটা সম্পর্ক ছিল না। ফলে বাইরের কোন জনগোষ্ঠীর ভাষাগত প্রভাব খুব একটা পড়ে নি তাদের ওপর। তারা তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা, রপ্তকৃত ভাষাই ব্যবহার করেছে। তবে সবার মুখে চলিত ভাষার সংলাপ যে বেমানান তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত, রহিমপুর, ধূলদীর হাট ও বিয়ানচরের কোথাও গড়ে ওঠে নি আলাদা কোন ভাষারীতি।

'নদী ও নারী' উপন্যাসে লেখক প্রয়োজন মতো কখনও কখনও অনুপ্রাস, ধন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে, তার পরিমাণ অল্প। এ ধরনের উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক সৃষ্টি করেছেন অর্থময়তা। ঝিরঝির, ধবধবে, কলকল, ঝুপঝাপ, খসখসে ইত্যাদি অনেক ধন্যাত্মক শব্দ উপন্যাসে পাওয়া যায়। দ্বৈতশব্দও বাক্যের অর্থ ও ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাসে মাসে, মাঝে মাঝে, ধীরে ধীরে, দলে দলে, কথায় কথায় ইত্যাদি অনেক দ্বৈতশব্দ রয়েছে উপন্যাসে। 'পালাতে পারলে', 'প্রচণ্ড প্রতাপ', 'আহ্লাদে আটখানা',—এ ধরনের আদ্যক্ষরের মিলজনিত অনুপ্রাসের ব্যবহারও রয়েছে। এ উপন্যাসে উপমা চিত্রকল্পও ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে ভাষা হয়েছে ঐশ্বর্যময়। উপমা-চিত্রকল্পের কয়েকটি উদাহরণ এখানে

---

১৮. হুমায়ুন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮
১৯. ঐ, পৃ. ১২১
২০. ঐ, পৃ. ১৮৮
২১. ঐ, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত করা হলো :

ক. দুরন্ত মেয়েটির মত নদী চঞ্চলা।[২২]

খ. হাড়ির মধ্যে বন্ধ সাপের মতন আপন মনে ফুঁসতে থাকে।[২৩]

গ. তার মুখ জমাট মেঘের মতন গম্ভীর। [২৪]

ঘ. কথায় কথায় তার তীক্ষ্ণ হাসি বাঁশীর মত বেজে উঠত।[২৫]

'নদী ও নারী' উপন্যাসটির গদ্য শৈলী চলতি ভাষা রীতির মাধ্যমে তৎসম-তদ্ভব-দেশী ও বিদেশী শব্দে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া ধন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, উপমা প্রভৃতির যথার্থ ব্যবহারও এর গদ্য শৈলীকে দিয়েছে শিল্পগুণ। তবে উপন্যাসের তিনখণ্ডের পরিধি লেখক ইচ্ছা করলে সংক্ষিপ্ত করতে পারতেন। দুবার দাওয়াত খাওয়ানোর বর্ণনা, মিলাদ অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা, মালেকের সম্পত্তি ও তার দায়িত্ব আসগর মিয়ার ওপর অর্পণ প্রভৃতি অংশ কিছুটা সংক্ষিপ্ত হতে পারতো। এ ছাড়া মংপো ডাকাত ও মালেক সম্পর্কিত বর্ণনাটি কিছুটা শিথিল মনে হয়। বর্ণনা দীর্ঘায়িত হওয়ায় এর মধ্যে অতিরঞ্জন যেন অনুপ্রবেশ করেছে। তারপরও এটি যে উল্লেখ্যযোগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই।

'নদী ও নারী' উপন্যাসের অন্তরধর্মে রয়েছে দরিদ্র কৃষকদের অস্তিত্ব রক্ষার পুরুষানুক্রমিক সংগ্রাম। পদ্মা ও প্রকৃতির আশ্রয়ে তাদের জীবন হয়ে ওঠে কখনও স্বপ্নময়, কখনও আবার ঐ পদ্মারই প্রকৃতির বৈরী মেজাজেই ভাঙে তাদের স্বপ্নসাধ। এ ভাঙা-গড়ার মুখোমুখি যেন জীবন সৈনিক নজুমিয়া, আসগর, বসির ও মালেক। আজীবন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে লড়ে যাওয়াই যেন তাদের একমাত্র ব্রত। নিঃস্ব-দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়াস বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর জীবন ভাবনাকে যেন সম্পৃক্ত করেছেন এ কাহিনীর সঙ্গে। তাঁর উদার পরিবারিক পরিমণ্ডল এবং বাইরের জীবন জগতের প্রভাবে তাঁর যে মানস গঠিত হয়েছিল তার পরোক্ষ ছাপ

---

২২. হুমায়ুন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
২৩. ঐ, পৃ. ১৪৭
২৪. ঐ, পৃ. ১২৪
২৫. ঐ, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর রচনায় মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা চলে :

> কবির পরিবারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা কখনও পরনিন্দা করেন না। এ পরিবারের অধিকাংশ সদস্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। সাহিত্য চর্চা, সঙ্গীত চর্চা, রাজনীতি ও সমাজসেবা এদের চারিত্রিক দুর্বলতা।[২৬]

বাবার সরকারি চাকুরির কারণে হুমায়ুন কবিরকে বিভিন্ন স্কুলে লেখাপড়া করতে হয়েছে। তিনি নওগাঁর সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান 'মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটি'র যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন ১৯২০-২১ সময়কালে। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তিনি জড়িয়ে পড়েন প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে। বিলেত থেকে দেশে ফিরে তিনি যোগ দেন অধ্যাপনা ও রাজনীতিতে। সে সময় শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সংস্পর্শে আসেন তিনি। পরবর্তীতে জওহরলাল নেহেরুর পরামর্শে যোগ দেন কংগ্রেসে । এমন রাজনৈতিক নেতাদের উদারনৈতিক জীবন দর্শনের প্রভাব পড়েছিল তাঁর জীবনে। তিনি সব সময় সর্বহারা মানুষের মুক্তির কথা ভাবতেন। পল্লী বাংলার মানুষদের দুঃখ দূর করার চিন্তাও তিনি করতেন। সে সব ভাবনার কিছুটা হলেও যেন প্রতিফলন দেখা যায় 'নদী ও নারী' উপন্যাসে।

হুমায়ুন কবির এ উপন্যাসে গতরসর্বস্ব নজুমিয়ার মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম রূপায়িত করেছেন। নজুমিয়ার প্রতি লেখক সহানুভূতিশীল। সম্ভবত সে কারণেই পদ্মা তীরে তার জীবনের শুরুতে তার সঙ্গে দেখা হয় মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ সর্দার রহিম বখসের সঙ্গে। সে নজুমিয়াকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তারই উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় নজুমিয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করেছে এবং পরিবর্তন করতে পেরেছে নিজের ভাগ্য। সর্বহারা মানুষের প্রতি লেখকের নিঃশর্ত দরদ তাঁর লালিত রাজনৈতিক দর্শনেরই যেন বহিঃপ্রকাশ। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে জানা যায় :

> মুসলিম লীগ পার্টির ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সাথে তাঁর বিরোধ ছিল প্রথম থেকেই।[২৭]

ধর্ম ও রাজনীতিকে তিনি দেখতেন ভিন্ন ভাবে। এক শ্রেণীর স্বার্থলোভী ধর্মব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ডের প্রতি তিনি ছিলেন বিরূপ। তাঁর সে জীবন দর্শনের বাহক হিসেবেই যেন আবির্ভূত নজুমিয়া। সে ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তার মনোভাব ব্যক্ত করতে পিছপা হয় নি।

নজুমিয়া ফকিরকে দাওয়াত করতে গিয়েছে হাটের মধ্যে তার আস্তানায়। সেখানে ফকিরের শিষ্যদের কোরাণ পড়ার পদ্ধতির সমালোচনা করেছে নজুমিয়া। কোরাণ মুখস্ত করা ছাত্ররা অর্থ

---

২৬. শাহরিয়ার ইকবাল, হুমায়ুন কবির, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২১
২৭. ঐ, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

জানার প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু অর্থ না বুঝে পরদেশী ভাষা মুখস্ত করায় জ্ঞানার্জন ব্যাহত হয়। এ যেন ধর্মীয় শিক্ষা লাভের অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয়। ধর্মব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে আগ্রহী নয়; কারণ, তাতে তাদের ব্যবসার ক্ষতি হবে।

লেখকের উদারনৈতিক দৃষ্টির আলো পড়েছে আসগর ও বসিরের চরিত্রেও। গৃহকর্তা নজুমিয়া ও আয়েষার অনুপস্থিতিতে বসির পালন করেছে এক কঠিন দায়িত্ব। অনেক চেষ্টা করেও বসির যখন মালেকের সম্পত্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো, তখন মালেক ও তার সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব পঞ্চায়েত আসগর মিয়াই গ্রহণ করে। সে সময়ে সে নৈতিকতার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে :

> মালেকের স্বত্ব প্রাণপণে দেখব। যদি ইচ্ছা করে জেনেশুনে কোনদিন তার হকের বিরুদ্ধে কাজ করি, তবে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ে।[২৮]

বসির ও আজগর মিয়ার নৈতিকতাবোধের উৎস লেখকের জীবনবোধ। তিনি যে জীবন দর্শন নিয়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর লেখায় তার ছায়াপাত স্বাভাবিক। বসির তার নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই পদ্মার ওপার গিয়ে হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। বোধকরি পদ্মার কোন বিপর্যয় কেড়ে নিয়েছে তার জীবন। নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলির অধিকারী আসগর ও আমিনা আজিজের সঙ্গে কুলসুমের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। যৌবনে নজুমিয়া আসগর মিয়াকে প্রতারিত করেছিল, মামাতো বোন আমিনার সঙ্গে আসগরের প্রেম আছে জেনেও স্থানীয় মাতব্বরদের সাহায্যে আমিনাকে বিয়ে করেছিল সে। এমন কি আসগর মিয়াকে হাজতেও পাঠিয়েছিল নজুমিয়া ও তার লোকেরা। পরবর্তীতে নজুমিয়ার ওপর আসগর মিয়া সে অত্যাচারের প্রতিশোধ সহজেই নিতে পারত। কিন্তু তা সে করে নি। অন্য দিকে আসগর মিয়ার বিতাড়িত স্ত্রী আমিনাকে বিয়ে করে সে এক মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এর মাধ্যমে সে তার প্রথম জীবনের প্রেমের প্রতি প্রমাণ করেছে তার অবিচল আস্থা। মূলত, এ সবই লেখকের জীবনবোধের প্রতীকী প্রকাশ।

---

২৮. হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

জীবনচিত্র : তিতাস একটি নদীর নাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর তীরবর্তী জেলে বা মালোদের জীবনের প্রায় মহাকাব্যিক পটভূমিতে অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) রচনা করেছেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসটি। তিতাস নদীর তীরে বসবাসকারী জেলেগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, আশা, সংগ্রাম, পূজা-পার্বণ, উৎসব, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি আর্থিক সাংস্কৃতিক অবস্থার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এ গ্রন্থে। পার্শ্ববর্তী বিজয় নদী ও তার তীরবর্তী মানুষের জীবনচিত্রও তিনি তাঁর রচনায় উপস্থিত করেছেন। একই সঙ্গে, জলভরা তিতাস নদীর সঙ্গে শুকনো মরা বিজয় নদীর তুলনা করে তার তীরবাসী জেলেদের উৎকণ্ঠা ও দুরবস্থার চিত্রও তিনি এঁকেছেন বাস্তবতাবোধের সঙ্গে। বিজয় নদী সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> একদিক দিয়া জল শুখায়, আর একদিক দিয়া মাছেরা দমবন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নাক জাগাইয়া হাঁপায়। মাছেদের মত জেলেদেরও তখন দম বন্ধ হইতে থাকে। সামনে মহাকালের শুষ্ক এক কঙ্কালের ছায়া দেখিয়া তারা এক সময় হতাশ হইয়া পড়ে।[১]

শীতকালে বিজয় নদীর তীরের মালোরা চাঁদপুরের বড় গাঙে যায় মাছ ধরতে ; না গেলে তাদের জীবন চলে না। উপায়হীন হয়ে তখন তারা বনে-জঙ্গলে, ঝোপ-ঝাড়ে, ডোবা-নালায় মাছ ধরে। এমন দু জন নিত্য অভাবী মালো গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ। তারা ডোবা নালায় মাছ ধরতে গিয়ে ব্যাঙ ছাড়া আর কিছু পায় না। প্রায় পানিহীন বদ্ধ ডোবায় পাওয়া যায় না মাছ । এমন পরিস্থিতিতে অভাব তীব্র ও ভয়াবহ রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় তাদের জীবনে। এ অবস্থার চিত্র দেখা যায় তাদের সংসারের বর্ণনায়। গৌরাঙ্গ মালোর স্ত্রী সম্পর্কে উপন্যাসে বলা আছে :

> গাল বসিয়া, বুক দড়ির মত সরু হইয়া গিয়াছিল। বুকের স্তন দুটি বুকেই বসিয়া গিয়াছিল তার। তারপর একদিন সে মরিয়া গিয়াছিল।[২]

---

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৪
২. ঐ, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

নিত্যানন্দ মালোর সাংসারিক অবস্থাও ভয়াবহ। দুটো ছেলেমেয়ে-সহ তার চার জনের সংসার চলে না। এমন দুর্দিনে মালোরা ভরসা পায় নয়ানপুরের বোধাই মালোর কাছে। সে দীঘি ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করে। মাছ চালান করে অনেক টাকার মালিক হয়েছে বোধাই। বিজয় নদীর তীরবর্তী জেলেদের জীবনের দুর্দশা তিতাস পাড়ের মালোদের খুব একটা স্পর্শ করে না। তারা বরং বিজয় নদী-তীরের মালোদের নিয়ে দুর্ভাবনায় থাকে। বিজয় ও তিতাস নদীর পাড়ে বসবাসকারী মালোদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার চিত্রই শুধু এই উপন্যাসের উপজীব্য নয়, এখানে বিজয় ও তিতাস নদীর তীরবর্তী গ্রাম, গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তথা চাষীদের জীবনচিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। চাষীদের সুখ-দুঃখ এই দুই নদীর দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। নদীর তীরে ফসল ফলিয়ে তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করে। কখনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় এলে, ফসলহানি হলে জীবন হয় বিপর্যস্ত। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> শুধু জেলেদের জীবন নহে, তাহাদের প্রতিবেশী কৃষিজীবীদেরও জীবনযাত্রা ও উভয় শ্রেণীর মধ্যে সহৃদয় সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবও উপন্যাসের সমাজচিত্রটিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। [৩]

এ উপন্যাসে কৃষিজীবীদের উপস্থিতি থাকলেও মূলত মালো সম্প্রদায়ভুক্ত জেলেদের জীবনা-আলেখ্যই এর মূল বিষয়। কেবল মাছ ধরে তা বিক্রি করা অর্থেই জীবন চলে তাদের। কিন্তু 'প্রকৃতি ও মহাজনী শোষণের'[৪] কবলে পড়ে তাদের জীবন হয়ে যায় বিষময়। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বছরের পর বছর পেরিয়ে যায় ; তবু তাদের জীবনে অস্তিবাচক কোন পরিবর্তন ঘটে না। সংগ্রাম ও সাধনার মেলে না কোন মূল্য। তারপরও জেলেরা নদীতে যায় মাছ ধরার আশায়। প্রমত্ততাশূন্য, শান্ত নদী তিতাস। তার বুকে সারা রাত জাল বেয়ে মাছ ধরলেও নেই তেমন কোন বিপদের সম্ভাবনা। সে জন্যেই জেলেদের ঝি-বউরা ঘুমোয় নিরুদ্বেগে। তাদের এই মনোভাব সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন :

> বউরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া শান্ত মনে মাছ-ভরা জাল গুটাইতেছে।[৫]

---

৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬৫
৪. শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ: জীবন, সাহিত্য ও অন্যান্য, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৩
৫. অচিন্ত্য বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

তিতাস নদীর দু পাড়ের মানুষেরা নৌকোয় যাওয়া-আসা করে নানা স্থানে। নতুন বউ নিয়ে বেয়ে যাওয়া নৌকোর ছইয়ের ফাঁক দিয়ে কখনও কখনও অন্য জাতের বামুন কায়েতের বউ-ঝিদের রূপ এক ঝলক দেখেই মালোর ছেলেরা মোহিত হয়ে পড়ে। তারা তখন মনের আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। এ রকম চিত্র দেখা যায় ছমির মিয়া ও তার বউ জমিলার নৌকোয় বাড়ি ফেরার পথে।

তিতাসের দুই তীরেই ফসল ফলে। তীরের জমিতে তারা ধান চাষ করে। ধান কাটা শেষ করে তারা বেগুন ফলায়। আর বালু মাটির স্থানগুলোতে চাষ করে আলু। জোবেদ আলীর ছেলেরা এক বছর আলু চাষ করে লাভ পেয়েছে। জোবেদ আলীর বাড়িতে দু জন কাজের লোক। করমালী ও বন্দালী। জোবেদ আলী তিতাস নদীর তীরের একজন সক্ষম চাষী। সে সব সময় তার চাষাবাদের উন্নয়নের কথা ভাবে। এ বাড়ির কাজের লোক করমালী ও বন্দালী সারাজীবন মানুষের ক্ষেতে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে এসেছে। কিন্তু নিজেদের ভবিষ্যৎ বলতে কিছু ভাবতেও যেন পারে নি তারা। সারা জীবন থেকেছে মরা গরিব। তাদের স্ত্রীরাও কামলা। অন্যের বাড়িতে পাট গোছানো, ধান ভানা, রান্নাবান্না ও সেলাই ফোঁড়ের কাজ করেই দিন কাটে তাদের। কাজ করতে হয় সকাল-সন্ধ্যা, গভীর রাত পর্যন্ত। এর পর আছে নিজেদের ঘরের কাজ। যারা মনে করে বাঙালীরা অলস, কর্ম-বিমুখ, তারা এই শ্রমজীবী নর-নারীর দিবারাত্র পরিশ্রমের কথা হয়তো জানে না, জানলেও তা মনে রাখে না। করমালী, বন্দালী দুজনই বউদের কথা ভাবে। তারা অন্যের বাড়ী কাজ করে খাওয়া-দাওয়া ভালোই পায়। কিন্তু তাদের বউদের সে সৌভাগ্য হয় না সব সময়। রাতে বাড়ি ফিরে কখনও বউদের ঘুম থেকে জাগায় না তারা ; বউদের প্রতি গভীর দরদের কারণেই তাদের এই আচরণ। তাদের দুঃখময় জীবনের ছবিটি আমাদের সামনে আসে এ ভাবে :

> বন্দালী—একদিন তার একখানা হাত আইয়া আমার বুকের উপর পইড়া যায়। হাতখানা হাতে লইয়া দেখি, কি শক্ত! কড়া পড়ছে, পরের বাড়ি ধান বানতে বানতে। [৬]

করমালীর বউ ধান ভানে না, কাঁথা সেলাই করে। সে প্রসঙ্গে করমালী বলে :

> বন্দালী ভাই, তুমি ত গিয়া দেখ, বউ ঘুমাইয়া রইছে। আমি ছিঁড়া খাঁথায় গাও এলাইয়া দিয়া পথের পানে চাইয়া থাকি। সে তখন পরের বাড়ির খাঁথা সেলাই করে, আর সে সুঁইচের ফোঁড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে। [৭]

৬. ঐ, পৃ. ১০
৭. ঐ, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

করমালী ও বন্দালীর জীবনের দুঃখবোধ মানবিক ; তারা তাদের স্ত্রীদের সুখ-শান্তি দিতে ব্যর্থ, এ জন্য তাদের মনে জাগে অনুশোচনা। তারা তিতাস পাড়ের মালোদের সুখী বলে ভাবে। তারা কেবল তিতাসের বুকে মাছ ধরে বিক্রি করে তাদের জীবন চালায়। করমালীদের মত দরিদ্র হলেও মালোরা কিছুটা অনুকূল অবস্থায় কালাতিপাত করে হয়তো। ঐ ধরনের কোন স্বস্তি করমালী ও বন্দালীর জীবনে আসে নি কখনও। মালোদের জীবন চিত্রের পাশাপাশি তিতাস তীরবর্তী চাষী-মজুরের জীবন কাহিনী এ উপন্যাসকে উৎকর্ষমণ্ডিত করেছে।

মাঘমণ্ডপের পূজোর শেষ দিন 'চৌয়ারি' ভাসানো নিয়ে সমস্যায় পড়েছে দিননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তী। মালো পাড়ার মেয়েদের কারও বিয়েই ঠেকে থাকে না। তবু কুমারী মেয়েরা সবাই মাঘ মাসের ত্রিশ দিন এ পূজা করে। এ মাসের শেষ দিন তাদের আনন্দের দিন হলেও বাসন্তীর জন্যে তা কষ্টের ; কারণ তার জন্যে 'চৌয়ারি' বানানোর কেউ নেই। অন্যান্য মেয়ের দাদা-ভাই-বাবা রয়েছে, যারা তাদের সুন্দর করে 'চৌয়ারি' তৈরি করে দেয়। বাসন্তীর কাছে তা অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার। তার বাবার মাছ ধরার জাল ছিঁড়ে গেছে ; সারা দুপুর বসে তাকে সেই জাল ঠিক করতে হবে। জাল বোনার চেয়ে মেয়ের 'চৌয়ারি' তৈরি করা তার কাছে বড় নয়। কারণ, জালের সঙ্গে রয়েছে জীবিকার সম্পর্ক। মাছ ধরে অর্থ উপার্জন করতে না পারলে পারিবারিক বিপর্যয় অনিবার্য। সংসার হবে অচল। তাই, মেয়ের প্রতি স্নেহ-মমতা দেখানোর কোন অবসরই নেই দিননাথ মালোর। এটাই তাদের জীবনের এক নগ্ন সত্য। বাসন্তীর মনোকষ্ট দেখে তার মা কিশোর ও সুবলকে ডেকে 'চৌয়ারি' তৈরি করে দেয়ার কথা বলেছে। 'চৌয়ারি' তারা অত্যন্ত সুন্দর করেই বানিয়েছে এবং উঠোনে বাঘ, হাতি, ঘোড়া এঁকে আলপনাও এঁকে দিয়েছে। 'চৌয়ারি' তৈরি করতে এসে, 'চৌয়ারি' নদীতে ভাসানো পর্যন্ত দুই তরুণ মালো কিশোর ও সুবল সাত বছরের কিশোরী বাসন্তীর অনুরাগের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। 'চৌয়ারি' ভাসানো মালোদের এক ধর্মীয় আচরণ।

সুবল গগন মালোর ছেলে। গগন মালো তার দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে কখনও নৌকো ও জাল তৈরি করতে পারে নি। গগন মালোর ধারণা ছিলো, তার ছেলে সুবল বড় হয়ে জাল ও নৌকো বানাবে। সুবলের মা-ও বলতো সে কথা। সুবল ও কিশোর শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহী। কারণ পারিবারিক অভাব ঘুচাতে নৌকো ও জাল নিয়ে তাদের যেতে হয় মাছ ধরতে। তিতাসের জলে জেলে হিসেবে নাম করলেও মাছ ধরে সাংসারিক অভাব মেটানোর মতো অর্থ তারা সংগ্রহ করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে না। ফলে তারা উত্তরে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা ভাবে। উত্তরে যাওয়ার জন্যে পুরনো মাঝি তিলকচাঁদকেও সঙ্গে নেয় তারা। কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ নৌকা নিয়ে তিতাসের সীমা পার হয়ে মেঘনার বুক চিরে ভৈরবের ঘাটে এসে পৌঁছায়। অতি ভোরে এখান থেকে নৌকা ছেড়ে নদীর দু ধারের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পেছনে ফেলে ক্রমে তারা পৌঁছায় নয়াকান্দায়। সেখানে স্বজাতিদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করে এবং রাতে গান, বাজনায় অংশ নেয় তারা। এর পর তারা শুকদেবপুরে বাঁশিরাম মোড়লের ঘাটে নৌকা ভেড়ায়। পাঁচ মাইল বিস্তৃত মাছের এলাকা তার, এখানে মাছ ধরার জন্যে তার সঙ্গে চুক্তি করতে হয়। গ্রামের মোড়লরা তখন দখল করে নিতো নদী-বিল-হাওড় এলাকা। তাদের সঙ্গে চুক্তি না করে জেলেরা মাছ ধরত পারত না। চুক্তি করলেও তা সব সময় জেলেদের জন্যে লাভজনক হতো না, জেলেরা বঞ্চিত হতো তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে। তবু জেলেরা মোড়লদের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হতো একটু সচ্ছল জীবনের আশায়। দূর-দূরান্ত থেকে জেলেরা এসে মোড়লদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতো। মোড়ল নতুন জেলেদের অভ্যর্থনা করে, ভালোভাবে খাওয়ায়। প্রথম দিন তারা নৌকোয় ফিরে না গিয়ে বিকেল বেলা পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। রাতে গানের আসর বসিয়ে মোড়ল তাদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করে। পরে মোড়লের ব্যবস্থায় তারা নিয়োজিত হয় মাছ ধরার কাজে। প্রচুর মাছ পেয়ে খুশি হয় তারা। সে সময় ফাগুন রাঙানো দোল-উৎসব শুকদেবপুরের মানুষের অন্তরে-বাইরে বইয়ে দেয় আনন্দ ধারা। মোড়লের বাড়িতেই দোল-উৎসবের ব্যবস্থা হয়। এই দোল-উৎসবের দিন আবীর মাখানোকে কেন্দ্র করে কিশোরের জীবনে যেন পট পরিবর্তন ঘটে। একটি মেয়ে কিশোরের গালে আবীর লাগিয়ে দেয় :

> কিশোরের গালে আবীর দিতে মেয়েটার হাত কাঁপিল ; বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তার ছন্দময় হাতখানার কোমল স্পর্শ কিশোরের মনের এক রহস্যলোকের পদ্মরাজের ঘোমটা-ঢাকা দলগুলিকে একটি একটি করিয়া মেলিয়া দিল। সেই অজানা স্পর্শের শিহরণে কাঁপিয়া উঠিয়া সে তাকাইল মেয়েটির চোখের দিকে। সে চোখে মিনতি। সে-মিনতি বুঝি কিশোরকে ডাকিয়া বলিতেছে : বহুজনমের এই আবীরের থালা সাজাইয়া রাখিয়াছি। তোমারই জন্যে। আমার আবীরের সঙ্গে তুমি আমাকেও লও।[৮]

কিশোরের এই আবেগতাড়িত ঘোরের মধ্যে উৎসবে রাধা-কৃষ্ণের পালা গান শুরু হয়। কিন্তু গান

---

৮. ঐ, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

ও অনুষ্ঠান হঠাৎ করে ভেঙে যায় গণ্ডগোলের জন্যে। বাসুদেবপুর ও শুকদেবপুরের মালোদের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছিল এক দ্বন্দ্ব ; সে দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে দোল-উৎসবের গানের আসরে।

বাসুদেবপুর ও শুকদেবপুরের মালোদের মধ্যে হার-জিতের মুখোমুখি লড়াই হবে বিলের পাড়ে। সে জন্যে মোড়ল বিদেশী মাঝিদের বিদায় করে দিয়েছে। কিশোরের ভালোবাসা সম্পর্কে মোড়ল ও তার স্ত্রী জেনেছে এবং তাদের মালা বদলের ব্যবস্থা করেছে মেয়েটির মায়ের সম্মতিতে। মাছ ধরে সংগৃহীত অর্থ ও নববধূকে সঙ্গে নিয়ে কিশোর বাড়ির পথে রওয়ানা হয়। যাত্রাপথে খাড়ার মুখে অন্যান্য যাত্রী মাঝিদের সঙ্গে রাত কাটানোর জন্যে নোঙর করে কিশোরের 'নৌকা। কিন্তু গভীর রাতে ডাকাতের কবেল পড়ে সর্বস্ব হারায় সে। নদীপথেই নয় শুধু, স্থলপথেও ডাকাতি হতো গ্রাম-বাংলায় । ডাকাতদের কবলে পড়ে বহু মানুষ হয়েছে চরম ক্ষতিগ্রস্ত। কিশোরও তার স্ত্রী-অর্থ হারিয়ে পাগল হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে আছে :

> কিশোরের চোখ দুইটা অস্বাভাবিক রকমের বড় আর জবা ফুলের মত লাল হইয়া গিয়াছে। মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে ভীষণ এক দানবীয় ভাব। মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে নীচে উপরে চোখ ঘুরাইতেছে। আঁতকাইয়া উঠিয়া তিলক চিৎকার দিল, 'অ সুব্‌লা দেইখ্যা যা, কিশোর পাগল হইয়া গেছে।' [৯]

পাগল কিশোরকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছায় তিলক ও সুবল। তারপর চার বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। কিশোরের বিপর্যয়ে তার বাবা-মায়ের সংসার আক্রান্ত হয় নিরানন্দে। অন্য দিকে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ রক্ষা করে নদীর তীরে ভেসে উঠেছিল কিশোরের বউ। সেখান থেকে পাশের গ্রামের দুই বৃদ্ধ সহোদর গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মালোর কাছে আশ্রয় পায় সে। তখন তার গর্ভে ছিল অনন্ত। নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার কারণেই কিশোরের এ বিয়ে ; আবার নদী পথেই তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফেরা ; বিপর্যয়ও সংঘটিত হয় নদীতে, এবং নদীই কিশোরের স্ত্রীকে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মালোর কাছে আশ্রয় পেতে হয়েছে সহায়ক। এ ধরনের নানা বাস্তব কারণেই

---

৯. ঐ, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

নদী তীরবর্তী মানুষের জীবন যেন নদীর প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। আশ্রয়দাতা নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মালোর সাহায্যে চার বছর পর অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে অনন্তর মা গোকণঘাটে আসে ঘর বাঁধতে। নদীপথে আসার সময় বালক অনন্ত বড় নদী দেখে বিমোহিত হয়ে উঠে। তার নদী সম্পর্কে আগ্রহ দেখে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মালো ধারণা করে যে, অনন্তও একদিন হবে বড় এক জেলে। তারা ভাবে :

> তখন কি সে এই গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দের মত এই মরা নদীর হাঁটু জলে টেংরা পুঁটির জাল ফেলিবে। সে তখন তিতাসের অগাধ জলে ভেসাল জাল, ভৈরব জাল, ছান্দি জাল পাতিয়া বসিবে, কে জানে আরো বড় গাঙে, মেঘনার বুকে গিয়া জগৎ-বেড়াই হয়ত ফেলিবে।[১০]

নৌকায় চলতে চলতে অনন্তর মা অনেক ভেবেছে, ভেবে কোন কূল কিনারা পায় নি। সে এই গ্রামের কোন মানুষকে চেনে না। কোন দিন এ গ্রাম চোখেও দেখে নি। শুধু মনে আছে গ্রামটির নাম। এই গোকণঘাট থেকেই কিশোর মাছ ধরতে গিয়েছিল শুকদেবপুরের নদীতে। স্মৃতি-বিস্মৃতির এতটুকু সম্বল নিয়ে মনের জোরেই যেন তাকে খুঁজতে বের হয় অনন্তর মা।

গ্রামের ঘাটে অপরিচিত মানুষের মুখ দেখে সবার মধ্যে জেগে ওঠে কৌতূহল। অনন্তর মা ভাবে এরাই হবে হয়ত তার প্রতিবেশী। এদের কারো ঘরের পাশেই উঠবে তার ঘর । এরাই তার আপন জন। কিন্তু অত সহজে সব মানুষ আপন হয় না, আবার কেউ কেউ হয়। একই ভাবে গোকণঘাটে কালোর মা, সুবলের বউ অনন্তের মায়ের আপন হয়েছে। কালোর মা অনন্তর মাকে আশ্রয় দিয়েছে । আর সুবলের বউ হয়েছে তার সবচেয়ে আপন, সুবলের বউ ও অনন্তর মায়ের মধ্যে অদৃশ্যগতভাবে রয়েছে যেন সাদৃশ্য। দুজনই বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে হয় স্বামী হারা। বাসন্তীর স্বামী সুবল মহাজনের নৌকোয় মাছ ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মারা যায়। মহাজনের ব্যবসায়ে দিন মজুরের এ ধরনের মৃত্যুর কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে কোনরূপ সহানুভূতি বা অর্থ সাহায্যের রেওয়াজ নেই। বাসন্তীকে বিয়ে করার পর অভাবের কারণে কালোবরণের নৌকায় কাজ নেয় সুবল। এক দিন মেঘনা নদীতে ঈষাণ কোণের বাতাস নৌকাটিকে তীরে ঠেলে নিয়ে যায়। তীরের মাটিতে আঘাত থেকে নৌকা বাঁচানোর জন্যে সকলে একযোগে নেমে কাঁধ

---

১০. ঐ, পৃ ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

লাগাবে বলে সিদ্ধান্ত হলেও সুবল ছাড়া অন্য কেউ তীরে নামে নি। ফলে কাঁধ বাড়াতেই সে নৌকার তলায় পড়ে মরে যায়। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> মহাজনের কাছে অর্থনৈতিকভাবে বন্দী সুবলের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। এ কাহিনী শুধু গগন মালোর পরিবারেরই নয়, মালোদের সামগ্রিক চিত্রই এর মধ্য দিয়ে উন্মোচিত।[১১]

কালোর মা নিজের ছেলেদের বলে কম দামে একখানি ভিটে জমি, লোক দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে সেখানে ঘর তুলে দিল অনন্তর মাকে। একই সঙ্গে চরকায় সুতো কেটে মা ও ছেলেকে জীবন চালনার পথ ও বাৎলে দেয়। সে নিত্যানন্দ মালোকে বলে :

> সে গাঁয়ে গিয়া বসিতে পারিলে এখন থেকেই সে মিহি ও মোটা দুই রকমের সূতা কাটিবে। বেচিবে। তাতে মা ছেলেতে দুর্দিন কাটাইবে।[১২]

ছেঁড়া জাল জোড়া দিতে সুতোর প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুযায়ী সুতো কাটার যে একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে জেলে সমাজে তা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক। কিন্তু অনন্তর মা সুতো কাটতে জানে না। তাই সুবলের বউ অনন্তর মাকে সুতো কাটার কাজ শিখিয়ে দিয়ে দেয় খান কয়েক যন্ত্রপাতি :

> এই নেও বড় টাকু, মোটা সুতার লাগি, এই নেও ছাট টাকু চিকন সুতার। আর এই একখানা পিঁড়ি দিলাম, ঘাটে গিয়া শণের লাছি এর উপরে আছড়াইয়া ধুইয়া আনবা।[১৩]

গোকণঘাটে সামাজিক বিচার-আচার, সুখ-দুঃখ সবই গ্রামের মাতব্বরদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনন্তর মা নতুন। তার সমাজ নির্ধারণ করা হয় নি। একটি বৈঠকে অনেক দিনের জমানো অন্যান্য বিচার-আচারের সঙ্গে অনন্তর মায়ের সমাজ নির্ধারণও করা হবে। এ ছাড়া এ বৈঠকে মহাজন, জমিদাররা সাধারণ জেলেদের ওপর যে অত্যাচার করে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে। মালো সমাজের মাতব্বর রামপ্রসাদ জমিদারদের সঙ্গে আগেই হাট বসানো প্রসঙ্গে পঁচিশ টাকা এককালীন দিয়ে, পান তামাক খাইয়ে এ সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু আবার তারা ভার প্রতি দু টাকা মাসুল দাবি করেছে। জমিদারের লোকদের এ খাজনার দাবি অযৌক্তিক, এবং নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ওপর চাপানো তীব্র শোষণেরই

---

১১. শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ: জীবন, সাহিত্য ও অন্যান্য, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৫৯
১২. অচিন্ত্য বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
১৩. ঐ, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

নামান্তর, ফলে, রামপ্রসাদ এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে যেন :

> শুন বেপারী বাবুকে সাফ্ কথা কইয়া দিও, মালোরা মাছ বেচ্‌তে কোন সময় মাসুল দেয় নাই, দিবেও না। জায়গা দেউক আর নাই দেউক। মালোরা বাজার জমাইতে যেমুন জানে, ভাঙ্‌তেও জানে। তারা যেখানে যায়, আ-পথে পথ হয়, আ-বাজারে বাজার হয়।[১৪]

সালিস থেকে ফেরার পথে রামপ্রসাদ পথ ভুল করে বাহারুল্লা, শরীয়তুল্লার বাড়ির উঠোনে পৌঁছায়। সেখানে তাদের সঙ্গে রামপ্রসাদ অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করে। এ বাড়িতে পুরনো দিনের মতো গানের আসর বসে না। কয়েক বছর ফসলহানির কারণে চাষীরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। চাষীরা লেখা-পড়ার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে বলে এজমালিতে মক্তব তৈরি করেছে। পাশাপাশি মালো পাড়ার জেলেরা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী নয়। সে জন্যে রামপ্রসাদ দুঃখবোধ করে। জেলেদের বুঝানো যায় না যে, জীবনের জন্যে শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর পর রামপ্রসাদ বাড়ি ফেরার পথে রামকেশবের উঠানে আলো দেখে সেখানে যায়। সেখানে রামকেশবের ছেলে পাগল কিশোর খোলা বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলো। সে মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে ক্ষিপ্র গতিতে উঠোনে বেরিয়ে আসে। রামকেশবের ঘুমের মধ্যে নাক ডাকছে। শেষ রাতে সে মাছ ধরতে যাবে ভেবে রামকেশবকে ডেকে তোলে নি রামপ্রসাদ। কিন্তু সে বাড়ির দৃশ্য বড় করুণ। রামকেশব বৃদ্ধ বয়সে জাল নিয়ে অনেক টানাটানি করেও মাছ ধরতে পারে না। তার এমন একজন মানুষ নেই যে তাকে সাহায্য করতে পারে। অবলম্বনহীন রামকেশবের একমাত্র পুত্র কিশোরের পাগল হওয়াই তার জীবনে দুঃখের প্রধান কারণ। রামকেশব সে দুঃখভার সইতে না পেরে বলে ওঠে :

> রাতের জালে যাওয়া আর বাবা আমারে দিয়া কুলাইবে না। খেউ তুলিয়া জালে হাত দিলে হাত ঠক ঠক করিয়া কাঁপে। গাঙের বাতাসে কান-কপাল ভাঙ্গিয়া নামায়। বুক যেন ভোঁতা ছুরি দিয়া কাটে। আমার কি আর বাবা মাছ ধরার সময় আছে। আম্মার এখন গুফার মধ্যে বসিয়া বসিয়া তামাক টানিয়া কাটাইবার দিন। বিধি তারে কোন্ পাগল বানাইল। কত পাগল ভাল হয়, আমার পাগল আর ভাল হইল না।[১৫]

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ পর্যায়ে ঔপন্যাসিক কালোবরণের ঘরের নবজাতককে অভ্যর্থনা জানানোর

---

১৪. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
১৫. ঐ, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে জেলেদের সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি দিয়ে তাকে মাঙ্গলিক অভিবাদন জানাতে হবে। এই অভিবাদন জানানোর জন্যে রয়েছে নির্দিষ্ট নারী কয়েকজন। কালোর মা মেজ বউয়ের সন্তান জন্মের তদারকি করেছে। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীরা পাঁচ বার উলুধ্বনি দেয়। কালোর মা উপস্থিত সবাইকে নবজাতক দেখায়। এর পর ছাদিরের মাথায় দোয়াত-কলম রেখে চিত্রগুপ্ত শিশুটির কপালে ভাগ্যলিপি লিখে দেয়। আট দিনের মাথায় হয় আটকলাই, পাড়ার ছেলেদের মধ্যে খই, ভাজা-কলাই, বাতাসা বিতরণ করা হয়। তের দিন পার হতেই অশৌচ অন্ত ; অর্থাৎ সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। তের দিনের মাথায় তিন ভাইয়ের খোঁচা খোঁচা দাড়ি কামানো, পুরোহিতের মন্ত্র পড়ার পর উঠোনে নতুন চাটাইয়ে ধান বিছানো হয়। নতুন শাড়ি পরে, নতুন রঙিন রুমালে জড়িয়ে মেজবউ চাটাইয়ের ধানগুলো চারদিকে বিছিয়ে দেয়। তখন উপস্থিত নারীরা এক সঙ্গে গান ধরে। গানের কথা নিম্নরূপ :

দেখি রাণী ভাগ্যবান, রাণীর কোলেতে নাচে দয়াল ভগমান।
নাচরে নাচরে গোপাল খাইয়া ক্ষীর ননী, নাচিলে বানাইয়া
দিব হস্তের পাচনি। একবার নাচ দুইবার নাচ তিনবার নাচ
দেখি, নাচিলে গড়াইয়া দিব হস্তের মোহন বাঁশি।[১৬]

এর পরও রয়েছে শিশু সন্তানের অন্নপ্রাশন। এ সব আনুষ্ঠানিকতা পালন তাদের সামাজিক রীতি। মালোদের জীবনে বিয়ের অনুষ্ঠানও এক আনন্দের ব্যাপার। দারিদ্র্যের মধ্যেও বিয়ে যে করে সে যেমন সাময়িকভাবে হলেও সুখী হয়, বিয়েতে যারা যোগ দেয় সুখী হয় তারা একই ভাবে। তারা এ দিনটিকে মঙ্গলময় বলে মনে করে। জেলে পাড়ার যে সদস্যটি বিয়ে করতে পারে না সে থাকে নৌকোয়। গুরুদয়াল সে রকমই একজন। শ্যামাসুন্দরের বিয়ে নিয়ে গুরুদয়াল ও কালোর ভাই কথা কাটাকাটি করে। শ্যামাসুন্দরের বিয়ে নিয়ে মালো মেয়েদের মধ্যেও গুঞ্জন ওঠে। বর ও কনের বয়সের ব্যবধান অনেক, যেন নানা ও নাতনি। জেলেদের সমাজে বাল্য বিয়ে বা অসম বয়সীদের বিয়ে একটি সাধারণ ঘটনা।

---

১৬. ঐ, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন :

> আপাতত দৈত্যকে ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তার মাথায় ফুল ছড়াইয়া তাকে তুষ্ট রাখা চলুক। তার লোকজন অন্যমনস্ক হইলে যেই একটু ফাঁক পাওয়া যাইবে অমনি মেয়েটি এখান হইতে পালাইয়া যাইবে।[১৭]

ধনী জেলে শ্যামাসুন্দর এ বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করে মালো পাড়ার প্রত্যেককে ভোজ খাইয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে ধুমধাম হয় কালীপূজার অনুষ্ঠানে। বাইরের থেকে মাস খানেক আগে কারিগর এসে পূজার মূর্তি তৈরীর কাজে নিয়োজিত হয়। বাঁশের কাঠামোর উপর পাটের রশি দিয়ে খড় পেঁচিয়ে তৈরি করা হয় মূর্তির ভিত, তার গায়ে মাটি লেপে সেটিকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়া হয়। সব শেষে রঙ তুলি দিয়ে অবয়বটির নিখুঁত রূপটি তৈরি করে চিত্রকর। প্রতিমা তৈরির এ বিবরণটি পূজার আবহের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র হিসেবে উপস্থিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

পূজার মণ্ডপে কালোর মা, অনন্তর মা ও বৃন্দার মা থাকবে পুরোহিতের সহকারী। তারা আগের দিন থেকেই তাই হয়েছে সংযমী, নিরামিষী। তাদের কাজ পূজার ফুল তোলা, ফুল বাছাই করা, ভোগ নৈবেদ্য সাজানো আর পুরোহিতের আদেশ মতো নানা দ্রব্য এগিয়ে দেওয়া। পূজা উৎসবে মণ্ডপের চারদিকেই মানুষ। অনন্তর কোন আত্মীয় ও পরিচিত জন এই পূজা অনুষ্ঠানে না থাকায় সে অসহায়ত্ব অনুভব করেছে ; বিশেষ করে যখন সে নানা জনের নানা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অনন্তর শীত বস্ত্র নেই, সে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে শীত দূর করার চেষ্টা করেছে। অবশেষে মণ্ডপের মধ্যে অন্যান্যের সঙ্গে শুয়ে রাত কাটিয়েছে সে।

পূজা শেষে মণ্ডপে চারদিন ধরে যাত্রাগান আর কবিগান চলছে। চারদিন জেলেরা তিতাসের বুকে মাছ ধরতে যায় নি। তারা আহার-নিদ্রা-কাজ কর্ম ত্যাগ করে সেখানেই সমবেত। চারদিন আনন্দ শেষে তাদের মধ্যে অবসন্নের ভাব আসে। এই আনন্দের বাইরে থেকেছে জেলে পাড়ার শুধু একটি পরিবার। রামকেশব যায় নি এ অনুষ্ঠানে। সে অর্থাভাবে চাঁদা দিতে পারে নি বলে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। রামকেশবের গরিবি হাল নষ্ট করতে পারে নি তার ব্যক্তিত্ব। সে চাঁদা দেয় নি বলে গানও শোনে নি। পূজার প্রসাদও খায় নি। চার রাত ধরে খালের মুখে একটানা জাল পেতে প্রচুর মাছ পেয়ে চড়া দামে বিক্রি করে সে কিছু টাকা আয় করেছে। হাতে টাকা পেয়ে সে তার ছেলে কিশোর পাগলের মঙ্গলের জন্যে কয়েক জন মানুষকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন রয়েছে সামনে। এ দিন সবার বাড়িতে

---

১৭. ঐ, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

প্রচুর পিঠা তৈরি হয়। বিচিত্র ধরনের সব পিঠা। এ দিন নিমন্ত্রণ করলেও অতিথিরা সবার বাড়ি যেতে পারে না। সে কারণে রামকেশবও কিশোরের মঙ্গলানুষ্ঠানে দাওয়াত করতে ইতস্তত। এ দিনের আনন্দ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা আছে :

> সারাটা গ্রাম ঘুরিয়া কীর্তন করার জন্য সকলের আগে বাহির হয় মালো পাড়ার দল। সাহা পাড়া আর যোগীপাড়া হইতেও দেখাদেখি দল বাহির হয়। কিন্তু মালোদের মত কীর্তনে অত জৌলুস হয় না। তারা কীর্তন করে ঝিমাইয়া আর মালোরা করে নাচিয়া কুঁদিয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া।[১৮]

রামকেশবের বাড়িতে সুবলের বউ, মঙ্গলার বউ ও অনন্তর মা এসেছে। পিঠা তৈরির কাজে তারা ব্যস্ত। কিশোরের মা ও সুবলের শাশুড়ীও রয়েছে এদের সঙ্গে। সুবলের বউ বাসন্তী ও অনন্তর মায়ের এ বাড়ি উপস্থিতি পাগল কিশোরের মনে একটা ছায়া ফেলেছে, তার মনে তুলেছে আলোড়ন। তাই কিশোর সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতো বসে বসে কেঁদেছে। এখানে এসে অনন্তর মা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে পাগলের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে। কিশোর যে তারই স্বামী সে কথায় সুবলের বউ বাসন্তী করেছে সন্দেহ, করলেও অনন্তের মা ঠিকই বুঝেছে। সে কারণেই গভীর রাতে সে পিঠা সাজিয়ে নিয়ে যায় পাগলকে খাওয়ানোর জন্যে। পাগলের আচরণে অনন্তর মা আরও নিশ্চিত হয়। স্বামীকে ভালো করে তোলার আশায় দোল পূর্ণিমার সময় অনন্তকে দিয়ে সে বাজার থেকে আবীর আনায়। যদি কোন ভাবে তার স্বামীর অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে ; সে জন্যেই সে কিশোর পাগলের দাড়িতে আবীর মাখিয়ে দেয় এবং সুবলের বউ বাসন্তীকে অনন্তর মা বলে :

> আইজকার দিনে সকলে সকলেরে রাঙাইছে। পাগলেরে ত কেউ রাঙাইল না ভইন। আমি একটু রাঙাইয়া দিলাম।
>
> 'কেউ যদি দেখত?'
>
> তা হইলে কইতাম তারে, পাগলে আমারে পাগলিনী করেছে।[১৯]

অনন্তর মাকে বাসন্তী শিখিয়েছে সুতো কাটার কাজ। কিন্তু সুতো কাটার কাজের চাহিদা সব সময় এক রকম থাকে না। বর্ষার আগেই সবাই জাল তৈরির কাজ শেষ করে ফেলে। বর্ষায় জাল তৈরির কাজ বিশেষ একটা থাকে না। ফলে, উপার্জন আসে কমে। সে সময় অনন্তর মাকে সাহায্য করে

১৮. ঐ, পৃ. ৬৬
১৯. ঐ, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

কেবল বাসন্তী। কিন্তু তার নিজের অবস্থা বেসামাল। সে নিরুপায় হয়েও বাপের সংসার থেকে চুরি করে এনে দিত কিছু চাল, ডাল, তরকারি, নুন, তেল, হলুদ ইত্যাদি। এ ভাবে যতটা সম্ভব সাহায্য সে অনন্তর মাকে করে আসছে। তার কাছে বারবার সাহায্য না পাওয়ার আশঙ্কায় অনন্তর মা কিছুটা দিশেহারা। ভাত কাপড়ের অভাব, ঘরের চালে খড়েরও অভাব, বৃষ্টির পানিতে সব যায় ভিজে। সম্বলহীন এই নারী আজ তীব্র অভাবের মধ্যে পড়ে একটুও আশার আলো দেখতে পায় না কোথাও। সুবলের বউ বাসন্তী বিধবা এবং পিতৃ সংসারে আশ্রিতা বলে তার অবস্থাও ভালো নয়। সে পাড়ার অবিবাহিত যুবক ময়নার সঙ্গে হেসে যে কথা বলেছে, সেটি তার মায়ের পছন্দ নয়। মালো সমাজের কেউ-ই বাসন্তী বা অন্য কোন বিধবা নারীর জীবন, যৌবন নিয়ে ভাবিত হয় না। তাদের সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় বিধি-নিষেধই সৃষ্টি করেছে এই দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্মীয় বিধি-নিষেধে নিষ্পেষিত বাসন্তী শেষ পর্যন্ত হয়ে গেছে ক্ষুব্ধ ও বেপরোয়া। তাই তার উক্তি :

> আমি ময়নার সাথে কথা কমু, তার সাথে পুরীর বাইর হইয়া যামু। তোমরা কি করতে পার আমার। খাইতে দিবা না, খামু না ; পরতে দিবা না, পরুম না। কিন্তুক আমি বাইর হইয়া যামুই। তোম্‌রার মুখে চুনকালি পড়ব, আমার কি। আমার তিন কুলে কারুর লাগি ভাবনা নাই। একলা গতর আমি লুটাইয়া দেমু। বিলাইয়া দেমু, নষ্ট কইরা দেমু, যা মনে লয় তাই করুম, তোমরা কথা কইতে পারবা না। মনে কইরা দেখ কোন শিশুকালে বিয়া দিছলা। জানলাম না কিছু, বুঝলাম না কিছু। সেই অবুঝকালে ধর্মে কাঁচা রাঁড়ি বানাইয়া থুইছে। সেই অবধি পোড়া কপাল লইয়া বনে বনে কাইন্দা ফিরি। তোমরা ত সুখে আছে। তোমরা কি বুঝবা আমরা দুঃখের গাঙ কত গহীন। আমার বুঝি সাধ-আহ্লাদ নাই। আমার বুঝি কিছুর দরকার লাগে না। [২০]

মালো সমাজের ধর্মীয় রীতি, নীতির বিরুদ্ধে কোন কথা বা কাজ করা সহজ ছিলো না। ধর্মীয় আচারের কারণে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠলেও তা ভাঙা যেত না। সে কারণেই এই দুই নারীর যৌবন-তৃষ্ণা সম্পর্কে ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি হয় নি ঐ সমাজে। নারীর জীবনে পুরুষ যে অপরিহার্য তা উপলব্ধি করেছে অনন্তর মা।

---

২০. ঐ, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সে তাই বাসন্তীকে বলেছে :

> তুমি না কইছিলা ভইন আমার একজন পুরুষ মানুষ চাই। হ' চাই-ইত। পুরুষ ছাড়া নারীর জীবনের কানাকড়ি দাম নাই।[২১]

অনন্তর মা মনে মনে বিদ্রোহী হয়েছে। সে তার অবস্থার পরিবর্তন চায়। পাগলকে পাওয়ার জন্যে সে চায় স্বর্গীয় আশীর্বাদ। সে চায় কিশোর ভালো হয়ে যাক। তাকে পেলে সে লোক নিন্দাও সয়ে নেবে। এমন কি সে ভাবে বিধবা বিয়ের কথা। দেশে বিধবা বিয়ের কথা প্রচারিত হয়েছে। তার বাস্তবায়নও সে কামনা করে। আবার সে এও ভেবেছে যে স্ত্রী মারা গেলে পুরুষরা বিয়ে করতে পারে। একই ভাবে স্বামী মারা গেলে নারীরাও বিয়ে করলে ক্ষতি কি ? তার এ মনোভাবে নারী-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নারীর সম অধিকারই যেন ব্যক্ত হয়েছে। অনন্তর পিতৃ পরিচয়ের জন্যেও সে চিন্তিত। সার্বিক পরিস্থিতিতে কিশোরকে সেবা দিয়ে তার পূর্ব স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্যেও সে তাই আগ্রহী। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। কিশোর শেষ পর্যন্ত মারাত্মক পাগলামির অপরাধে মানুষের হাতে মার খেয়ে মারা গেল। তার মৃত্যুর পর অনন্তর মা হয়ে পড়ে অসুস্থ। সে আক্রান্ত হয় জ্বর ও শারীরিক জ্বালা পোড়ায়। চার দিন পর তারও হয় মৃত্যু। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের অসহনীয় কষ্টের হাত থেকে যেন রেহাই পেল কিশোর ও তার স্ত্রী।

বর্ষাকালে তিতাস নদীতে পানি বেড়ে যায়। নদীতে তখন যতটুকু ঢেউ ওঠে তাতে জেলেদের ক্ষতি হয় না। নদীতে কখনও কখনও সমস্যায় পড়ে পণ্যবাহী নৌকা। কাদির মিয়ার আলু ভর্তি নৌকা ঝড়-বৃষ্টিতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে, পরিচিত জেলে ধনঞ্জয় নৌকা নিয়ে ছুটে আসে কাদিরের আহ্বানে। এবং ধনঞ্জয়ের বুদ্ধিতে নৌকা ও আলু দুটোই রক্ষা পায়। পাঁচ জনে মিলে জেলের নৌকো থেকে আলু অন্য নৌকোয় সরিয়ে নৌকোটির ওজন কমিয়ে দেয়ার ফলে কোন বিপদ ঘটে নি। ঝড়-বাদলের সময় জেলেরাই নদীতে বিপদগ্রস্তের একমাত্র সহায়।

কাদির ও বনমালী নৌকায় যেতে যেতে হাট প্রসঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনা করে। তাদের আলোচনার বিষয় হাটের বেপারীদের চরিত্র। বেপারীরা সব সময়ই হয়তো এ রকম। তারা দরাদরি করে কৃষকের আলু কেনে ; অথচ প্রায়ই তাদের ঠিকমতো টাকা দেয় না । মাছ কেনাবেচার ক্ষেত্রেও তারা একই আচরণ করে জেলেদের সঙ্গে। মাছের দাম সিকিভাগও

---

২১. ঐ, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিশোধ করে না অনেক সময়। তারপরও কৃষক ও জেলেদের বাজারেই মাল নিয়ে উঠতে হয়। ব্যবসা সূত্রেই কাদির এসেছে হাটে। জলো ঘাসের নাড়া দিয়ে চারদিকে বেড়ি রচনা করে তার মধ্যে আলু জমা করেছে সে। আলুর টিবি থেকে সব সময়ই দু চারটে আলু ছিটকে পড়ে। তা কুড়িয়ে নেয় হাটের ভিখিরি ছেলেরা। কাদির তাদের কিছু বলে না। কিন্তু ভিখিরিরা হাটের বেপারীদের পড়ে যাওয়া আলু ধরলে তাদের কুড়িয়ে পাওয়া আলুও তারা কেড়ে নেয় এবং মারধর করে। হাট-বাজারের এ চিত্র পরিবর্তিত হয় নি। আলু কুড়োতে এসেছে অনন্ত। মাকে হারিয়ে সে এখন আশ্রয় নিয়েছে বাজারে। সে আলু না কুড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রামধনু দেখছিলো। মা মরা এই ছেলেটির প্রতি বনমালীর দরদ জন্মে। কিন্তু তাকে সঙ্গে নিতে পারে নি সে। শেষ পর্যন্ত নিরাশ্রয় অনন্ত আবার ফিরে গেল বাসন্তী মাসীর কাছে। বাসন্তীর মা অনন্তকে দুচোখে দেখতে পারে না, সে গালি দিয়ে বলে :

> মরেও না। আইজ ত নিখোঁজ দেইখ্যা মনে করছিলাম, বুঝি পেরেতে ধরছে, অখন দেখি চান্দের ছটার মত হাজির। মনে লয় পোড়া কাট মাইরা খেদাইয়া দেই।[২২]

মা-বাবার সংসারের ওপর নির্ভরশীল বাসন্তী। অসহায়ের মতো বাসন্তীর সাধ থাকলেও আজ অনন্তর জন্যে অনেক কিছু সে করতে পারে না। বনমালীর বোনকে বাসন্তী নিজ সন্তানের মতো স্নেহ করে। বাসন্তী তার বাপের সঙ্গে নৌকোয়ও দেয় নি অনন্তকে, তার বাপের রাগের ভয়ে। অসহায় বিধবা নারীর শেষ সম্বল যেন অনন্ত। সব কিছুর বিনিময়ে সে তাকে রক্ষা করতে চায়।

তিতাস পাড়ের মালোদের জীবন ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার দ্বারা প্রভাবিত। মালোদের জায়গা-সম্পত্তি অর্ধেক থাকে পানিতে, অর্ধেক থাকে ডাঙায়। ঝড়ের কবলে পড়ে কখনও কখনও জেলেরা তাদের জাল নৌকা উভয়ই হারিয়ে আসে। অনেক সময় তাদের ঘড়বাড়ি ভেঙে যায়। এবারের ঝড়ে কালোবরণের নৌকাটি ভেঙে ডুবে গেছে নদীতে। ঘর ভেঙে পড়েছে বাসন্তীর বাবার। ভেঙে যাওয়া ঘরটিতে বাসন্তী থাকত অনন্তকে নিয়ে। সে ঘরটি তুলতে বাসন্তীর বাবার জমানো টাকা খরচ হয়ে গেছে। তারা পড়লো দিন আনা দিন খাওয়ার অবস্থায়। দুশ্চিন্তায় পড়েছে বাসন্তীর বাবা। নিজেদের এই কষ্টের মধ্যে অনন্তকে আর জড়িয়ে রাখতে চায় না বাসন্তীর বাবা-মা। সে জন্যে

---

২২. ঐ, পৃ.৮৯

Dhaka University Institutional Repository

বিচলিত বাসন্তী। কালোর মায়ের কাছে অনন্তের জন্যে সে একটি উপায় খোঁজে। অনন্তর কারণে বাসন্তী তার মায়ের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে পরে আবার অনুশোচনায় ভোগে এবং এক পর্যায়ে অনন্তকে বকাবকি করে বাসন্তী :

> শত্তুর, তুই বাইর হ। এই ঘরে তুই ভাত খাস তা তোর সাত গুষ্ঠীর মাথা খাস। তোর লাগি আমার মায়েরে মারলাম। তুই আমার কি ঠ্যাঙ্গের তলা, পায়ের ধুলা। যা যা অখনই যা, যমের মুখে যা। ডাকিনী যোগিনীর মুখে যা, কালীর মুখে যা। ধর্মে যেন আর তোরে ফিরাইয়া না আনে। চোখের মাথা, নাকের মাথা খাইয়া যেখানে যমে টানে, সেইখানে যা। আমার সামনে আর মুখ দেখাইস না। তোর মা গেছে যে পথে, তুইও সেই পথে যা। [২৩]

মায়ের মত এই মাসীর কাছে আশ্রয় না পেয়ে অনন্ত বের হয়ে যায়। এ তার জীবনের প্রথম স্বকীয়তার প্রকাশ। সে নদীর ধারে ভাঙা নৌকোর ওপর গিয়ে বসে থাকে। চেয়ে রয় সুদূরের দিকে। অবশেষে উদয়তারার ভাই বনমালী একদিন এসে ভাঙা নৌকার খোপ থেকে অনন্তকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বাসন্তী তাদের যাবার সময় নদীর ঘাটে এসেছিল। কিন্তু অনন্তর সঙ্গে কথা হয় নি। তার মা-বাবার সঙ্গে রাগ করে সে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মাত্র। তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে অনন্তকে নিয়ে বাঁচার চিন্তাও করেছে বাসন্তী। সে ভাবে, যদি একটি তিন কোণের জালে অনন্তকে দিয়ে চিংড়ির পোনা ধরানো যেতো, তা হলে এ ভাবে ধরা মাছ হাটে বিক্রি করেও দুজনার সংসার চলে যেতো। অনন্তর বয়সী অনেক ছেলেরা মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। এই বয়সের ছেলেদের মাছ ধরে সংসার চালানোর চিত্র তাদের সমাজে অপরিচিত নয়।

সুতো কাটা মালোদের সমাজে এক ধরনের পেশা। অনেকে সুতো বিক্রি করে সংসার চালায়। আবার কেউ কেউ নিজের জাল বুনতে তৈরি করে সুতো। পাড়ার মেয়েরাই সাধারণত সুতো কাটার কাজে নিয়োজিত থাকে। বৌ-ঝিদের সুতো কাটার সময় খেয়ালে-বেখেয়ালে কখনও কখনও তাদের বুকের-পিঠের কাপড় সরে যায়। অনেকটা বেআব্রু মহিলাদের শারীরিক সৌন্দর্য দেখার সুযোগ নেয় তেলিপাড়ার এক যুবক। সে প্রতিদিন বিকেলে পাড়ার এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেড়ায় এবং নারীদের উদ্দেশে নোংরা ইঙ্গিত করে আকারে ইশারায়। এ আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে

---

২৩. ঐ, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

মালোরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী মালো ছেলেদের নেতৃত্ব দেয় বাসন্তী। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> একদিন রাত্রে তাকে ডাকিয়া ঘরে নিল, আর বাছা বাছা জোয়ান মালোর ছেলেরা তাকে গলা টিপিয়া মারিয়া, নৌকায় তুলিয়া বার-গাঙে নিয়া ছাড়িয়া দিল। স্রোতের টানে সে কোথায় চালিয়া গেল কেউ জানিল না।[২৪]

এর পর থেকেই শুরু হলো মালোদের সঙ্গে উচ্চ কায়েত-ব্রাহ্মণদের দ্বন্দ্ব সংঘাত। মালোদেরই একজন তামসীর বাপ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজেকে ধন্য মনে করে। সেই ব্রাহ্মণ-কায়েতদের স্বার্থে নিজ গোত্রীয় স্বার্থ নষ্ট করে সব কিছু ফাঁস করে দেয়। ব্রাহ্মণ-কায়েতরাও এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে গোপনে বৈঠক করে।

নবীনগরে একজন সাধারণ মানুষ বনমালী। সে ধার্মিক। সামনে পূজো। সে জন্যে বোন উদয়তারাকে নিতে সে এসেছে গোকর্ণঘাটে। এখানে তার বোনের শ্বশুর বাড়ি। বনমালীর বাড়িতে তিন বোনই এসেছে, সঙ্গে এসেছে তাদের স্বামীরাও। ফলে বোনরা একত্র হওয়ায় সকলেই আনন্দিত। তাই তারা পিঠা তৈরি করে, তাদের স্বামীরা যায় মাছ ধরতে। বনমালীও বাজার থেকে কিনে আনে নানা রকম খাবার। ফলে সৃষ্টি হয় একটি আনন্দঘন পরিবেশ। পূজো উপলক্ষে বনমালী পদ্মাপূরাণ ও মনসামঙ্গল গেয়ে গেয়ে পাড়া বেড়ায়। মন্দিরের সাধু অনন্তর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ দেখে মুগ্ধ হয়। সে অনন্তকে স্কুলে পাঠানোর পরামর্শ দেয়। অনন্তকে স্কুলে পাঠানোর মধ্যেই তাদের শিক্ষাগত অক্ষমতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে মাছ বিক্রির সামান্য হিসাবও করতে পারে। হিসাব মেটানোর জন্যে তাদের যেতে হয় হরিদাস সাহার কাছে। তাকে ভালো ভালো মাছ দিয়েও অনুরোধ করতে হয় হিসাবের জন্যে। তাই সকলে একমত হয় অনন্তকে স্কুলে পাঠাতে। বনমালীর আশ্রয়ে নিজ ভবিষ্যৎ ভেবে বিমর্ষ অনন্ত। এখানে এসে অনন্তর পরিচয় হয় অনন্তবালার সঙ্গে। দুরন্ত দুই বালক-বালিকার মধ্যে গড়ে ওঠে সুসম্পর্ক। অনন্তবালার আন্তরিক ব্যবহারে তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে অনন্ত। অনন্তর মন খারাপ হলেই তার অনন্তবালাকে মনে পড়ে। সে ভাবে যদি অনন্তবালা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত তা হলে তার মনের দুঃখ ক্রমে চলে যেত। উপন্যাসে এ পর্যায়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের ধর্ম চর্চার একটি বহিঃপ্রকাশ

---

২৪. ঐ, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে জালাবিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বেহুলার স্মৃতি রক্ষার জন্যেই তাদের এ অনুষ্ঠান। এ ছাড়া ধুমধামের সঙ্গে 'মনসা' পূজো ও 'কালী' পূজার মধ্য দিয়ে শেষ হয় শ্রাবণ মাস। এই পূজোর উৎসবেই বনমালীর বোনেরা নয়নতারা, উদয়তারা ও আসমানতারা এসেছে এ বাড়ি। উদয়তারার সঙ্গে আসে অনন্ত। নবীনগরবাসীদের ধর্মাচরণ সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> লেখকের প্রকৃত আকর্ষণ নদী তীরের গ্রাম সমাজের ধর্মকেন্দ্রিক ও উৎসবছন্দগ্রথিত জীবনযাত্রায়, সরল, বিশ্বাসী মালো ও কৃষকদের স্নিগ্ধ-শান্ত জীবন স্পৃহায়, ধর্ম বিশ্বাস উদ্ভূত, বদ্ধমূল সংস্কৃতি চর্চায়।[২৫]

নদী-তীরবর্তী মানুষের জীবন যাপনের সঙ্গে নদী তীর জড়িত। নদীর ঘাটে গ্রামের বউঝিয়া আসে গোসল করতে, কাপড়-চোপড় ধুতে। কাদিরের ছেলে ছাদির মিয়া নদীর ঘাটে আসে ছেলে রমুকে নিয়ে গোসল করতে। একটি খাল নদীর সঙ্গে যুক্ত। সে খালের মধ্যেই মাটির হাঁড়ি পাতিল বিক্রি করে কুমোররা। দারিদ্র্যের কারণে গ্রামের মানুষ মাটির পাত্র ব্যবহার করে থাকে। এই ব্যবসায়ে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যাপারীরাও জড়িত। ধান-চাল বা নগদ টাকার বিনিময়ে তারা এ ব্যবসা করে থাকে। ঐ ব্যবসায়ীরা অবসরে নৌকায় বসে ভাটিয়ালি গানও গায়। গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এই শ্রেণীর গানের একটি অবস্থান ও ভূমিকা আছে। প্রবাসী ব্যবসায়ীদের কণ্ঠে তা হয়ে ওঠে হৃদয়-স্পর্শ। নদী তীরে ছাদির মিয়াকেও এ গান মুগ্ধ করেছে। সে ব্যবসায়ীদের গুনগুনিয়ে গান গাওয়ার পরামর্শ দেয়। প্রসঙ্গক্রমে একটি ভাটিয়ালি গানের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা চলে :

> হায় হায়রে, এহিত চৈত্রি না মাসে গিরস্তে বুনে বীজ।
> আন গো কটোরা ভরি খাইয়া মরি বিষ ॥
> বিষ খাইয়া মইরা যামু কানবে বাপ মায়।
> আর ত না দিবে বিয়া পরবাসীর ঠাঁই।[২৬]

কৃষক কাদির মিয়ার ছেলে ছাদির মিয়াও কৃষি কাজ করে। তাদের পরিবারের সকলে উদয়াস্ত থাকে কর্মব্যস্ত। পাকা গৃহস্থ সংসারের একটি দৃষ্টান্ত যেন কাদির মিয়ার সংসার।

---

২৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৯৬ পৃ.৭৬৮
২৬. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে তার উঠোনের বর্ণনায় এ সত্যই প্রমাণিত :

> উঠানের বুকটা চিতানো। জল জমিতে পারে না, সবসময় শুক্‌না, ঠন্‌ঠনে। বিকালে একপাল হাঁসমুরগী সেখানে ঝি-পুত লইয়া চরিয়া বেড়াইয়াছে এবং সারাটা উঠান নোংরা করিয়াছে। গোলায় অজস্র ধান। সারা বছর খাইয়া বিলাইয়া, হাঁড়ি-পাতিল খইয়ের মোয়া রাখিয়াও সে-ধান কমে না, এম্‌নি অজস্র। ঢেঁকিঘরে শাপের গর্ত ধরা পড়িয়াছে। মাটি খুড়িয়া নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গিয়া ধান ভানা চলে না। জ্যোৎস্না রাতের সাঁঝ। সেই উঠানেরই একদিকে ননদদের লইয়া ধান ভানিতে হইবে। মস্তবড় ঝাঁটাখানা দুই হাতে ধরিয়া কোমর বাঁকাইয়া অতবড় উঠানখানা ঝাড়ু দিয়া শেষ করিতে করিতে বেলাটুকু ফুরাইল, নবমী তিথির ঝাপসা চাঁদের আলোয় সেই উঠান চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল।[২৭]

এই গৃহস্থের ঘরে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে নিজামত মুহুরী। ছাদির মিয়া তার জামাই। বিয়াই কাদির মিয়াকে ভয় পায় নিজামত মুহুরী বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া গহনা এখনও দিতে পারে নি বলে। লজ্জা ও কথার বিষবাণ এড়াতে নিজামত মুহুরী এক রকম গোপনেই প্রবেশ করে জামাই বাড়ি।

শোষণমূলক যৌতুক প্রথার কারণেই এ পরিস্থিতি। যৌতুক প্রথার মতোন্‌ গুরুতর শোষণমূলক মহাজনী ঋণ ব্যবস্থাও সমাজে প্রচলিত। দলিল-অলংকার জমা রেখে বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে চড়া সুদ ধার্য করে টাকা দেয় মহাজনরা। কাদির মিয়া লিখিত চুক্তির মাধ্যমে ঋণ নিয়েছে মাগনঠাকুরের কাছ থেকে। সাধারণত কোন অঘটন বা বিপদে পড়েই মানুষ এ রকম ঋণ নিয়ে থাকে। কাদের মিয়া ঝড়ে পড়ে যাওয়া ঘর মেরামত করার জন্যে ঋণ নিয়েছে। সরল প্রাণ কৃষক কাদির মিয়া পাট বিক্রি করা অর্থে সে ঋণ পরিশোধ করেও রেহাই পায় নি মহাজন মাগন ঠাকুরের কাছ থেকে। মাগন ঠাকুর চুক্তির কাগজ নষ্ট করে নি। সে পুরনো সেই কাগজের ভিত্তিতে নতুন করে টাকা আদায়ের জন্যে মামলা করেছে কাদির মিয়ার নামে। এ রকম ঠক ও প্রতারণার কাজে শুধু মাগন ঠাকুর একাই জড়িত নয়। দোলগোবিন্দ সাহা ও রশিদ—এরাও একই ধরনের মহাজনী ঋণ দেয়ার নামে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে। নিরীহ মানুষদের ঠকিয়ে তারা অর্জন করে অর্থ-সম্পদ। কিন্তু দোলগোবিন্দ সাহার আকস্মিক মৃত্যুতে মাগন ঠাকুর মুখোমুখি হয় আত্মজিজ্ঞাসার। সে তার ক্ষমাহীন অপরাধের কথা মনে করে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং আত্মহত্যা করে।

---

২৭. ঐ, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

ঔপন্যাসিক একজন অপরাধীর চরিত্রে নৈতিকতা জাগিয়ে দিয়ে তাকে যেন পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ঐ ধরনের শোষণমূলক মহাজনী ব্যবস্থা আজও আছে অব্যাহত। এমন বাস্তবতার ভিত্তিতেই কাদির মিয়াকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছে নিজামত মুহুরী। মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কে সে নিজ যোগ্যতা-ক্ষমতার বলেই যেন বিয়াইকে অভয় দিয়ে বলে :

> বেয়াই তোমার কোন ডর নাই। দেখ আমি কি করিতে পারি। একবার দেখ—মিছা মামলা লাগাইছে, আমিও মিছা সাক্ষী লাগামু। মামলা নষ্ট ত করুমই, তার উপর তার নামে লোক লাগাইয়া গরু চুরি করাব, না হইলে খামারের ধান চুরি করার পাল্টা মামলা লাগামু তবে ছাড়ুম। তুমি কিছু কইর না, খালি খাড়া হইয়া দেখ।[২৮]

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হতবিহ্বল কাদির মিয়ার মতো সরল কৃষকের সঙ্গে ধোকাবাজি করে, কখনও কখনও তাদের নামে মিথ্যা মামলা করে, শোষণ ও অত্যাচারের মাধ্যমে ধনী হওয়াই মহাজনদের একমাত্র লক্ষ্য। দরিদ্র জেলে-কৃষকদের অন্তর্জীবন দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ। সে সমাজে তাই নেই তেমন কোন আনন্দ-উৎসবের আয়োজন। একমাত্র নৌকা বাইচই হয়ে ওঠে তাদের জন্যে বাৎসরিক উৎসবের বিষয়।

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগ্রহী ছাদির মিয়া। পিতা কাদির মিয়ার আপত্তি থাকলেও শেষে সে-ই চারশত টাকা ছাদির মিয়াকে দিয়েছে নৌকা তৈরির জন্যে। ইচ্ছারাম মালো ও ঈশ্বর মালোর মাধ্যমে পাহাড়ী কাঠ সংগ্রহ করেছে ছাদির মিয়া। ইচ্ছারাম ও ঈশ্বর মালো অনেক পরিশ্রম করে পাহাড় থেকে কাঠ সংগ্রহ করে। তারা পাহাড় থেকে বয়ে আসা পানির স্রোতের সঙ্গে কোমরে গাছের গুড়ি বেঁধে তা নিয়ে আসে লোকালয়ে। বস্তুত, কঠোর পরিশ্রম তাদের নিত্য দিনের ব্যাপার। সব সময়ই তাদের মরণপণ জীবন সংগ্রাম করতে হয়। এ সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> ...বরং তার আড়ালে লুকানো মালোদের প্রচ্ছদে মানুষ ও অন্ত্যজ মানুষের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও প্রতিরোধের কাহিনী।[২৯]

---

২৮. ঐ, পৃ. ১১৯.
২৯. শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৭

Dhaka University Institutional Repository

পুরনো পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা কাঠ চেরাইয়ের পদ্ধতিও কিছুটা পুরনো যুগের। যান্ত্রিক যুগের সব সুফল তখনও পৌঁছায় নি মালোদের জীবনে। ফলে কাঠ চেরাই করতে হতো হাতে ঠেলা করাত দিয়ে। তখন করাতির কাজ করে একদল মানুষ জীবিকা অর্জন করতো। এ রকম এক দল করাতির মাধ্যমে ছাদির মিয়া কাঠ চেরাইয়ের কাজ শেষ করে। তার পর সে তিতাসের তীরে চালাঘর তৈরি করে দেয় কাঠ মিস্ত্রীদের। অস্থায়ী এই চালাঘরের মধ্যেই তৈরি হয় বাইচের নৌকা। সে নৌকা সাধারণ নৌকার মতোন সাদামাটা নয়, তার থাকে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য। নৌকার মেরুদণ্ড পত্তন করা প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা আছে :

> নৌকার মেরুদণ্ড মাত্র পত্তন করা হইয়াছে। সেই মেরুদণ্ডের ডগা আড় হইয়া আকাশ ঠেলিয়া কতখানি যে উপরে উঠিয়াছে, ... মিস্ত্রী দুইজন অত উঁচুতে গিয়া বসিয়াও কেমন হাতুড়ি পিটাইতেছে, আর পেরেক ঠুকিতেছে।[৩০]

কিছুদিনের মধ্যে মিস্ত্রীরা নৌকার কাজ শেষ করে মজুরী বুঝে নিয়ে চলে যায়। নৌকার দু পাশে সাজ সজ্জার ব্যবস্থা। লতা-পাতা-সাপ-ময়ূর এবং এক জোড়া করে তলোয়ারের ছবি আঁকা হয়। পাহাড় থেকে কাঠ বহনকারী দুই মালো, কাঠ চেরাইয়ের করাতি, কাঠ মিস্ত্রী, এমন কি নৌকায় সাজ-সজ্জায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ সবাই তিতাস তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ঐ সমাজের নানা পেশার মানুষ অর্থের বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করেছে। কিন্তু তাদের সৃষ্টিধর্মিতায় শিল্পগুণ সম্পন্ন হয়েছে ছাদিরের নৌকা। নির্দিষ্ট দিন নৌকা বাইচে অংশ নেয়া সব দলই উপস্থিত হয় নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে। এবং তিতাসের দুই তীরে উপস্থিত হয় এলাকাবাসী ; কেউ বা আসে নৌকায় করে নদীর মধ্যে বসে নৌকা বাইচ দেখতে। এটি তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ঐতিহ্যভুক্ত ; নিত্য অভাবী মালোদের জীবনে এই নৌকা বাইচ একটি বড়ো ধরনের বিনোদন।

নৌকা বাইচের আনন্দ উপভোগ করতে তিতাসের কাছাকাছি গ্রাম-গঞ্জ থেকেও এসেছে অনেকে। নৌকায়ও এসেছে কেউ কেউ। বনমালী এসেছে নৌকায় তার বোন উদয়তারা, অনন্ত ও আরও অনেককে নিয়ে। বাসন্তীও এসেছে নৌকায় চড়ে। এ দুটো নৌকা যেন কেমন করে পাশাপাশি এসে গেল এবং তখন অনন্তকে চোখে পড়লো বাসন্তীর। অনন্তকে কেন্দ্র করে এই নদীর বুকেই উদয়তারা ও বাসন্তীর মধ্যে ঘটে এক অপ্রীতিকর ঘটনা। মাতৃস্নেহের কারণে

---

৩০. অচিন্ত্য বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

অনন্তকে উদয়তারা নিয়ে গেছে তার আশ্রয়ে। সঙ্গত কারণেই বাসন্তীর মধ্যে জন্মেছে রাগ-ক্ষোভ-ঈর্ষা। ফলে কথাকাটির এক পর্যায়ে উদয়তারা ও তার সঙ্গীরা বাসন্তীকে বেদম প্রহার করে। সন্তানের মতো অনন্তকে ঘিরে এই অপমান বাসন্তীর মনে দিয়েছে গভীর দুঃখ। এ প্রসঙ্গে সে কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় নি, বরং পালিয়ে থেকে আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে চেয়েছে। এমন কি, সে এ গ্রাম ছেড়ে অন্য কোন গ্রামে চলে যাওয়ার কথাও ভেবেছে। কিন্তু অবদমিত হওয়ার মতোন নারী নয় সে ; সংগ্রামই তার প্রবণতা। যেন তার রক্তে বাস করে এক বিদ্রোহী নারী। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের এক জায়গায় বলা হয়েছে :

সুবলার বউ এর মধ্যে বিপ্লবী নারী বাস করে, সে দমিতে জানে না।[৩১]

বাসন্তীর প্রতিবাদ-প্রতিশোধের মধ্যে আছে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার বাসনা। বাসন্তীর ডাকে মালোর ছেলেরাও সাড়া দেয় বিদ্রোহী চেতনায়। তারাও ভাবতে শুরু করে আত্মসম্মানের কথা। বামুন-কায়েতদের নোংরা ব্যবহার ও কাজের প্রতিবাদ করবে তারা। বৃহত্তর গোষ্ঠী-স্বার্থকে উপলক্ষ্য করেই পাড়ার তরুণরা এক রাতে এক তবলা বাদককে মার দেয়। এরই সূত্র ধরে মালো-জেলে আর বামুন-কায়েতদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়। এর পর থেকেই কৌশলে মালোদের সর্বনাশ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় বামুন-কায়েতরা। তারা হাতে নয়, বুদ্ধিতেই মালোদের শায়েস্তা করার পরিকল্পনা করে।

শিক্ষার আলোহীন সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন মালোরা। ফলে তারা একে অপরকে ছোট-খাট কারণে করতো অবিশ্বাস, ভাবতো শত্রু। এবং সে শত্রুতার রেশ চলে যেতো সর্বত্র। এমন কি, নৌকা বাইচের উৎসবেও। রাগের মাথায় একটি দৌড়ের নৌকা অন্য একটি নৌকার ওপর তুলে দিতো অনায়াসে। এতে ভেঙে যেতো নৌকাটি। এভাবেই নৌকা বাইচের আসরে কে যেন শত্রুতা করে ভেঙে দিয়েছে ছাদির মিয়ার নৌকা। নৌকাডুবিতে ছাদির মিয়া রক্ষা পায় বনমালীর সাহায্যে। পূর্ব পরিচিত বনমালীকে ছাদির মিয়া তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং জানায় গভীর কৃতজ্ঞতা।

বনমালীর আশ্রয়েই বালক অনন্ত স্কুলে পড়তে যায়। অনন্ত মেধাবী। তার শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখে খুশী হয় বনমালী, মালোরা। তারা ভাবে তাদের আগামী সুদিনের কথা। অনন্ত পড়া-লেখা শিখলে তাদের আর কারও কাছে মাছের হিসাবের জন্যে যেতে হবে না। কিন্তু তাদের এই আশা

---

৩১. ঐ, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে রূপ পায় নি। প্রতিবেশী নাপতানী অনন্তর মনে জাগিয়ে তোলে উচ্চ শিক্ষার আশা। উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা মালোদের গ্রাম-গঞ্জে নেই। ফলে অনন্ত মালোপাড়া ছেড়ে চলে যায় কুমিল্লা শহরে। এই চলে যাওয়ায় মাধ্যমেই অনন্ত হয়েছে শিক্ষিত ; নইলে জেলেদের জীবনবৃত্তের বাইরে যাওয়া হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হতো না। শেষ পর্যন্ত অনন্ত শিক্ষিত হলেও তার কোন প্রভাব পড়ে নি জেলেদের সমাজে। অনন্ত দিতে পারে নি সমাজ পরিবর্তনের নেতৃত্ব। অন্য দিকে ক্রমে ক্রমে শহরের শিক্ষিত কায়েত-বামুনদের প্রভাব পড়তে থাকে মালো সমাজে। যেন পরিকল্পিতভাবেই কায়েত-বামুনরা তাদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে মালোদের জীবনে। এই প্রভাব প্রথমে আঘাত করে মালোদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে, পরবর্তীতে তা গ্রাস করে তাদের আর্থিক জীবন। এর ফলে ভেঙে যায় মালোদের সমাজের সংহতি। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> অর্থনৈতিক সংকটের চেয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্নতাকেই তাদের অধঃপাতের কারণ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে।[৩২]

মালোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভাঙতে সাহায্য করেছে তাদের স্বগোত্রীয় তামসীর বাপ। তার বাড়িতেই মালোপাড়ায় প্রথম ওঠে যাত্রাদল। তামসীর বাপ বামুন-কায়েতদের সঙ্গে মিশতে থাকে। এতে সে বোধ করতে থাকে গৌরব। সে ভুলে যায় মালোদের স্বকীয়তা ও স্বার্থ। তার এ মনোভাব ও কার্যপ্রণালীর সুযোগ নিয়ে তারই বাড়িতে বসে পরিকল্পনা গৃহীত হয় কি ভাবে মালোদের ক্ষতি করা যায়। উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে বলা আছে :

> যেদিন বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল তার পরের দিন তারা তামসীর বাপের বাড়িতে আরও জাঁকিয়া বসিল। এতদিন ছিল শুধু তবলা, এবার আসিল হার্‌- মনিয়াম, বাঁশি ও বেহালা...অভিভাবকেরা ছেলেদের যাত্রাদলে যোগ দিতে নিষেধ করিল। তারা বিড়ি খায়, ঘাড়-কাটা করিয়া চুল ছাঁটে, গুরুজনের সামনে বেলাহাজ কথা বলে। ঠাকুর দেবতার গান ছাড়িয়া পথঘাটে সখীর গানে টান দেয়, এতে তাদের স্বভাবচরিত্র খারাপ হইয়া যায়।[৩৩]

বামুন-কায়েতদের প্রচেষ্টার ফলে যাত্রাদলের গ্রহণযোগ্যতা সহজেই বৃদ্ধি পায়। কথা-সংলাপ, নাচের তাল, গানের সুর সবই মালোদের আকৃষ্ট করে। সে কারণেই মালোদের

---

৩২. ঐ, পৃ. ১৯৩
৩৩. ঐ, পৃ. ১৩৮, ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে পক্ষ হয়ে যায় দুটো। এক পক্ষে তারা যারা পছন্দ করে এই যাত্রাগান ; অন্য পক্ষ যাত্রাগানের বদলে তাদের পূর্বপুরুষদের ভক্তিমূলক পূজা-পার্বণের গান, বৈষ্ণব প্রভাবিত গান পছন্দ করতে থাকে। তাদের ধারণা এ সব ভক্তিমূলক গান সুরুচিপূর্ণ এবং এর ভাব অন্তরের গভীরে বহমান। সাংস্কৃতিক ভাবনার ক্ষেত্রে বিভেদের সুযোগে মালোপাড়ায় লাম্পট্য করতে চায় পাটনীপাড়ার অশ্বিনী। সে সুবলার বউয়ের ওপর নজর দেয়। বাসন্তী মঙ্গলার বউয়ের কাছ থেকে এ তথ্য জেনেছে এবং তার প্রমাণও পেয়েছে। অশ্বিনী সুবলার বউকে দেখে গানের সুর ধরে। গানের কথাগুলো নিম্নরূপ :

> যেই না বেলা বন্ধুরে বাঁশিটি বাজাইয়া যাও, সেই বেলা আমি নারী খাই। শাশুড়ি ননদীর ডরে কিছু না বলিলাম তোরে, অঞ্চল ভিজিল আঁখির জলে।[৩৪]

বাসন্তীর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অশ্বিনী এই গান গেয়েছে। সুবলার বউ প্রতিবাদ জানাতে না পারলেও, বাসন্তী চিৎকার করে অশ্বিনীর এই অভব্যতার প্রতিবাদ করেছে। বাসন্তীর প্রতিবাদের সঙ্গে একাত্ম হলো সমাজ সচেতন রামদয়াল, গুরুদয়াল, মোহন প্রমুখ। তারা এ অপমানের একটা বিহিত করতে বদ্ধ পরিকর। কিন্তু অশ্বিনীর গানের সুর অনেককেই ভুলিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয় রামদয়াল, গুরুদয়ালকেও। শুধু মোহন জেগে ওঠে সাহসী হয়ে। যাত্রার মত্ততায় ভুলেছে যারা তারা ভুলেছে নিজেদের গৌরব অহংকার। তারা কালের স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটো। নিজেদের পূর্বপুরুষদের গৌরব ও আদর্শ-বিরোধী, কথা-সর্বস্ব, চটুল এক ধরনের গান হয়েছে মালোদের একাংশের কাছে সমাদৃত। এতদিন যারা ছিলো সমাজ-সংস্কৃতির রক্ষক, তাদের অনেকেই ঝুঁকে পড়েছে যাত্রাদলের দিকে। কালোবরণের বাড়িতে যাত্রাগান হওয়ার অর্থ মালোদের বুকের ওপর যাত্রাগানের আসর বসানো। গ্রামের অন্যান্য গণ্যমান্যরা কালোবরণকে অনুরোধ করেছে এ যাত্রাগানের অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার জন্যে। কিন্তু তাতে কাজ হয় নি। শেষ পর্যন্ত কালোবরণের বাড়িতেই যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারপর পুরনোপন্থী বাসন্তী-মোহন আশায় বেঁধেছে বুক। গাঁয়ের অর্ধেক মানুষই যে প্রাচীনপন্থী, এটাই তাদের ভরসা। পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্য হারানোর সম্ভাবনায় তারা শঙ্কিত। মোহন ও কালোবরণ দুই পক্ষের প্রতিনিধি যেন। মোহনের বাড়িতে গান চলে ভক্তিমূলক, পূর্বপুরুষদের আদর্শ, ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে। আর কালোবরণের

---

৩৪. ঐ, পৃ.১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িতে চলে আধুনিক ঠুন্‌কো ধারার গীত। দুঃখের বিষয়, বেশির ভাগ লোকই গান শুনতে কালোবরণের বাড়ি যায়। সমাজ পরিবর্তনের এই নির্মমতা মেনে না নিয়ে উপায় নেই মোহনের। এ বিষয়ে উপন্যাসটিতে বলা হয়েছে :

> মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোক সাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায়-পার্বণে, হাসি-ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। ...যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে।[৩৫]

মোহন ও বাসন্তী রক্ষা করতে পারে নি পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতি, যাতে মালোদের জন্যে 'নির্মম বাস্তবতা ও বৈরী পরিস্থিতিতেও...জীবনের সুস্থ ও সৎরূপ প্রকাশিত।'[৩৬]

এ সত্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজে। মোহন-বাসন্তী যেন তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে মালোদের সংস্কৃতি রক্ষায় হয়েছিলো তৎপর। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> Titas has been based on a celebrated autobiographical Bengali novel of same tittle by Addaita Mallabarman. The intricately woven story revolves round the lives of a fishing community on the banks of the river Titas of which Mallabarman himself has been a member. The narrative is full of touching details about the day to day lives of these simple yet receptive people living on the river.[৩৭]

মালোদের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় তাদের সামাজিক বিপর্যয়কে করেছে ত্বরান্বিত। তাদের সব সামাজিক বন্ধন হয়েছে শিথিল। পাড়ার ছেলেরা মুরুব্বীদের সম্মান করে না; সিগারেট টানে, আয়-রোজগার সম্পর্কে হয়ে পড়ে উদাসীন। যাত্রাপালার অভিনেতাদের সঙ্গে পাড়া ঘুরে ঝি-

৩৫. ঐ, পৃ. ১৪০
৩৬. শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৬
৩৭. Alamgir Kabir, Film in Bangladesh, Dhaka, 1979, p.64

Dhaka University Institutional Repository

বউদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটানো মালোর ছেলেদের অভ্যাসে পরিণত হয়। মালো মেয়েরাও অভিনেতাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ খোঁজে। মেয়েরা সুযোগ পেয়েই ছুটে যায় মনোহরী দোকানে; বাড়ে তাদের বিলাসিতা। এমন কি বাইরের ছেলেরা এসেও মালো মেয়েদের দেখে যৌনতা উদ্দীপক কথা বলে। নৈতিকতা মালোদের জীবন থেকে বিদায় নিতে শুরু করে। নতুন সাংস্কৃতিক ধারার আগমনে মালো সমাজে যে পরিবর্তন সূচিত হয় সে সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> তাদের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। তাদের নিজস্ব একটা সামাজিক নীতির বন্ধন ছিল, সেইটিও ক্রমে ক্রমে শ্লথ হইয়া আলগা হইয়া গেল। এক সঙ্গে কোন কাজ করিতেই তারা আর তেমন জোর পাইত না। সামান্য বিষয় নিয়া তারা পরস্পর ঝগড়া করিত। এমন কি, ঘাটে নৌকা ভিড়াইবার সময়, কে আগে ভিড়াইবে এই লইয়া মারামারি পর্যন্ত হইত। জাল ফেলিবার সময় কার আগে কে ফেলিবে এ নিয়া তীব্র প্রতিযোগিতা হইত। তারই পরিণতিতে তাদের প্রধান দুইটি দলের মধ্যে মাথা ফাটাফাটিও হইত।[৩৮]

মালোদের গোষ্ঠীগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে ঋণদান কোম্পানির প্রতিনিধি বিধুভূষণ পাল। আর্থিক সংকেট পড়ে মালোরা অনেকেই ঋণ নিয়ে সময় মতো ফেরত দিতে পারে না। ফলে কোম্পানি ঋণ আদায়ে ব্যবহার করেছে নানা কৌশল। শুধু কৌশল নয়, রীতিমত নিষ্ঠুরতারও পরিচয় দিয়েছে। তারা ঋণ গ্রহীতাদের প্রতি এমন আচরণ করেছে যা সত্যিই হৃদয় বিদারক। কিন্তু এই নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাহস নেই তাদের দু কথা বলার। সামাজিক ঐক্য ভেঙে ফেলার ফলে তারা হয়ে পড়ে আরও অসহায়। ঋণ কোম্পানির নির্মম আচরণ সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে:

> বুড়াবুড়া মালোদের দাড়ি ধরিয়া টানিয়া জলে নামাইল। চোখ ঘুরাইয়া বলিল, 'ক' তোর কাছে কত আছে।' শীতকাল। তিতাসের জলে দাঁড়াইয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতেও তাদের মুখ দিয়া মিথ্যা কথা বাহির হইত না। ...কেউ বলিত দুই টাকা আছে : কেউ বলিত এক টাকা বারো আনা আছে। কেউ বলিত কিছুই

৩৮. অচিন্ত্য বিশ্বাস, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

নাই। সব ছাঁকিয়া তুলিয়াও তেমন কিছুই আদায় হইল না দেখিয়া শেষে তারা ঘরের থালা ঘটি বাটি, সূতার হাঁড়ি জালের পুঁটুলি বাহির করিয়া নিয়া ঘোড়ার গাড়িতে তুলিয়া চলিয়া যাইত। এর পর পড়িয়া যাইত কান্নাকাটির ধুম। এমন যে গ্রামের বুড়া রামকেশব, যার ছেলে পাগল হইয়া মরিয়াছে, যাকে জীর্ণ দেহ টানিয়া টানিয়া প্রতিদিন মাছ ধরায় যাইতে হয়, তাকেও তারা রেহাই দিল না। তার দাড়ি ছিল লম্বা। ধরিবার বেশ সুবিধা হওয়ায় বিধু পাল তাকেই জলে নামাইয়া পাক খাওয়াইছিল সব চাইতে বেশি।[৩৯]

যখন সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে মালোদের সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত, মহাজন, ধনী শ্রেণীর শোষণ-শাসন-ষড়যন্ত্রে তারা দিশাহারা, ঠিক তখনই প্রকৃতিও বৈরী হয় তাদের প্রতি। সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার এমনতর পটভূমিতে শুধু তিতাসই যেন তাদের একমাত্র ভরসা। তিতাসের বুকে মাছ ধরেই চলে তাদের জীবন যাপন। মায়ের মতোই মালো জেলেদের বুকে ঠাঁই দিয়েছে তিতাস নদী। সেই তিতাসের গভীরতা কমতে বসেছে। এ পরিস্থিতি মালোদের জন্যে জীবন বিনাশী সত্য হলেও তাকে অতিক্রম করার কোন বুদ্ধি তাদের ছিল না।

তিতাস ভরতে ভরতে কোথাও কোথাও দাঁড়ালো গলা পানি। নদী ভরাট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে উপন্যাসে আছে :

এখান হইতে আধ মাইল দূরে যাত্রাবাড়ির টেক। নৌকা লইয়া তারা সেখানে গিয়া বাঁশ ফেলিল। এই টেক হইতে শুরু করিয়া এই অভাসিত চর উজানে কোথায় যে শেষ হইয়াছে, তার কিনারা করিতে পারিল না। যারা স্নান করিতে নামিয়াছে, তাদেরই একজন বারপানির নেশায় পা টিপিয়া টিপিয়া একেবারে মাঝ নদীতে আসিয়াছে দেখা গেল। মাঝ নদীতে তার মোটে গলাজল। এমন আশ্চর্য ঘটনা তারা জীবনে এই প্রথম দেখিয়াছে।[৪০]

বলা বাহুল্য, নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলেরা। জেলেদের সঙ্গে জলের সম্পর্ক অতি সুগভীর। জল নেই, মাছ নেই, ফলে জেলেও নেই। মালোদের জীবনের এই

৩৯. ঐ, পৃ. ১৪৬
৪০. ঐ, পৃ. ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতির একটা উপায় হয়ত হতো, যদি তারা জেগে ওঠা চরের জমির দখল পেত। কিন্তু তারা চরের জমি পেল না। লাঠিয়ালদের সাহায্যে তা দখল করে নিয়েছে স্থানীয় ধনীরা। পরিস্থিতি এমনই ভয়ঙ্কর যে, রামপ্রসাদ মালো চরের জমি দখল করতে গিয়ে প্রাণ হারালো। এ বিষয়ে অবশ্য মালোদের ঐক্যবদ্ধ কোন প্রচেষ্টাও ছিলো না। কারণ জমি দখল করতে গিয়ে নতুন কোন ঝামেলায় জড়াতে প্রস্তুত ছিলো না তারা। অন্য দিকে কোন ঝামেলায় জড়ালে তা থেকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। ফলে, অনায়াসেই তারা মেনে নিলো ভূমি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চনা। তাদের জীবনে দুঃখভোগ ছাড়া যেন অন্য কিছু নেই। জোতদারদের কাছ থেকে ভূমিহীন কৃষক করমালি বন্দালীও পায় নি এতটুকু জমি।

মালোদের জীবনে নেমেছে মহাবিপর্যয়। মৃত্যুর গুহা থেকে বাঁচার তাগিদ আক্রমণ করেছে তাদেরকে ; কিন্তু কোন উপায় নেই। এর মধ্যেই যে যে ভাবে সম্ভব পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। কেউ চলে গেছে গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও। কেউ ধান কাটার শ্রমিক হয়ে বদলে নিয়েছে পেশা। কেউ চলে গিয়েছে বড় নদীর ধারে, সেখানে বড় মাছ ব্যবসায়ীদের জন্যে মাছ ধরে জীবন বাঁচানোর আশায়। কেউ নিয়োজিত হয়েছে শহর থেকে মালের বস্তা মাথায় করে আনার কাজে। আর গোপনে গোপনে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে অসহায় মালো নারীরা। বিপর্যস্ত জীবন পরিস্থিতিতে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছে অনন্তবালারা। চলে যাওয়ার আগে অনন্তবালার বাবা বনমালীকে পাঠিয়েছিলো কুমিল্লা শহরে, অনন্তকে খুঁজতে। অনন্ত বালা যেন অনন্তর জন্য অনন্ত কাল অপেক্ষা করবে। সে জন্যে বিয়ের কোন বরই অনন্ত বালার পছন্দ হয় না, সবাইকে ফিরিয়ে দেয় সে। ছোট বেলায় মা-মাসীদের আলোচনায় অনন্তবালার মনে গভীর দাগ কেটেছিলো অনন্তের সঙ্গে সম্ভাব্য বিয়ের কথা। অনন্তবালার মা-মাসী ও অন্যান্যরা অনন্তকে তার আগামী দিনের বর বলে মনে করেছিলো। সে বয়সে অনন্ত বর-বউ প্রসঙ্গে ছিলো অবুঝ, অবুঝ ছিলো অনন্তবালাও। তবু শৈশবের সঙ্গী অনন্তের ফিরে আসার প্রতিশ্রুতিই অনন্তবালার একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ালো। সে প্রতিশ্রুতির কোন ভিত্তি নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। ফলে অনন্তর জন্যে দীর্ঘ অপেক্ষায় সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে, অনন্তবালাকে কেন্দ্র করে তার মা-বাবা, পাড়া-পড়শীর অনেক কটূক্তিজনিত মন্তব্যও

Dhaka University Institutional Repository

সে শুনেছে। নিরুপায় হয়ে অনন্তকে খুঁজতে বনমালীর যেতে হয় কুমিল্লা শহরে। বনমালী অনন্তকে খুঁজে পেয়েছে এবং তার পাঠানো উপহারও এনেছে উদয়তারা, বাসন্তীর জন্যে। কিন্তু অনন্তবালা প্রসঙ্গে সে একটি কথাও বলে নি, বরং বনমালীও আশঙ্কা করেছে, অনন্ত হয়তো-অনন্তবালাকে চিনতে পারবে না। অনন্তবালার এই এক তরফা গভীর প্রেম শেষ পর্যন্ত পথ খুঁজে পেলো না। অনন্তবালাদের চলে যাওয়ার পথ অনুসরণ করেছে উদয়তারাও। তার স্বামীর সঙ্গে চলে যাওয়ার সময় অসহায় ভাইকে ফেলে যেতে তার হৃদয় ভেঙে যেন খান খান হয়ে যায়। তবু তাকে চলে যেতে হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে নৌকায় চলে যাওয়ার সময় সে লক্ষ্য করেছে মালোদের ছেড়ে যাওয়া বাড়ি-ঘরের হাহাকার করা শূন্যতা। এ প্রসঙ্গে উদয়তারার স্বামীর কথাগুলো উল্লেখ করা যায় :

> গাছগাছালি আছে, কিছুদিন আগে যেখানে যেখানে ঘর ছিল তার অনেকই এখন খালি ভিটা। ঘাটে আগে সারি সারি নৌকা ছিল, এখন আর নাই। মাঝে মাঝে দুই-একটা কেবল বাঁধা রহিয়াছে। যেখানে তারা জাল শুখাইত, এখন সেখানে গরু চরিতেছে। ঘরগুলি কোথায় লুকাইয়াছে, ভিটাগুলি নগ্ন। তার উপরে বাঁশের খুঁটির গর্ত, ভাঙা উনানের গর্ত, শিলনোড়া রাখার সিঁড়ি, মাটির কলসী রাখার সিঁড়ি আধ-ভাঙ্গা পড়িয়া আছে। উঠানে ঝরা পাতার রাশি, তুলসীমঞ্চ ভাঙ্গিয়া শতখান। প্রদীপ দেখাইবার কেউ নাই।[৪১]

মৃত্যু, স্থানান্তর, পেশান্তর ও অন্যান্য কারণে মালোদের বসত এলাকা যখন প্রায় লোকশূন্য হয়ে পড়ে, তখনও গ্রামের অন্য সম্পদশালীরা কোন সহানুভূতি দেখায় নি। একমাত্র কৃষক কাদির মিয়াই খুলে দিয়েছিলো মালোদের জন্যে তার ধানের গোলা। এমন কি বিরামপুর পর্যন্ত এসে অনন্তও খোঁজে নি তার বাসন্তী মাসীকে। মৃতপ্রায় বাসন্তীর মনে সন্তানতুল্য অনন্ত যতই জাগরুক থাকুক না কেন, আসলে তা অর্থহীন প্রতীয়মান হয়েছে। সত্য শুধুই সামনের বিস্তৃত চরের বুকে বেড়ে ওঠা ধান গাছের চারা এবং মালোদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। তারপরও বাসন্তীর মনে ছিল স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে সন্তানতুল্য অনন্তর উপস্থিতি। ঘোরের মধ্যে সে দেখে, অনন্ত তার মালসায় ভাত

৪১. ঐ, পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

তুলে দিয়েছে। হঠাৎ জলভরা লোটা হাত থেকে মাটিতে পড়ার শব্দে সংবিৎ ফিরে পায় বাসন্তী। বাসন্তীর সমাজ-জীবন থেকে অনন্তর অবস্থান অনেক দূরে। সেই দূরের কথাই একজন সমালোচক বলেছেন এ ভাবে :

> অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে ঔপন্যাসিক বুঝতে পেরেছিলেন, অনন্ত একলা শিক্ষিত হয়েছিল বলে বাবুদের সঙ্গে মালোদের যে ব্যবধান তার সঙ্গেও তার মাতৃসমা বাসন্তী মাসীরও সেই একই ব্যবধান রচিত হয়েছিল।[৪২]

৪২. শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পসাফল্য : তিতাস একটি নদীর নাম

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মূলত অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনই রূপায়িত হয়েছে। তিতাস নদী-তীরে বসবাসকারী মালোদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা-চিত্রের সমন্বয়ে তাদের জীবনের সামগ্রিক রূপটি যেন এক বিশাল ক্যানভাসে এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। ফলে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-আচরণ, রুচি-সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুভূতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে স্থান পেয়েছে এ উপন্যাসে। মালোদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন তিতাস নদী। তিতাসের সঙ্গে তাদের জীবন সম্পর্কের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র তৈরি হয় নিত্য, তারই আলেখ্য এ রচনা। ফলে এ উপন্যাসের কাহিনীও যেমন তিতাসকে নিয়ে আবর্তিত, চরিত্রগুলোর বিকাশও ঘটেছে তিতাসকে অবলম্বন করে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রতিটি অংশেরও রয়েছে দুটি করে ভাগ। প্রথম অংশের ভাগ দুটো হলো যথাক্রমে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'প্রবাস খন্ড'; এবং এর পর দ্বিতীয় অংশের দু ভাগে হচ্ছে 'নয়াবসত' ও 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ'; তৃতীয় অংশের ভাগ দুটোর নাম 'রামধনু' ও 'রাঙা নাও' এবং সব শেষ অংশের ভাগ দুটোর নাম 'দুরঙা প্রজাপতি' এবং 'ভাসমান'। চারটি অংশের আটটি ভাগের পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসটির কাহিনী। কোন কোন উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান কোন্‌টি অপ্রধান সেটি নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তবে অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে এ দু উপাদানেরই সমন্বয় ঘটে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের ক্ষেত্রে উপন্যাস নির্মাণের শর্তাবলি নিখুঁতভাবে পালিত হয়েছে, এমনটি বলা কঠিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কাহিনী বা চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে আকস্মিকতা উপাদান যত কম ব্যবহার করা যায় ততই উত্তম। টমাস হার্ডির মতো অনেক খ্যাতনামা বাংলা ঔপন্যাসিকই—যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র —আকস্মিকতা উপাদান বা কাকতাল বারবার ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। তার ফলে কাহিনী, ঘটনা বা চরিত্রের বাস্তবতা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে যায়। তার পরও পাঠকমন অনেক সময় যেন কখনও কখনও প্রস্তুতই থাকে কাকতালের জন্যে। সেটি বিবেচনায় এনে, কোন কোন কাকতালীয় ঘটনা বা অনুষঙ্গ উপন্যাস শিল্পে সহনীয় হিসেবে ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে

একজন সমালোচকের বক্তব্য উল্লেখ করা যায় :

> অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'...এতো কাকতাল ব্যবহার করা হয়েছে। এত বেশি কাকতাল আছে, এবং এমনই তাদের রূপ ও বিভঙ্গ যে কাকতাল থেকেই মূল টানাপোড়েনের একটা সাজ, একটা ডিজাইন তৈরি হয়েছে।[১]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাস নদীর তীরের জেলেদের জীবনের নানা স্বপ্ন-সংগ্রাম-ব্যর্থতা বিদীর্ণ ছবি অনেকগুলো কাকতালের মাধ্যমে আঁকা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাস থেকে ঘটনার এমন আকস্মিকতা বা কাকতালের উদাহরণ উপস্থাপন করা যেতে পারে :

ক. দলের ভিতর সেই মেয়েটিকেও দেখা গেল। মার পায়ের দিকে তাকাইয়া সেও তালে তালে পা ফেলিতেছিল। কিশোরের সহিত চোখাচুখি হইয়া সে তাল কাটা পড়িল। পা আর উঠিতে চাহিল না। ...অদূরে দাঁড়াইয়া কিশোর তাহাকেই দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া যেন গ্রাস করিতেছে।

...ইহারই পটভূমিকায় কিশোর মূর্ছিতা মেয়েটাকে পাঁজা-কোলা করিয়া তুলিয়া ঘন ঘন হাঁকিতে লাগিল, 'এর মা কই, এর মা কই ? সে অজ্ঞান হইয়া গেছে। জল আন, পাংখা আন।'

...কিশোরের মনে একটা অস্বাভাবিক আশা জাগিয়াছে। সেই মেয়েটির সঙ্গে তার বিবাহ হইবে। আশাটা আরও অস্বাভাবিক এইজন্য : সে নিজে কাউকে কিছু বলিতে পারিবে না, তাকেই বরং কেউ আসিয়া বলুক। মনে মনে সে কল্পনার রঙ ফলায় : আচ্ছা এমন হয় না, মেয়ে পক্ষ কেউ আসিয়া তাকে বলে, 'অ, কিশোর, এই কন্যা তোমারে দিলাম, লইয়া গিয়া বিয়া কর।[২]

১.দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১১৭

২. অচিন্ত্য বিশ্বাস, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৩০-৩১

খ. পা টিপিয়া টিপিয়া চলার শব্দ আর চাপা গলার ফিস্‌ফাস্‌ কথা বলার আওয়াজ প্রথমে তিলকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। নাঃ, কিশোরটা বেহায়ার হদ্দ। তাকে নিয়ে আর পারা যাইবে না। বিরক্ত হইয়া তিলক পাশ ফিরিয়া শুইতেছিলো। এমন সময় পায়ে জোরে একটা টান পড়ায় তার তন্দ্রা পাতলা হইতে হইতে একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। পুরা সম্বিৎ পাইয়া দেখে, ছইয়ের ভিতরে শুইয়াছিল, তারা তিনজনেই এখন ছইয়ের বাইরে। আর তিনজনেরই পা নৌকার গুরার সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা। নৌকা আর সেই খাড়ির ভিতরে নাই। হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে নয়া গাঙের সেই সর্বনাশা মোহনার দিকে।

তিলক চিৎকার করিয়া উঠিল, 'অ কিশোর, আর কত ঘুমাইবা, চাইয়া দেখ সর্বনাশ হইয়া গেছে।' এক ঝটকায় পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া কিশোর এক নিঃশ্বাসে ছইয়ের ভিতরে গিয়া পাটাতন খুলিল। সে নাই।[৩]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের উক্তি এ রকম :

> বস্তুত অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাসই পেরেছে বদ্বীপভূমির...নদ-চুম্বিত গঠনশীল-নিত্য জায়মান ও চকিতে ভেঙে যাবার অনিশ্চিত জীবনের ছকটিকে আয়ত্ত করতে।[৪]

মালোদের জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছে উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্র। এইগুলোর আগমন-প্রস্থানের সময়কালই যেন কাহিনীর ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। মালোদের অনির্দিষ্ট জীবনপ্রবাহ ও অনির্দিষ্ট নদীপ্রবাহ এ উপন্যাসের গঠন শৈলীর উপরও যেন প্রভাব ফেলছে। সে কারণেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> ...উপন্যাসটির গঠন নির্দোষ নহে। উহার ঘটনা বিন্যাস এককেন্দ্রিক নহে, বহুস্তর বিভক্ত ; উহার প্রধান চরিত্রসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন। উহার ঘটনা পরিণতিও নানা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একভাব-সূত্র-গ্রথিত আখ্যানের যোগফল, কোন বিশেষ চরিত্রের অনিবার্য ক্রমবিকাশাভিমুখী নহে।[৫]

তিনি আরও বলেছেন :

> লেখকের প্রকৃত আকর্ষণ নদীতীরের গ্রাম সমাজের ধর্মকেন্দ্রিক ও উৎসবছন্দ গ্রথিত জীবনযাত্রায়, সরল বিশ্বাসী মালো ও কৃষকদের স্নিগ্ধশান্ত জীবন স্পৃহায়, ধর্ম বিশ্বাস উদ্ভূত,

---

৩. ঐ, পৃ. ৩৬
৪. ঐ, পৃ. ১৩৯
৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৭৬৭

Dhaka University Institutional Repository

বদ্ধমূল সংস্কৃতি চর্চায়। কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, এই সমষ্টি জীবনের চিত্রাঙ্কনে তাহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।[৬]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ কথারই প্রতিধ্বনি লক্ষ্যযোগ্য অন্য একজন সমালোচকের কথায় :

মানুষ ও প্রকৃতির বিশাল পটভূমিতে তিনি আসলে এই উপন্যাসে নদী ও মানুষের এক চিরায়ত যুগলবন্দী রচনা করেছেন।[৭]

সমষ্টি-জীবনের চিত্রাঙ্কনের সাফল্যই দিয়েছে এ উপন্যাসকে শিল্প মর্যাদা। একই প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য এর কাহিনী, চরিত্র, ভাষা, সংলাপ, পরিবেশ, এমন কি লেখকের জীবনবোধও। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের গঠন প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়েছে ছোট ছোট ঢেউয়ে আবর্তিত হয়ে কিছু দূর পর পর বাঁক নেয়া নদীর মতো। প্রায়ই একটি নতুন মোড়, একটি নতুন ঘটনা, একটি নতুন চরিত্র, একটি নতুন পরিবেশ। তবে সব কিছুরই উৎস এক। একটি উন্নত উপন্যাস সম্পর্কে একজন সমালোচকের ধারণাও এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

> The well made book is the book in which the subject and the form coincide and are indistinguishabley–the book in which the matter is all used in a form, in which the form expresses all the matter.[৮]

বলা বাহুল্য, ঔপন্যাসিক উপর্যুক্ত বিধান সব সময় মেনে চলতে পারেন নি। বিশাল পটভূমিতে বিস্তৃত এই কাহিনী পূর্বেই সুপরিকল্পিত এমনটি বলা কঠিন। কিন্তু গভীরভাবে মানোযোগ করলে উপলব্ধি করা যায় যে, শিল্পসৃষ্টির আগ্রহের সঙ্গে কাহিনীর যেন একটি আত্মিক মিল রয়েছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে তিতাস নদীর 'শাহী মেজাজ-উপস্থাপনের মাধ্যমে। তিতাস নদীর স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে ঔপন্যাসিক তুলনা করেছেন পাশের নদী বিজয়ের। যার তীরবাসীরা শুকনোর সময় পড়ে বিপদে। নদীর পানি সে সময় যায় শুকিয়ে। এমন কি বন-জঙ্গলের ডোবা-নালায়ও যে মাছ পাওয়া যায় না, তা নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মালোর জীবন-বেদনায় হয়েছে রূপায়িত।

---

৬. ঐ, পৃ. ৭৬৮

৭. শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ: জীবন, সাহিত্য ও অন্যান্য, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.৫৭।

৮. Percy Lubbock, The Craft of Fiction, London, 1968, P. 40.

Dhaka University Institutional Repository

তিতাস তীরবাসীদের এমন হয় না কখনও, সারা বছর সে নদীতে মাছ থাকে, থাকে পানি। এবং তীরে তীরে সোনালী ফসলও ফলে বারো মাস। তিতাস তীরের কৃষক জোবেদ আলী এবং তার কৃষিজীবী শ্রমিক করমালী ও বন্দালী। করমালী ও বন্দালীর রয়েছে আর্থিক সংকট। এ সংকট মেটাতে তাদের স্ত্রীরাও অন্যের বাড়ি কাজ করে। কৃষক ও জেলেদের জীবন ও সংসার উপন্যাসের প্রথম অংশের প্রথম ভাগে যে গতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তা পরবর্তী পর্যায়ে টেকে নি। উপন্যাসের প্রথম অংশের দ্বিতীয় ভাগে লেখক হঠাৎই যেন মালোদের ধর্মীয় অনুষঙ্গ এনেছেন : মাঘমণ্ডপের পূজায় 'চৌয়ারি' ভাসানো। দুই দুরন্ত প্রতিবেশী কিশোর ও সুবল। দরিদ্র পিতার সন্তান তারা। সংসারের অভাব মেটানোর জন্যে স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসে তারা তিতাস নদীর জলে। তিতাসে মাছ ধরে তারা সন্তুষ্ট নয়, ভাবে অধিক উপার্জনের কথা। পরিশেষে তারা অভিজ্ঞ জেলে তিলককে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছায় শুকদেবপুরের 'খলা'য়। এ পথে যেতে যেতে মাঘমণ্ডপের পূজায় বাসন্তীর জন্যে 'চৌয়ারি' বানানো ও ভাসানোকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করে সুবল ও কিশোর । কিশোরের প্রতি বাসন্তীর টান লক্ষ্য করেছে সুবল। সে কারণে সুবল বাসন্তীর প্রতি নিজের অনুরাগ গোপন রেখেই বলেছে, বাসন্তী কিশোরের। কিশোর-বাসন্তী-সুবল এ তিন জনের মধ্যে 'চৌয়ারি' ভাসানোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রেমের আবেশ বেশি বিস্তার লাভ করে নি। তিন জনের এ প্রেমবৃত্তকে ঘিরে ঔপন্যাসিক তৈরি করতে পারতেন একটি ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী। এবং কিশোরকে লেখক নিয়ে আসতে পারতেন উপন্যাসের মূল চরিত্রে। লেখক তা করলেন না, তিনি শুকদেবেপুরের 'খলা'য় আকস্মিকভাবে কিশোরকে পাইয়ে দিলেন এক সুন্দরী নারীর প্রেম ও প্রণয়। ঘটনার আকস্মিকতা এখানেই শেষ নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হলো গোকর্ণঘাটে ফেরার পথে মেঘনার মোহনায় ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া এবং স্ত্রী-সম্পদ উভয় হারিয়ে কিশোরের পাগল হয়ে যাওয়া। ফলে কাহিনীর ব্যাপক সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় ; পরিণতিতে বাসন্তীর বিয়ে হয় সুবলের সঙ্গে। এখানেও কাহিনী প্রবাহিত হতে পারত একটি নির্দিষ্ট গতিতে, যদি সুবলকে অপমৃত্যুর শিকার না করে তার

Dhaka University Institutional Repository

হাতে লেখক তুলে দিতেন মালোদের জীবন বদলের দায়িত্ব। তখন সুবলও হতে পারতো উপন্যাসের নায়ক। বস্তুত, সুবলের মৃত্যু উপন্যাসের কাহিনীর আর এক সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন বলে অনুমান করা যায়। 'নয়াবসত' অংশেও ঘটনার আকস্মিকতা লক্ষ্য করা যায় চার বছর পর কিশোরের স্ত্রী ও তার গর্ভের সন্তান অনন্তর সংবাদ পাওয়ায়। নদীর তীরে গৌরাঙ্গমালো ও নিত্যানন্দ মালো পেয়েছিল মৃতপ্রায় অনন্তর মাকে। 'রাজার ঝি' বলে তারা তাকে লালন পালন করেছিল। নদী তীরের মৃতপ্রায় কিশোরের স্ত্রীকে সেদিন পেতে পারত অন্য কেউ। এবং তার ফলে কাহিনীর মোড়ও ঘুরে যেতে পারত। তা হয় নি ; পরিকল্পিত এ কাহিনীতে তাই একাধিক আকস্মিকতার বোঝা অনন্ত ও তার মায়ের মাথায় চাপিয়ে লেখক গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে দিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন গোকণঘাট। সেখানে তাদের কেউ ছিল না। সম্বল বলতে অনন্তর মা-র ছিলো সামান্য অর্থ। এ পরিস্থিতিতে বড় বেকায়দায় পড়তে হয় অবলম্বনহীন ঐ নারীকে। তার নানা পরিস্থিতির পটভূমিতে হয়তো লুকিয়ে ছিলো স্বামী সন্ধানের আগ্রহ। একটি ভাঙা মন নিয়ে কয়েকজন সহানুভূতিশীল নারীর সহায়তায় সম্ভব হয়েছে অনন্ত ও তার মায়ের গোকণঘাটে বসবাস করা। কাহিনীর এ পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় মালো সমাজের নিত্য দিনের বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ।

উপন্যাসের পরবর্তী ভাগ 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ'। এর মধ্যেও লেখক মালো সমাজের জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে প্রসঙ্গে তাদের চিন্তা ভাবনা এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি প্রকাশ করেছেন। জন্মের জন্যে তারা অন্ন-প্রাসনসহ নানা রকম অনুষ্ঠান করে। মৃত্যু ও বিয়েতেও তারা খরচ করে দু হাত ভরে। উপন্যাসের এ পর্যায়ে এ ছাড়াও উপস্থাপিত হয়েছে মালোদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড যার সঙ্গে পূর্ববর্তী ভাগের অনন্ত ও তার মায়ের কঠিন জীবন বাস্তবতার নেই সঙ্গতি। এ যেন বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন জীবনের জলছাপ। তবে দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে এখানে সম্ভাবনা জেগেছিল অনন্তর মা ও কিশোরের বৈবাহিক জীবনকে প্রলম্বিত করার। বাসন্তীর সঙ্গে গল্প করে অনন্তর মা বুঝতে পারে, কিশোর পাগলই তার স্বামী। তার পর সে তাকে ভালো করার জন্যে করে প্রাণান্ত চেষ্টা। কিন্তু ব্যর্থ হয় অনন্তর মা। ঔপন্যাসিক ইচ্ছা করলেও এ সম্ভাবনা দিয়ে তৈরি করতে পারতেন উপন্যাসের নতুন

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহ । কিশোর যে নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে গমন করেছিলো শুকদেবপুরের 'খলা'য়, তা লেখক অব্যাহত রাখতে পারতেন, এবং দ্বিতীয়বার কিশোরের নেতৃত্বেই গড়তে পারতেন মালোদের ভবিষ্যৎ জীবন পরিকল্পনা। দুঃসাহসিকতা-নির্ভর কাহিনী নির্মাণ করেন নি অদ্বৈত মল্লবর্মণ, যেমনটি করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কুবের ও কপিলার অসামাজিক প্রেম যখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো, ঠিক তখনই কপিলার স্বামী শ্যামাদাস আকুরটাকুর থেকে চলে আসে কুবেরের বাড়ি কেতুপুর। তখন সমাজ অনুশাসন মেনে কপিলা স্বামীর সঙ্গে চলে যায় আকুরটাকুর। কুবের তাকে রাখতেও পারে নি, মনের থেকে ছাড়তেও পারে নি। কপিলার চলে যাওয়ার পর দারুণ অসহায় বোধ করেছিল কুবের। কিন্তু পরবর্তী সুযোগ যেন হারাতে চায় নি কুবের-কপিলা। বোনঝির বিয়েতে কেতুপুর আসে কপিলা এবং ঘটনার অনিবার্যতায় কুবেরের সঙ্গে চলে যায় ময়নাদ্বীপ। সব কিছুকে এ ভাবে তুচ্ছ করে কপিলার এই চলে যাওয়া এবং তাকে সঙ্গে নেওয়ায় জয় হয় প্রেমেরই। অদ্বৈত মল্লবর্মণ কেন যেন চান নি এ রকম প্রেমের তোড়ে ভেসে বেড়ানো। এখানেই তাঁর পরিকল্পনার মাত্রা অনুধাবন করা যায়। তিনি একটি শুদ্ধ কাহিনী গড়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন মালোদের জীবন বাস্তবতা রূপায়িত করার দিকে। চার দিনের ব্যবধানে কিশোর ও বাসন্তীর মৃত্যু ঘটিয়ে যেন মূল কাহিনীকে প্রায় হত্যাই করেছেন তিনি। উপন্যাসের তৃতীয় অংশের প্রথম ভাগেও লক্ষ্য করা যায় তিতাস নদীর সঙ্গে মানুষ ও হাট-বাজারের সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক ঘটনাবলি। এ সব ঘটনা নিত্য দিনের হলেও তার মাধ্যমে উপন্যাসের ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করা হয় নি। বনমালীর মাধ্যমে কাদির মিয়ার প্রায় ডুবে যাওয়া আলুভর্তি নৌকা রক্ষা পায়। বনমালীর নদীতে বিচরণের সূত্র ধরে কাহিনী গতি পেয়েছে, বনমালীর মাধ্যমেই অনন্ত গিয়েছে নবীনগর। উপন্যাসটিতে নবীনগরবাসীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 'জালাবিলা', 'মনসাপূজা', 'পদ্মাপুরাণ পাঠ' এর উপস্থাপনা দেখা যায়। অবশ্য এ ধরনের ধর্মীয় বিষয় নৌকা বাইচের মতো সর্বজনীনতা অর্জন করে নি। 'রাঙা নাও' পর্যায়ে কৃষক কাদির মিয়ার ছেলে ছাদির মিয়া তৈরি করে বাইচের নাও।

ছাদির মিয়াকে কেন্দ্র করে লক্ষ্য করা যায় মুসলমান সমাজের বিয়েতে যৌতুক প্রসঙ্গ। ঋণ গ্রহণের ফলে কাদির মিয়ার প্রতারণার শিকার হওয়া এবং মামলা-মোকদ্দমা সম্পর্কিত নানা ঘটনা

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের কাহিনীতে স্থান পেয়েছে ছোট ছোট ঘটনার মতো। কাহিনীর এ পর্যায়ে উল্লেখ করার মতো ঘটনাগুলো বাইরের বাইচের নৌকা তৈরির সঙ্গে সম্পর্কিত। কাঠ সংগ্রাহকদের নানা ধরনের পেশা, কাঠ চেরাইকারী করাতি, কাঠ মিস্ত্রীদের সঙ্গে জড়িত নৌকার নকশাকার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পেশার এ সব শ্রমজীবী মানুষের উল্লেখ আছে কাহিনীর এই অংশে। নৌকা বাইচকে কেন্দ্র করে ঘটেছে আকস্মিকভাবে কয়েকটি ঘটনা। অগণিত দর্শকের নৌকাগুলো নদীতে ভাসমান, কিন্তু কেমন করে যেন উদয়তারা-বনমালী-অনন্তর নৌকা বাসন্তীর নৌকোর পাশে এসে উপস্থিত হলো। পরিণতিতে বাসন্তী মার খায়, অপমানিত হয় উদয়তারা ও তার সঙ্গীদের হাতে। আবার এতো আয়োজন করে সাজানো যে বাইচের অনুষ্ঠান, তা-ও হঠাৎ করে থেমে গেল গোলযোগেরই কারণে। ও দিকে নৌকা ভেঙে যাওয়ার ফলে নদীর স্রোতে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারানোর উপক্রম হলো ছাদির মিয়ার।

এমন সময় এখানেই আলুর নৌকা রক্ষাকারী বনমালী হাত বাড়িয়ে নৌকায় তুলে নেয় ছাদির মিয়াকে। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ছাদির মিয়া বনমালী ও তার সঙ্গীদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল তার বাড়ি। অন্য দিকে সন্তানতুল্য অনন্তর জন্যে মার খেয়ে অপমানিত বাসন্তী চলে গেল তার মায়ের আশ্রয়ে। লেখক যেন বাসন্তীর প্রতি একটু বেশি নির্মম হয়েছেন ; নইলে বিয়ের কিছু দিনের মধ্যে হয়তো হতো না তার স্বামীর অপমৃত্যু। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যযোগ্য যে, রামপ্রসাদের মাধ্যমে বিধবা বিবাহ চালু করতেও পারেন নি লেখক ; কিংবা ময়না বা তার মতো অন্য কারও সঙ্গেও লেখক দেখান নি বাসন্তীর সম্পর্ক। লেখক ইচ্ছা করলে অনন্তর মা ও অনন্তকে ফিরিয়ে না এনে, বাসন্তীর সঙ্গে কিশোরের প্রেমের অব্যাহত সম্পর্ক রচনা করতে পারতেন। লেখক তা করেন নি। বরং বাসন্তীকে জাগিয়েছেন অন্য চেতনায়, নিজেদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। ঔপন্যাসিক এ দায়িত্ব দিতে পারতেন অনন্তকে । মেধাবী অনন্ত উচ্চ শিক্ষার জন্যে গিয়েছিলো কুমিল্লা শহরে। অনন্তর কাছে মালোদের অনেক প্রত্যাশা ; তমসুকের খত লেখানোর জন্য লোকের অভাব তাদের মিটবে। অনন্ত এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা পূরণের হাতিয়ার হতে পারতো ; লেখক চাইলে তাকে সমাজ পরিবর্তনের নেতা বানাতে পারতেন। সামন্ত-জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে একজন সংগ্রামী বিপ্লবী হিসেবে তাকে গড়ে তোলা যেতো। সঙ্গে তার বাল্য প্রেমের ঘটনাটিও বিকশিত

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারতো। এমন কি অনন্ত হতে পারতো অনন্ত বালার প্রেম ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক সংগ্রামী যুবক। অনন্তর উচ্চ শিক্ষার প্রজ্ঞায় বদলে যেতে পারতো মালোদের দুঃখের দিন। কিন্তু সেটি হয় নি। অনন্তকে তিনি যেন তার নিজের জীবনের ছায়ায় তৈরি করেছেন। উপন্যাসের শেষ অংশের প্রথম ভাগ 'দুরঙা প্রজাপতি'তে ছাদিরের বাড়িতে বনমালী, উদয়তারা ও অনন্ত যে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলো তা বৃহত্তর সমাজ পরিসরের ওপর ফেলে না কোন প্রভাব। বাসন্তী ও মোহন বাইরের চটুল যাত্রাগানের সংস্কৃতি থেকে নিজেদের সুস্থ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সৃষ্টি কতে চেয়েছে জনমত। তারা প্রথমে এ ভাবে মালোদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেও, পরে তা আর সম্ভব হয় নি। কারণ, ধীরে ধীরে মালোরা হয়ে যায় উদাসীন, হারায় তাদের নিজস্ব নৈতিকতা। অন্য দিকে ধীরে ধীরে তিতাসের মাছও যায় কমে। ঠিক এমন একটি সময় ঋণদান কোম্পানির বিধিভূষণ পাল মালোদের মাথায় চাপিয়ে দেয় আরও ঋণের বোঝা। এক দিকে আয়ের উৎস বন্ধ হয়েছে নদী ভরাট হওয়ার ফলে, অন্য দিকে ঋণের বোঝা। ফলে জীবন বাঁচাতে মালোরা চলে যায় নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র। উপন্যাসের শেষের দিকে অনন্ত এসেছিল মালোদের সাহায্য করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাসন্তীর কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে গেছে চলে অনন্ত। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে এ রকম নানা ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন যে গুলো মালোদের জীবনেরই বাস্তবতার প্রতিরূপ।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কেন্দ্রীয়ভাবে এমন কোন একটি চরিত্রকে বিকশিত করেন নি, যাকে ঘিরে আবর্তিত হতে পারতো অন্যান্য চরিত্র। রচনাটিতে স্থান পেয়েছে তিতাস তীরের মালোদের জীবনের একের পর এক ঘটনা। তবে এ ঘটনাগুলো এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নি তিতাস। তিতাস একটি নদী। সে বয়ে যায় নিজের মতো। তার মাছের ভাণ্ডার দিয়ে সে সাহায্য করেছে মালোদের। এবং এভাবেই এ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিতাস নদী থেকেছে ক্রিয়াশীল। ফলে, উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান চরিত্রে যেন রূপায়িত হয়েছে তিতাস নদী। কিন্তু তার পরও মানুষ নামক নিয়ন্ত্রকদের হাত থেকে তার রেহাই ঘটে নি। অর্থ ও ক্ষমতার জোরে মালো পাড়া নিয়ন্ত্রিত করেছে ধনীরা, মহাজনরা। নানা ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কগুলো চিহ্নিত করা কঠিন নয়। কিন্তু অবশেষে বলতে হয় যে, ঔপন্যাসিক প্রথাগত কোন উপন্যাস লিখতে চান নি

Dhaka University Institutional Repository

যেমনটি চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রসহ আরও অনেকে। প্রসঙ্গত বলা যায় 'বিষবৃক্ষে'র কথা। এর নায়ক নগেন্দ্র কলকাতায় যাওয়ার পথে এক গণ্ডগ্রামে পায় অনাথ মেয়ে কুন্দনন্দিনীকে। এবং তাকে রাখে তার বোন কমলমণির বাড়িতে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অনুরক্তির অবসানকল্পে সূর্যমুখী তার ভাইয়ের সঙ্গে কুন্দর বিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যবশত কুন্দ বিধবা হলে নগেন্দ্রের পূর্ব প্রেম তীব্র হয় এবং সে কুন্দনন্দিনীকে বিয়ে করে। এর ফলে সৃষ্ট হয় নানা জটিলতা যার পরিণতিতে বিষবৃক্ষে বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু তাতে মূল কাহিনী কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, কোথাও তৈরি হয় নি অসঙ্গতি। এ রকম কোন সুবিন্যস্ত কাহিনী বিকশিত হয় নি 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। অবশ্য উপন্যাস-শিল্পকে কোন কঠোর নিয়মের ফ্রেমে বেঁধে রাখা উচিত কি না, সেটাই এক প্রশ্ন। সে দিক থেকে বিচার করলে সামগ্রিকভাবে 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে উপন্যাস বলা যেতে পারে।

উপন্যাসের শিল্পরূপ আলোচনায় কাহিনীর মতো চরিত্রও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে কাহিনীর গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' কাহিনীতে ঔপন্যাসিক তিতাস তীরের মালোদের জীবন বৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন। ফলে নানা প্রসঙ্গে উপন্যাসে এসেছে প্রায় অর্ধশত নাম। প্রতিটি নামই কোন না কোন ভাবে উপন্যাসের কাহিনীতে রেখেছে কম বেশি ভূমিকা। অবশ্য বিনা কারণে কোন চরিত্রের উপস্থিতি খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। এ উপন্যাসটিতে শিশু-যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের চরিত্রের রয়েছে উপস্থিতি। অনন্ত ও রমু উপন্যাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিশু চরিত্র। বিশেষ করে অনন্তর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির নানা বিষয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> অনন্ত আর রমু মালোদের পরিবার-চ্যুত একলা একটি বালক আর চাষী মুসলমান একটি সচ্ছল পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী বালক, এই দুইয়ের মারফৎ গড়ে উঠেছে তিতাসের অন্তর্বয়ন। নিপুণ সেই বুনট। আর সভ্যতা-সংস্কৃতির আদি যুগের বার্তা থাকায় এই দুটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ উপন্যাসের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষ্য বা পাঠ রচনা করে।[৯]

অনন্ত ও রমুর মাধ্যমে উপন্যাসে এসেছে অনেক কথা। অনন্ত আছে উপন্যাসের অনেকাংশ জুড়ে। রমুর বিস্তৃতি ততটা নয়। নৌকা বাইচকে কেন্দ্র করে রমুর কতকগুলো ঘটনা আবলোকনের

৯. অচিন্ত্য বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩ (ভূমিকা)

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঔপন্যাসিকের মূল দৃষ্টি নদীর জল ব্যবহারকারীদের দিকে, নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী জেলেদের কথাই এখানে মুখ্য। অন্যান্য যারা নদীর সঙ্গে জীবিকার প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট নয় তারা গৌণ। সে কারণেই হয়তো রমুর উপস্থিতি উপন্যাসে ভিন্ন ধাঁচের। তবু তিতাস তীরের মানুষের জীবন বৃত্তের প্রতিনিধি অনন্ত ও রমু।

'খলা' বাইতে গিয়ে কিশোর এক মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং মালাবদলের রীতিতে 'গান্ধর্ব' মতে তাকে বিয়ে করে। তাদের সন্তান অনন্ত। শুকদেবপুর থেকে স্বামী কিশোরের সঙ্গে গোকর্ণঘাটে ফেরার পথে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয় তারা। কিশোরের স্ত্রী নিজেকে রক্ষা করার জন্যে নদীতে ঝাঁপ দেয়। পর দিন নদীতীরে তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পায় গৌরাঙ্গ মালো ও নিত্যানন্দ মালো। এই মালোদের সংসারেই জন্ম হয় অনন্তর। অনন্ত ও তার মা গৌরাঙ্গ মালো ও নিত্যানন্দ মালোর আশ্রিত। শৈশবেই অনন্তের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিলো এক অনুসন্ধিৎসু মন। চার বছর বয়সেই সে যেন তার নিজস্ব এক ভুবন তৈরি করে নেয়। গোকর্ণঘাটে যাওয়ার সময় অনন্ত তার সেই নিজস্ব ভুবনের যাবতীয় উপকরণ সঙ্গে নিয়েই নৌকোয় ওঠে। শিশু সংগ্রাহক অনন্তর দপ্তরে ছিল 'কয়েকটি ছবির টুকরো, দেশলাইর খালি বাক্স, জাল বুনিবার দুই-একটা ভাঙ্গা উপকরণ, কিছু সূতা, ছেঁড়া একখানা ভক্তিতত্ত্বসার, এক টুকরা পেনসিল।[১০]

নিজের গড়া এই রাজ্য ছেড়ে নতুন রূপকথার রাজ্যে যাত্রা অনন্তর। প্রথম নৌকায় চড়ে অভিভূত সে। এক সময় নদীর গল্প শুনে অনন্তর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত ; তখন গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মালো ভাবতো অনন্ত বড় হয়ে বড় জেলে হবে। আজ সেই নদী তার নিজ বিচরণ ক্ষেত্র যেন। সে আরও বিস্মিত হয়ে দেখছে নদী ও প্রকৃতি। বড় গাঙের পাগল অনন্ত মায়ের কোল থেকে নেমে গিয়ে নদী দেখছে। নদীর তলদেশের বালিময় রূপ ও নানা রকম ছোট মাছ স্বচ্ছ পানিতে দৃশ্যমান। এ বিষয়ে উপন্যাসের এক স্থানে বলা হয়েছে :

> দুই-একটা শামুক হাঁটিয়াছে, তার রেখা বালির বুকে আঁচড় কাটিয়াছে। ছোট ছোট বেলে মাছ সে বালিতে বুক লাগাইয়া চুপ করিয়া আছে, ...আর সেই শামুক চলার দাগ, কম জল হইতে ক্রমে বেশি জলের দিকে চলিয়া গিয়াছে।...ওখানটাতে কি রহস্য। নামিলে পায়ে

১০. ঐ, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

মাটি ঠেকিবে না। আরও একটু দূরে বুঝি ঐ দাঁড় দিয়াও মাটি ছোঁয়া যাইবে না। সেখানটাতে আরও কত রহস্য![১১]

অনন্ত এই রহস্যের সন্ধান পায় নি, বিস্মিত মন নিয়েই পৌঁছে গেছে নতুন বসত গোকর্ণঘাটে। নদীর এই বয়ে চলাকে সময়ের সঙ্গে, মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করেই ঔপন্যাসিক যেন বলেছেন :

সে তো নদী নয়, হাজার বছরের না শোনা গল্প দুই তীরের বাঁধনে পড়িয়া একদিকে বহিয়া চলিয়াছে।[১২]

অনন্তরাও যেন ঠিক সেই না শোনা গল্পের পাতার সঙ্গে নতুন একটা পাতা যোগ করেছে গোকর্ণঘাটের মালো সমাজে ঠাঁই পেয়ে। অজানা পরিবেশে কালোবরণের মা ও বাসন্তী অনন্তর মাকে সাহায্য করেছে নানাভাবে। মায়ের মৃত্যুর পর অনন্ত বাসন্তী মাসীর ওপর হয়ে পড়ে নির্ভরশীল। মাসীর বাবার অভাবের সংসারে অনন্তর অবস্থান সুখের হয় নি। উপায়হীন অনন্ত কখনও কখনও বাজার থেকে দোকানীর ফেলে দেয়া পচা পান কুড়িয়ে আনত বাসন্তী মাসীর মায়ের জন্যে। তাতে বাসন্তীর প্রতি তার মায়ের বকাবকি থামত না। এক দিন অনন্তর জন্যেই মা-মেয়েতে হাতাহাতি হয়। মা-মেয়ের সম্পর্কের এই অবনতির মুখে অনন্তর প্রতি বাসন্তীর স্নেহে ভাটা পড়ে। ফলে অনন্ত পাড়ি জমায় অন্যত্র।

নদী ও কাল বয়ে চলে বিরতিহীন। ঐ তিতাসের সঙ্গেই অনন্তর সাক্ষাৎ ; ফলে নদী, তিতাস ও মানুষ অনন্ত অন্তহীন গতি প্রবাহের মধ্যে মিশে গেছে। এই নদী প্রবাহই যেন অনন্তর জীবনে এক নিয়ামক ; তাকেও তাই চলতে হয়েছে পথে পথে। মাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক গন্তব্যহীন পথে তাকে যে দিন পড়তে হয়েছে সে দিনও নদীর সঙ্গে তার যেন সূচিত হয়েছে এক গভীর সম্পর্ক। গোকর্ণঘাটে আসার পথে নৌকোয় মায়ের কোলে বসে যে কল্পনাচারিতায় অনন্ত নৌকার অস্তিত্ব ভুলে লক্ষ্য করেছিলো নদীর প্রবহমানতা, আজও তেমনি গভীর মনোনিবেশে সে দেখলো নদী।

---

১১. ঐ, পৃঃ ৪০
১২. ঐ, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন:

> এখান হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে নদীর গতি। চাহিলে শেষ অবধি দেখা যায়, বহু দূর দূরান্তর হইতে দক্ষিণের রাজ্য হইতে কেউ বুঝি ঢেউ চালাইয়া দেয়, সেই ঢেউ আসিয়া লাগে অনন্তর এই নৌকাখানাতে। সেদিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে।[১৩]

ভাঙা নৌকার আশ্রয় ছেড়ে অভিমানী অনন্ত আর ফেরে নি বাসন্তী মাসীর কাছে। এখান থেকেই বাজারে পরিচিত বনমালী অনন্তকে নিয়ে যায় নবীনগরে। নৌকায় বনমালীর বোন উদয়তারার কোলে শুয়ে গভীর রাতে আকাশের তারা আর প্রকৃতির রূপ দেখে অনন্ত বিস্ময়বোধ করে। জলের মধ্যে তারার ছায়া দেখে অনন্তর মনে পড়ে জলের তলের রহস্যের কথা। মায়ের কাছে শোনা সিন্দাবাদের দৈত্যের কাহিনী, আরব্য উপন্যাসের কল্পকাহিনী , আকাশ থেকে ধপাস ধপাস করে পড়ে চারিদিক কাঁপিয়ে দেও-দৈত্য আসার গল্প। আকাশের রহস্য প্রসঙ্গে নানা লোক-কথা, লোক-বিশ্বাস, সংস্কার, স্মৃতি-পুঞ্জিত কিংবদন্তী, দেব-দেবীর কথা একাকার করে উপন্যাসে যেন অন্য এক নতুন কল্পলোকের সৃষ্টি করা হয়েছে। কল্পনাবিলাসী অনন্ত উদয়তারার কোলে বসে কল্পনা করে :

> নদীর স্রোত তাহাকে দেশ দেশান্তরে ভাসাইয়া নিবে, ঢেউ তাহাকে দোলা দিবে।[১৪]

সে নিবিড় অন্ধকারে একমাত্র অনন্তই জেগে থাকবে, আর জেগে থাকবে জলের মাছ। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> অনন্ত জীবন প্রবাহ আর এই নক্ষত্রমণ্ডলীর মাঝখানে নদীর মতোই অনাদি অনন্ত সচল বর্তমানে থাকার আকাঙ্ক্ষা অনন্তর। আর তার দৃষ্টিভঙ্গিতেই উপন্যাসে বাস্তব আর পরাবাস্তব যেন অন্তহীন সমান্তরলতার জন্ম দিয়েছে।[১৫]

ঔপন্যাসিক বার বার রঙধনু দেখিয়েছেন অনন্তকে। লেখক যেন জীবনের রূপকে প্রতীকীর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। রঙধনুর আগমন ও প্রস্থানের আকস্মিকতার মতোই অনিশ্চিত যেন গোকণঘাটের মালো-জীবনের পরিস্থিতি। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের উক্তি :

> প্রকৃতিতে যখন রঙধনু ওঠে তখন জীবনেও তা ব্যাপ্ত হয়, সে কারণে তিতাস ত শুধু একটি নদীর নাম নয়, সে যে মৃত্তিকা ও মানুষের কাহিনীকেও বুনে চলে।[১৬]

---

১৩. ঐ, পৃ. ৯৫
১৪. ঐ, পৃ. ১০১
১৫. ঐ, পৃ. ১৭৯ (ভূমিকা)
১৬. শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

অনন্ত মেধাবী ছাত্র। তার প্রতিভায় মালোরা মুগ্ধ। সকলে অনন্তর ব্যাপারে তাই পোষণ করতে থাকে উচ্চাশা। অনেক আশায় মালোরাই তাকে ভর্তি করিয়ে দেয় গোপালখালি মাইনর স্কুলে। চিঠি লিখতে, তমসুকের খত লিখতে, বেপারীর সঙ্গে মাছের খাতার হিসাব লিখতে মালোদের যেতে হয় হরিদাস সাঁর কাছে। তাকে অনেক অনুরোধ করে, বড় বড় মাছ দিয়ে, টাকা দিয়েও অনেক সময় কাজ পেতে কষ্ট হয়। মালোদের এই অভাব মেটানোর দায়িত্ব যেন বর্তায় অনন্তর কাঁধে। কিন্তু লাভ হয় নি মালোদের। অনন্ত নাপতানীর পরামর্শে আর নিজ আগ্রহে উচ্চ শিক্ষার আশায় সে চলে যায় শহরে। নবীনগরে এসে অনন্তর সঙ্গে পরিচয় ঘটে অনন্তবালার। অনন্তবালা সেই বাল্য বয়সেই কথার বাঁধনে বাঁধতে পেরেছিল অনন্তকে, সে তাকে তার আগামী দিনের বর মনে করেছিলো। কিন্তু অনন্তবালার ইচ্ছার প্রতি অনন্তর কোন সমর্থন ছিল না। সে কথা অনন্তবালা মনে হয় বুঝেছিলো ; অনন্তর লেখাপড়ার আগ্রহের কাছে অনন্তবালার ভালোবাসার আহ্বান ছিলো একটি গৌণ বিষয় । তবু অনন্তবালা সম্ভবত অনন্তর আশাতেই রাজি হয় নি অন্যত্র বিয়ে করতে। অনন্তবালার বাবা এক রকম বিরক্ত হয়েই বনমালীকে পাঠায় কুমিল্লা শহরে অনন্তর কাছে। সেখানে অনন্তর বেশভূষা দেখে বনমালী হয়ে যায় সঙ্কুচিত। চলে আসার সময় তার স্বগতোক্তি শুনে ফেলে অনন্ত। অবশেষে অনন্ত যথোচিত সামাজিকতা করেই আপ্যায়ন করে বনমালীকে, ভদ্রতা করে কতগুলো কাপড় কিনে দেয় গ্রামের লোকদের জন্যে। কিন্তু অনন্ত একবারও অনন্তবালার নাম মুখে আনে নি ; এবং বনমালীও এ সম্পর্কে কোন কথা অনন্তকে বলতে সাহস করে নি। এমন কি জীবিকার অভাবে যে দিন মালোরা ধ্বংসের মুখে, সে দিনও তাদের বাঁচাতে আসে নি অনন্ত। লেখাপড়া শেখার ফলেই সে যেন শ্রেণীচ্যুত হয়ে উঠে গেছে ওপরের শ্রেণীতে। রামকেশব ও বাসন্তীর অন্তিম সময়ে মানব কল্যাণের নামে তাদের মুখোমুখি হলেও পরিচয় গোপন করেছে অনন্ত। লেখক বাসন্তী ও মোহনের সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব অনন্তর মাথায় তুলে দিলেও, তাকে যেন হতে দেন নি বিপ্লবী। মালোদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, দারিদ্র্য-বিমোচনে অনন্ত তার বিদ্যার্জনজনিত শক্তি নিয়োগ করে নি।

রমু চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক চাষী জীবনের উত্তরাধিকার, হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক বন্ধুত্বের বন্ধন এবং এ অঞ্চলের মানুষের সর্বজনীন উৎসব 'নাও দৌড়ানি'র প্রতি সবার আগ্রহ তুলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরেছেন। রমুর মাধ্যমে লেখক একই সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন চাষীদের জীবন-যাপনের ধরন এবং তাদের ধর্মাচরণ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড।

রমু সহজ-সরল, গল্পপ্রিয় ও কৌতূহলী বালক। তার সারল্য প্রকাশ পেয়েছে তার পিতা ছাদির মিয়ার কথায়। ছাদির মিয়া মনে করে রমুর ব্যবসা করার মতো বুদ্ধি নেই। গল্পপ্রিয় রমুর মধ্যে কাঠ সংগ্রাহক ঈশ্বর মালো ও ইচ্ছারাম মালো গভীর উদ্দীপনা তৈরি করে। নৌকা বাইচের নৌকা তৈরির সময় আনন্দে আত্মহারা রমু কাঠ সংগ্রাহক, মিস্ত্রি, করাতি প্রমুখ, সকলের সঙ্গে গড়ে তুলতে চায় নির্মোহ সম্পর্ক। ঈশ্বর মালো ও ইছারাম মালো কত পাহাড় ডিঙিয়ে খাল-বিল পেরিয়ে দেশ দেশান্তরের অনেক গল্প যেন কাঠের সঙ্গে নিয়ে আসে। রমু মনে মনে ভেবেছিল এদের কাছ থেকে অনেক গল্প জানা যাবে। কিন্তু তারা কাঠ বিক্রি করে চলে যায় যে যার পথে। তাদের চলে যাওয়া রমুর জীবনে এক গভীর দাগ কাটে। কাঠ সংগ্রাহকদের এমন নিভৃতে চলে যাওয়ায় সহজ সরল রমুর মনে হয় :

> যারা অনেক দূরের অনেক কিছু খবরাখবর বহিয়া বেড়ায়, তারা অধিকক্ষণ থাকে না, এমনি এমনি ধীরে ও দৃঢ়তায়, এমনি ধীরে ও নিষ্ঠুরতায় তারা চলিয়া যায়।[১৭]

করাতিরা 'চান্ চুন চান্ চুন' শব্দ করে করাত চালিয়ে কাঠ থেকে তক্তা তৈরি করে। এর পর অস্থায়ী চাল দেয়া ঘরের মধ্যে মিস্ত্রিরা নৌকা তৈরির কাজ করে। হাতুড়ি বাটালির মাধ্যমে সারাদিন ডুম ডুম টাকুর ডুম নানা শব্দে দিগন্ত চকিত করে নৌকা তৈরি করে মিস্ত্রিরা। রমুর কাছে এ রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। মিস্ত্রিদের আশ্চর্য ক্ষমতায় মুগ্ধ রমু। তাদের গাওয়া বুরজের গানটি রমুকে বেদনার্ত করেছে। এ গানে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ও অমানবিক অস্পৃশ্যতার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। রমু মুসলমান সন্তান, অন্য দিকে সে অনভিজ্ঞ বালক। বুরজের গানে তার মধ্যে জেগে ওঠা বেদনাবোধ যেন মানবিক ধর্মেরই প্রকাশ। ভুঁইমালীর মেয়ের হাতে জল খেয়ে বুরজের জাতি নষ্ট হয়। এরপর সে আর ব্রাহ্মণ সমাজে ফিরতে পারে নি, এ ঘটনা রমুকে কষ্ট দিয়েছে। রমু এতই বন্ধুপ্রিয় যে, সে ভাবে তার হাতে পানি খেয়ে কেন মিস্ত্রিদের জাত না যায় ; গেলে অবশ্য ভালো হতো ; তা হলে মিস্ত্রিরা সারা জীবন রমুদের বাড়ি থেকে যেত, তখন রমু গল্প করে আনন্দে দিন কাটাত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাইচের দিন রমু যেতে পারে নি সে উৎসব দেখতে। সে উৎসব

১৭. অচিন্ত্য বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

দেখেছে অনন্ত। বর্ণিল সে উৎসব বিরামহীন চেষ্টায় যে ভাবে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছিল, বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ঠিক তেমনি যেন ভেঙে যায় উৎসবের সে উচ্ছ্বাস। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> রামধনুর মতো হঠাৎ এক দণ্ডের আলোর উৎসব-হঠাৎ মিলিয়ে যাওয়ার ছবি হয়ে থেকে গেল রমু আর অনন্তের দেখা সেই রাঙা নাও।[১৮]

বালক রমুর চোখ দিয়ে এ ঘটনাগুলো দেখানো এবং তা গভীর বেদনাবোধ দিয়ে, সহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে উপস্থাপনের মাধ্যমে রমু চরিত্রটি হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল।

কিশোর চঞ্চল, রোমন্টিক ও ভাবুক প্রকৃতির। তার ভাবনা মূলত বাস্তবতাভিত্তিক। কিশোর ও সুবল বাল্য বন্ধু, দুজনের স্বভাব চরিত্রের প্রকৃতি ভিন্ন রকম। তবু তারা শৈশব থেকে যৌবনে পাড়ি জমায় একে অপরের হাত ধরাধরি করে। শৈশবে তারা স্কুলের পড়া ফাঁকি দিয়ে কলা গাছের খোল কেটে চটি জুতা তৈরি করতো। জুতা পায়ে দিয়ে কিশোর সুবলের কাছে ভক্তি চায়, নিজেকে বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী বলে দাবি করে। শৈশবের এই খেলার গণ্ডি পেরিয়ে তারা সক্ষম পুরুষ হয়ে ওঠে মালো সমাজের। নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যে কিশোর উত্তরের প্রবাসে মাছ ধরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। জগৎপুরের ডহরে যাওয়ার পরিকল্পনাও কিশোরের। কিশোর তিলক ও সুবলকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে উত্তরের পথে। জলের বুক চিরে নৌকার দাঁড় বেয়ে তারা নৌকা টেনে নিয়ে যায় মেঘনার দিকে। সীমাহীন সুদূর জলরাশির দিকে তাকিয়ে কিশোরের মনে জেগে ওঠে এক ধরনের আনন্দ শিহরণ। নয়াকান্দার মালোদের স্বাধীনতা ও সুখের কথা মনে পড়ে কিশোরের। রোমান্টিক কিশোর স্বপ্ন দেখে একটি সুন্দর পরিবারের। সে পরিবারে থাকবে একজন 'নারী', একজন 'নন্দিনী' এবং পুরুষটি থাকবে না রাতভর নদীর বুকে। পরিবার সম্পর্কিত কিশোরের এই পরিকল্পনাও অর্ধেক বাস্তব, অর্ধেক কল্পনা। কল্পনা ও বাস্তবতার ধ্যানে কিশোরের নৌকা ক্রমে এগিয়ে চলে উত্তরের দিকে। যাত্রাপথে কিশোর মালোদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাবে। কিশোরের জানা মতে নয়াকান্দা, শুকদেবপুরের মালোরা রয়েছে সুখে ; সে ভাবে তাদের সুখের কারণ সম্পর্কে। এখানকার মালোরা জলে-কাদায় নিয়ত সংগ্রামে অর্জন করেছে অন্য রকম এক যোগ্যতা ; তার ফলে তারা মাছ ধরা বন্ধ হলেও অনাহারে মরবে না। তাদের অর্জিত কৃষিকাজের যোগ্যতা দিয়ে তারা বাঁচতে পারবে।

---

১৮. ঐ, পৃ. ১৮২ (ভূমিকা)

Dhaka University Institutional Repository

এখানকার মালোদের জীবনের সঙ্গে কিশোর তুলনা করে গোকর্ণঘাটের মালোদের জীবন ধারা। শুকদেবপুরের মালোরা ক্ষেতে ধান বোনে। তারাই নিজেদের ধান কাটবে। তাদের এই গৌরবে কিশোর নিজেও আনন্দিত। ধান গাছের মধ্য দিয়ে নৌকা বেয়ে যাওয়ার সময় তাই কিশোর তিলককে আস্তে আস্তে লগি চালাতে বলে, যেন ধান গাছ নষ্ট না হয়ে যায়। অন্যের সুখে প্রসন্ন হওয়ার মতো মেজাজই কিশোরের বিশেষত্ব। নতুন দেশে পৌছে নতুন পরিবেশ ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে কিশোর আগ্রহী। তিলক বা সুবলের মধ্যে এ মনোভাব ছিলো না। সে কারণেই কিশোর 'মুগরাচণ্ডী' ফুল পছন্দ করেছে সহজেই। নতুনের প্রতি তার এই অদম্য ভালো লাগার জন্যেই হয়তো মহূর্তের মধ্যে কিশোর ভুলেছে বাসন্তীকে। এবং খলায় দোল উৎসবে প্রেমে পড়েছে কিশোরী নর্তকীর যা দেখে কিশোরের ওপর থেকে সুবলের আস্থা হয়েছে অন্তর্হিত। সুবল ভাবত, বাসন্তী কিশোরের হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেছে। সুবলের এই ধারণা ও কিশোরের নিজের বিয়ের পাত্রী সম্পর্কিত ভাবনার মধ্যেকার ব্যবধানই কিশোর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিশোর ভাবে :

> যারে লেংটা থাইক্যা দেখতাছি—ছোটকালে যারে কোলে পিঠে লইছি—হাসাইছি, কাঁদাইছি, ডর দেখাইছি, ভেউরা বানাইয়া দিছি—তারে কি বিয়া করণ যায়! বিয়া করণ যায় তারে, যার লগে কোনকালে দেখাসাক্ষাৎ নাই।[১৯]

কিশোর ও সুবলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যবধান বাল্যকাল থেকেই। কিশোর জনৈক বেদেনীর সংস্পর্শে এসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকে মাছ দিয়ে দিয়েছে বিনা পায়সায়। আর সেখানে সুবল মাছের বিনিময়ে তার কাছে চেয়ে রেখেছে সাবান। কিশোরের মনের এই আলাদা ধরনটি সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> প্রথম নারী প্রেম সম্পর্কে তার বিশেষ ভাব আর দ্বিতীয় সমাজ সম্পর্কে কল্পনাচারিতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির বিশালত্ব লক্ষ্য করে উত্তেজনাভাব আর উন্মনা হয়ে যাবার মনোবৃত্তি।[২০]

শৈশবের দুরন্ত চরিত্রের কিশোর পরিণত বয়সে হয়ে যায় ভাবুক এবং আবেগ, উচ্ছ্বাসভরা প্রেম-বিলাসী নিত্য পরিশ্রমী একজন জেলে। সে মালো সমাজের অনিশ্চিত ভবিষ্যত সম্পর্কে ভাবতে আগ্রহী। গোষ্ঠীগত উন্নয়নের চিন্তা তার চরিত্রটিকে করে দেয় কোমল ও মানবিক।

---

১৯. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

২০. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭ (ভূমিকা)

Dhaka University Institutional Repository

তিতাস নদী-তীরবর্তী মুসলমান চাষী জীবনের আচার-আচরণের প্রতীক কাদির মিয়া। সংস্কৃতিমনা মনের মানুষ কাদির মিয়া মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, দরদী। সে কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী। সে উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। নিজের ক্ষেতে উৎপাদিত আলু এক দিন নৌকোয় করে বাজারে বিক্রি করতে যাওয়ার পথে নদীর প্রবল স্রোতে ও ঝড়ে তা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। পুত্র ছাদির ও কাদির মিয়াকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে বনমালী ও ধনঞ্জয়। বিক্রি করতে নেয়া আলু বাজারে সাজানোর সময় কাদির মিয়া ইচ্ছাকৃতভাবেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কতগুলো আলু দূরে সরিয়ে রাখে। এই আলুগুলো বাজারে আশ্রয় নেয়া অসহায় ছেলেগুলো কুড়িয়ে নেবে, অসহায়দের প্রতি কাদির মিয়ার মনোভাব এ রকম। 'সাইত' করার আগে কাদিরের এ ধরনের বদান্যতা সব সময় ভালো লাগে না পুত্র ছাদিরের। এ প্রসঙ্গে কাদির বলে :

> বড় অভ্যাগা এরা। কেউর মা নাই, বাপ নাই, লাথি ঝাঁটা খায় ; কেউর মা আছে কিন্তু দানা দিতে পারে না। কেউর বাপ আছে মা নাই।[২১]

অবশ্য, মানুষের জন্যে কাদিরের এই মায়া-মমতা সম্পর্কে পুত্র ছাদিরও সন্তুষ্ট। কাদিরের সততা-ধর্মভীরুতার জন্যে গ্রামের মানুষও কাদির মিয়াকে সম্মান করে। বনমালী কাদির মিয়াকে মনে করেছে পয়গম্বর মহম্মদের পথের মানুষ। পয়গম্বরের মতো মানুষকে ভালোবাসে কাদির মিয়া, সে যেন সেই পয়গম্বরের মহত্ত্বেরই একটুখানি পরশ লাভ করেছে। কাদির সম্পর্কে বনমালীর এই ধারণা কাদির মিয়ার চরিত্রকে করে তুলেছে মহানুভব। পারিবারিক জীবনেও কাদির অত্যন্ত স্নেহশীল। পুত্রবধূ খুশীর চোখের জল দেখে মনে পড়ে তার নিজ কন্যা জমিলার কথা :

> বেদনায় বুকটা টন্‌টন্ করিতে লাগিল ; মনে মনে বলিল, মুহুরী যত দোষের দোষী না, তার চাইতে অধিক: দোষী করিয়া আমরা এই অসহায় মেয়েটাকে সকলে মিলিয়া জর্জরিত করিতেছি। আমি যত দোষের দোষী না...শোনে আর চোখের জল ফেলে ? ...জমিলা। সেও ... মা মরা মেয়ে।[২২]

এখানে একজন স্নেহশীল পিতার পরিচয়ই যেন ফুটে উঠেছে। কাদির মিয়া শক্ত নৈতিকতার মানুষ। সে বিয়াই নিজামত মুহুরীর ওপর ক্ষিপ্ত আর্থিক লেনদেন শোধে তার অপারগতার জন্যে

২১. ঐ, পৃ.৮৪
২২. ঐ, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

নয় ; বরং ক্ষিপ্ত তার ঘোরানো-প্যাঁচানো আচরণের কারণে। এ ছাড়াও কাদির মিয়ার নৈতিকতায় আঘাত দিয়েছে মাগন সরকার। অবলীলায় সে কাদির মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করে শিক্ষিত মানুষদের রূপটিকে যেন বিষাক্ত করে তুলেছে কাদির মিয়ার কাছে। সে কারণে তার ধারণা জন্মেছে, শিক্ষিত মানুষ মাত্রই মন্দ। তাই ছাদিরের ইচ্ছার বিরোধিতা করে কাদির মিয়া নাতি রমুকে স্কুলে পড়তে দিতে চায় না। ছাদির মনে করে দুনিয়ার হালচাল জানতে হলে লেখাপড়া করা দরকার ; কিন্তু কাদির মিয়া তার বিয়াই নিজামত মুহুরীর মতো অনেক দেখায় উদাহরণ। সে বলে:

> ইশকুলে পাঠাইলে, তোর শ্বশুরের মত মুহুরী হইতে পারিবে আর শাশুড়ীর বিছানায় বউকে ও বউয়ের বিছানায় শাশুড়ীকে শোয়াইয়া দিয়া দূরে সরিয়া ঘুষের পয়সা গুণিতে পারিবে।[২৩]

সরল মানসিকতার জন্যেই সে যায় নি মামলা মোকদ্দমার পথে ; সে মানুষকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। আত্মবিশ্বাসের জোরেই কাদির মিয়া মাগন সরকারকে জব্দ করে। মাগন ঠাকুরের ঘটে বীভৎস মৃত্যু। এই কাদির মিয়াকে আবার পাওয়া যায় উপন্যাসের শেষে, মালোদের দুর্দিনে। অনাহারী মালোদের জন্যে সে খুলে দেয় তার ধানের গোলা। কাদির মিয়া আবারও তার উন্নত চরিত্রের পরিচয় রেখেছে এই উদার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

রামপ্রসাদ তার নিজ সমাজ-সংস্কৃতিতে দিয়েছে নেতৃত্ব। একটা সময় পর্যন্ত সে সফলতার সঙ্গে মালোদের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু তার পর মালোরা তার কথা আর শোনে নি। মালো সমাজের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে রামপ্রসাদ উপস্থিত হয়। মালোদের জন্যে রামপ্রসাদের ছিলো দরদ ; গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষার জন্যে সে গোপনে ঘুষ নেয় নি বাজার বসানোর প্রস্তাবকের কাছ থেকে। বরং ঘুষ প্রস্তাবককে সে পান-তামাকও দেয় নি। পক্ষান্তরে সে অন্য দলের কাছ থেকে প্রত্যেক জেলের জন্য পঁচিশ টাকা ও একটা করে ধুতি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়।

সমাজ পরিবর্তনের ধারায় বদলেছে অর্থনীতি, বদলেছে জীবনের ছন্দ। ত্রিপুরার রাজাদের বছরে দশ ভার করে মাছ দিতে হতো প্রত্যেক মালোকে। এর পর চালু ছিল রাজ-সরকারে খাজনা পৌঁছে দেয়ার নিয়ম। কিন্তু এক পর্যায়ে দেখা গেল তিন বছরের খাজনা বাকি। এ দিকে গোকর্ণঘাটের মালোদের কাছে খাজনা চায় আনন্দবাজারের লোকেরা। এমন পরিবর্তনশীল

২৩. ঐ, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতিতে মালোদের মঙ্গল চেয়ে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল রামপ্রসাদ। সে মনে করে, মালোরা মাছ বেচার জন্যে এর আগে কাউকে মাশুল দেয় নি, এখনও দেবে না। জায়গা দেয়া না দেয়ার বিষয় নয়, মালোরা বাজার জমাতে ও ভাঙতে জানে। তারা যে দিকে যায় অ-পথ হয় পথ, অ-বাজার হয় বাজার। মালোদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এমন দৃঢ়তার সঙ্গেই কথা বলেছে রামপ্রসাদ।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ সাহসী ভূমিকা নিয়েছিলো। অশিক্ষিত পিছিয়ে পড়া মালো সমাজের রক্ষণশীলতা ভেঙে প্রগতির ধারা বইয়ে দিতে চেয়েছিলো সে। অশিক্ষা ও রক্ষণশীল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রামপ্রসাদ মালো সমাজে পারে নি বিধবা বিবাহ চালু করতে। মালোদের পুরোহিত চক্রবর্তী ঠাকুর মনে করত বিধবা বিবাহের ফল নরকবাস। সে কারণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথাই চালু থেকেছে সমাজে।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়েও রামপ্রসাদ তার নেতৃত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তিতাসের জল শুকিয়ে গেছে, চর পড়েছে তিতাসের বুক জুড়ে। তিতাসের জলে এক দিন মালোদের ছিলো একচ্ছত্র অধিকার। চর পড়ার কারণে তিতাস নদীর ওপর অধিকার হারাতে বসেছে মালোরা। জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মালোরা পড়েছে গভীর সঙ্কটে। এই সঙ্কট কাটিয়ে ভিন্নভাবে বাঁচার জন্যে চর দখলের প্রয়াস রামপ্রসাদের। জেলেরা চরের জমিতে কৃষি কাজ করবে, এ ধারণা তারই। মালো গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই তার এই প্রয়াস। এ জন্যে সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে জেলেদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। রামপ্রসাদ বলেছে :

> ওরা কৃষক। ওদের জমি আছে। ওরা আরও দখল করিবে। এত দিন জল ছিল, আমাদের ছিল দখল। এখন জল গিয়াছে। তার মাটিও এখন আমাদেরই। ওরা অত-দূর হইতে আসিয়া দখল করিয়া নিবে, আর এত নিকটে থাকিয়া আমরা জেলেরাই বা নিশ্চেষ্ট থাকিব কেন।[২৪]

রামপ্রসাদ গোষ্ঠী স্বার্থে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মালোরা তা অনুসরণ করতে পারে নি। তাদের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা হয় নি জাগ্রত। এটা রামপ্রসাদের নেতৃত্বের ব্যর্থতাই নয় শুধু, তা মালো সমাজের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাও। তবু

---

২৪. ঐ, পৃ. ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

রামপ্রসাদ একাই বের হয়েছে জমি দখল করতে। এবং লড়াই করতে করতে সে বরণ করেছে মৃত্যু।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বাসন্তী। একমাত্র বাসন্তীই এ উপন্যাসের প্রতিটি অংশে উপস্থিত থেকেছে। অন্যান্যরা—কিশোর-সুবল-অনন্তর মা—'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' অংশে মৃত্যুবরণ করে। অনন্তকে নয়া বসতের আগে পাওয়া যায় না। উদয়তারা-রমু-খুশী-বনমালী রামধনু অংশ থেকে ক্রমে হাজির হয়। সমস্ত উপন্যাসে বাসন্তীর উপস্থিতি সব সময়ই লক্ষ্য করা যায়। বাসন্তীর মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক মালোদের জীবন ধারাটি ব্যাপকভাবে উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন। অনেক সময় মনে হয়, তিনি বাসন্তীর মাধ্যমে মালোদের জীবনধারার এক ধরনের প্রতীকী উপস্থাপনায় উৎসাহিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের একটি অংশ উদ্ধৃত ধরা যায়:

> সুবলার বউ নিজেও আর উঠিতে পারে না। পা টিপ্ টিপ্ করে। মাথা ঘোরে। চোখের সামনে দুনিয়ার রঙ আরেক রকম হইয়া যায়। সে ভাবিয়া রাখিয়াছে, সকলের যা গতি হইয়াছে আমারও তাই হইবে। তার জন্য ভাবিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু ঘরে জল থাকা দরকার। শেষ সময়ে কাছে জল না থাকিলে নাকি ভয়ানক কষ্ট হয়। [২৫]

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে, মালোদের জীবন বিপর্যয়ের শেষ প্রান্তে এসে এ বক্তব্য থেকে তিতাসে জল শূন্যতাজাত ভয়াবহ পরিণতির ইশারা মেলে। তিতাস ও বাসন্তীর ধারাবাহিক উপস্থিতিতে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠে একটি পরিণতিতে পৌঁছেছে। বাল্যকালে বাসন্তীর মাঘমণ্ডপের ব্রত তৈরিতে অংশ নিয়েছিলো কিশোর ও সুবল। জলে ভাসানো চৌয়ারি ধরার জন্যে দুই ডানপিটে ছেলের দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। তাদের এ ঝগড়া-বিবাদ বাসন্তীকে কষ্ট দিয়েছে। বিশেষ করে বাসন্তী ব্যথিত হয়েছে কিশোরের জন্যে। এ প্রসঙ্গে বাসন্তী বলেছে :

> মা, ওমা, দেখ সুবল দাদা কিশোর দাদার কাণ্ড ! আমি চৌয়ারি জলে ছাড়তে না ছাড়তে তারা দুই জনে ধরতে গিয়া কি কাইজ্যা। এ কয় আমি নিমু, হে কয় আমি নিমু। ডরে আর কেউ কাছেও গেল না। শেষে কি মারামারি।[২৬]

বাসন্তী তাদের এই কাড়াকাড়ি সইতে না পেরে দুজনকেই রাখতে বলেছে চৌয়ারি। কিশোর

---

২৫. ঐ, পৃ. ১৫৫
২৬. ঐ, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

বাসন্তীর কথা মেনে নিয়ে ছেড়ে দেয় চৌয়ারি পাবার আশা। বাসন্তীর মনের কোণে সূক্ষ্ম দরদ লুকিয়ে ছিল কিশোরের জন্যে। প্রবাস খণ্ডে শুকদেবপুরে খলা বাইতে যাওয়ার সময় কিশোর ও সুবলের মধ্যে প্রেমভাব লক্ষ্য করা যায়। উভয়ে এ বিষয়ে আলাপ করেছে। সুবল ভেবেছে, বাসন্তী কিশোরের হাড়িতে চাউল রেখেছে।

কিন্তু কিশোরের মন রোমান্টিকতার পাখায় ভর করে উড়ে চলেছে অপ্রাপনীয়ের খোঁজে। ফলে কিশোরের সঙ্গে বিয়ে হলো না বাসন্তীর। শুকদেবপুরে কিশোরের বিয়ে হলো অনন্তর মায়ের সঙ্গে, যাকে নিয়ে ফেরার পথে ডাকাত দলের কবলে পড়ে স্ত্রী ও অর্থ সবই হারালো সে। ফলে সে হারিয়ে ফেললো মানসিক ভারসাম্য। অন্য দিকে বাসন্তীর বিয়ে হলো সুবলের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের পর পরই সুবলের মৃত্যু ঘটে জিয়ল মাছের কাজ করতে গিয়ে। বাসন্তীর পরিচয় কালক্রমে দাঁড়ালো সুবলার বউ। সুবল আকৃষ্ট বাসন্তীর প্রতি, বাসন্তীর প্রেম কিশোরের জন্যে, কিশোর পাগল হলো অনন্তর মায়ের জন্যে, অনন্তর মা অনুসন্ধানে রত পাগল হওয়া কিশোরের জন্যে, এ এক জটিল পরিস্থিতি। সে কারণেই হয়তো বাসন্তী মুগ্ধ অনন্ত ও তার মায়ের প্রতি। বাসন্তী যেন কিশোর-সুবল-অনন্ত-অনন্তর মা সকলের সঙ্গেই নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ; কিন্তু বাস্তবে সে কাছে পায় না কাউকেই। তবু বাসন্তী তার মানসিক সবলতা ও পরিশ্রমী স্বভাব নিয়ে সুতো কেটে জীবিকা নির্বাহ করেছে। এবং একই সঙ্গে সে সমাজের ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব অনেকখানি কাঁধে তুলে নিয়েছে। সে কারণেই হয়তো মালো সমাজে নারীরা কখনও কখনও হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। কালোবরণের মা, উদয়তারা, অনন্তর মা এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র মহিমায় মালো পাড়ায় উজ্জ্বল।

কিশোরের প্রতি বাসন্তীর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে নি ; প্রেমের শেষ আভাটুকু মিলিয়ে যায় কিশোরের উন্মাদগ্রস্ততায় এবং তা তার মনের গভীরে জ্বালিয়ে রাখে অন্তহীন বেদনার দীপশিখা। অন্য দিকে সুবলের সঙ্গে বিয়েতেও সুখী হয় নি বাসন্তী। একজনকে ভালোবেসে অন্য জনকে বিয়ে করার বিড়ম্বনা বেশী দিন অবশ্য সইতে হয় নি বাসন্তীকে। সুবল মারা গেছে জিয়ল মাছ ধরতে গিয়ে। সে মরণ ছিল বড় বীভৎস, ঝড়ের সময় নৌকার সঙ্গে তীরের আঘাত ঠেকাতে নদীতে নামলে সুবল একা নৌকোর গতি থামাতে পারে নি। ফলে তাকে পড়তে হয় নৌকার নীচে। স্বামীর

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু আর পূর্ব প্রেমিকের উন্মাদ হওয়ার ঘটনার মাঝখানে পড়ে যেন অনেকটা নিস্তব্ধ হয়ে যায় বাসন্তী।

বাসন্তী বন্ধুবৎসল। সে কারণেই সে মঙ্গলার বউয়ের চেয়েও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে অনন্তর মাকে সমাজভুক্ত করার ক্ষেত্রে। এবং অনন্তর মাকে সাহায্য করতে গিয়েই তার দ্বন্দ্ব হয় নিজ মায়ের সঙ্গে। অভাবই যেন তার নৈতিকতা টিকিয়ে রাখতে দেয় নি। অন্য পাড়ায় ময়নার সঙ্গে কথা বলা নিয়েও তার মায়ের সঙ্গে বাসন্তীর হয়েছে বিবাদ। এ প্রসঙ্গে বাসন্তী তার মাকে বলেছে:

> মনে কইরা দেখো কোন শিশুকালে বিয়া দিছিলা মইরা গেছে। জানলাম না কিছু, বুঝলাম না কিছু। সেই অবুঝ কালে ধর্মে কাঁচারাড়ি বানাইয়া থুইছে। সেই অবধি পোড়া কপাল লইয়া বনে বনে কাইন্দা ফিরি। তোমরা ত সুখে আছে। তোমরা কি বুঝবা আমার দুঃখের গাঙ কত গহীন। আমার বুঝি সাধ আহ্লাদ নাই।[২৭]

এ যেন বঞ্চিত এক নারীর জীবন বেদনার প্রকাশ। বাসন্তীর এই জীবনাগ্রহ, জীবন তৃষ্ণা থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে যে সমাজ, সেখানে বিধবা বিয়ের প্রচলন ঘটাতে পারে নি রামপ্রসাদ। তার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হলো এক পর্যায়ে অনন্তর মা। সে কারণেই অনেক ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে অনন্তর মাকে সাহায্য করেছে বাসন্তী। তবে বাসন্তীর এ সাহায্যের অন্তরালে মানবিক মূল্যবোধ এবং কিশোরের প্রতি তার ভালোবাসার প্রভাবও রয়েছে বলে মনে করা যায়। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> ...তা না হলে অনন্তকে ঘিরে এই সর্বরিক্ত নারীর বেঁচে উঠার আকাঙ্ক্ষা পুষ্ট হবার কোন অর্থ নেই।[২৮]

বাসন্তীকে ঔপন্যাসিক 'বিপ্লবী নারী' বলে উল্লেখ করেছেন। তার মন বিপ্লবী হতে প্রলুব্ধ হয়েছে বিদ্যমান সমাজ কাঠামো বদলাতে। ফলে বাসন্তী হয় নি অনন্তর মায়ের মতো সংসারী। বাসন্তী জেগে উঠতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে অর্থনৈতিক শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বাসন্তী হয়ে ওঠে গোকণঘাটের জনমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতিনিধি। বাসন্তী সুবলের জীবন দেখেই বুঝেছে, ধনীরা দরিদ্র মজুর-শ্রমিকদের প্রতি অনুকূল নয়। সে জন্যেই হয়ত বাসন্তী বাইরের সংস্কৃতিতে হয়েছে অবিশ্বাসী ; 'বাজাইরা' সংস্কৃতি, চটুল যাত্রার প্রতি জন্মেছে তার ক্ষোভ। পাটনীপাড়ার

২৭. ঐ, পৃ. ১৫৬
২৮. ঐ, পৃ. ১৫৭ (ভূমিকা)

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বিনীর গান প্রথম দিন সহ্য হলেও দ্বিতীয় দিন তার অসহ্য মনে হয়েছে। বাসন্তী তাই বেরিয়েছে রণমূর্তি নিয়ে এবং সবার সামনে বলেছে :

> ইটা আমার বাপের দেশ ভাইয়ের দেশ, ইখানে আমি কারুকে ডরাইয়া কথা কই না। ইখানে আমারে যেজন আজ্‌নাইব, এমন মানুষ মার গর্ভে রইছে।[২৯]

বাসন্তীর এই বিদ্রোহী মনই এক দিন মালো পাড়ার মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া তেলিপাড়ার এক যুবককে দিয়েছে জীবনের শিক্ষা। তারই অনুপ্রেরণায় মালোর জোয়ান ছেলেরা তাকে গলা টিপে মেরে গোপনে ফেলে দিয়েছে নদীতে। তার লাশ আর পাওয়া যায় নি। সেই থেকে মালো পাড়া ও ভদ্র লোকদের পাড়ার মধ্যে তৈরি হয় বিরাট দ্বন্দ্ব। মালোর সংস্কৃতি ভাঙার ষড়যন্ত্র শুরুও হয় সে দিন থেকেই। বাসন্তী এই গভীর সঙ্কটে মালোদের সংগঠিত করতে চেয়েছে, কিছু সংখ্যক মালো তার সঙ্গে একত্র হয়ে নিজ মালো গোষ্ঠীর মর্যাদা রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক পর্যায়ে বাসন্তী ফিরে এসেছে আপন গৃহে মায়ের কাছে। সে যেন তার মাকে অধিকার করেছে নতুন করে। কিশোর, সুবল, অনন্তর মা, সন্তানতুল্য অনন্ত কেউ-ই তার আপন হলো না। অন্য দিকে সে ফেরাতে পারে না নিজ সংস্কৃতির ভাঙনও। যখন নদী শুকিয়ে মালোদের অস্তিত্ব বিপন্ন করলো, তখনও বাসন্তী খুঁজেছে স্নেহ-বাৎসল্যের আশ্রয়। সে অনুধাবন করেছে নির্ভরতার আশ্রয় ছাড়া বাঁচা যায় না। এই অনুভবের কারণেই বাসন্তী আগ্রহী হয়েছিল অনন্ত-অনন্তবালার বিয়েতে অনন্তর মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করতে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে বাসন্তী কিছুটা ব্যর্থ হলেও, তিতাস নদী মরে গেলেও, সে দিনের সেই তিতাস ও তার তীরবর্তী মানুষের জীবন প্রবাহে বাসন্তীই হয়ে থাকলো সবচেয়ে স্মরণযোগ্য চরিত্র।

কাহিনীতে দীর্ঘ স্থান জুড়ে না থাকলেও উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে উদয়তারা। অনন্তকে ঘিরে উদয়তারার চরিত্রটি বেশি আলোকিত। বাসন্তী ও উদয়তারার মধ্যে মারামারি হয়েছে অনন্তকে নিয়েই। অনন্তর মায়ের এক ধরনের সংযত ও একমুখী ভাবভঙ্গির পাশে চঞ্চল, প্রগলভ নারী উদয়তারার উপস্থিতি কাহিনীতে এনেছে বৈচিত্র্য। নবীনগরের বনমালীর বোন উদয়তারার স্বামীর বাড়ী গোকর্ণঘাট। সে তার এলাকায় সুপরিচিত কথায় কথায় ছড়া কাটে বলে। সে একই সঙ্গে জামাই-ঠকানী হিসেবেও পরিচিত। এ সব কারণে তাকে সমীহ করে মেয়েরা। তার

---

২৯. ঐ, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

আচরণের মধ্য দিয়ে মালো নারীদের নানা বৈশিষ্ট্য যেন দীপ্যমান। উদয়তারা সম্পর্কে এক জন সমালোচক বলেছেন :

> সব মিলিয়ে উদয়তারা হয়েছে এ উপন্যাসের লোক সংস্কৃতি তথা মৌখিক কৃষ্টিচক্রের মূর্তিমতী প্রতিনিধি।[৩০]

সন্তানহীন উদয়তারার মানসিক পরিবর্তন ঘটে অনন্তকে পাওয়ার পর। নবীনগরে তাকে ডাকতে এসে ব্যর্থ হয়েছে মেয়েরা। তার ভালো লাগে না কথায় কথায় শ্লোক কাটা। সন্তানহীনার বেদনা ঢাকতে উদয়তারার এ ছিল এক কৌশল। তার হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নৌকা বাইচের দিন অনন্তকে রক্ষার যুদ্ধে বাসন্তীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে। উদয়তারার এই কঠিন স্বভাবের ভেতর ছিল কোমলতাও। সে জন্যেই বাসন্তীর কাছে সহজে ক্ষমা চাইতে পেরেছে সে। তার কোমল চরিত্রের পরিচয় বনমালীর বিয়ে প্রসঙ্গেও দেখা গেছে। মালো সমাজে বিয়েতে পণ প্রথা চালু থাকায় আর্থিক সমস্যায় বনমালী বিয়ে করতে পারছিল না। বোনদের বিয়ে থেকে পাওয়া টাকা সমাজের লোকদের দাওয়াত খাওয়াতেই শেষ হয়ে গেছে। ফলে ভাইয়ের মাথায় 'সোলার মুকুট' না ওঠায় উদয়তারা ব্যথিত। সে জন্যে সে তার মেজদির স্বামীর কাছে জানতে চেয়েছে তার কোন বোন আছে কি না যাতে করে কম পণে তার বিয়ে হতে পারে। উদয়তারা আসলে কঠোরে-কোমলে গঠিত এক নারী।

অনন্তর মা উপন্যাসের একটি অন্যতম নারী চরিত্র। উপন্যাসে এ নারীর নাম নেই, ছেলে অনন্তর মা হিসেবে সে তার পরিচয় লাভ করে। একজন সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সমাজ-মনই' অনন্তর মায়ের নামহীনতার কারণ বলে ভাবা যায়।[৩১] প্রথম দর্শনেই প্রেমে আক্রান্ত হয়েছিল অনন্তর মা, কিশোরকে দেখে। নৃত্যরত মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়েছিল কিশোরও, মেয়েটির তাল কেটে যায় তাকে দেখে। প্রথম দর্শনের সেই মুগ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। দিন কয়েক পর তারা বিয়ে করতে চাইলে বাঁশিরাম মোড়লের স্ত্রী দু জনের হাতে দটো ফুলের মালা তুলে দিয়ে দেশে গিয়ে শাস্ত্রমতে বিয়ে করার পরামর্শ দেয়। মালা বদল করে গান্ধর্ব বিয়ের সুবাদে স্ত্রীকে নিয়ে কিশোর তার নিজ গ্রাম গোকণঘাটের পথে যাত্রা করে। কিন্তু হাওরে ডাকাতের কবলে পড়ে সে হারিয়ে ফেলে তার স্ত্রী ও টাকাপায়সা। ফলে কিশোর পাগল হয়ে যায়। এর পর নদীর তীর থেকে

---

৩০. ঐ, পৃ. ১৫৯ (ভূমিকা)

Dhaka University Institutional Repository

গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মালো উদ্ধার করে মৃতপ্রায় অনন্তর মাকে। তাদের মাধ্যমেও মেয়েটির কোন নাম জানা যায় নি। দুঃখ-বেদনার মধ্যে বেড়ে ওঠা অনন্তর মা অপরিসীম ধৈর্যশীলা। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মালোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অনন্তর মা যায় গোকণঘাটে। অচেনা, অজানা শ্বশুরালয়, সেখানে কেউ তাকে চিনবে না, জানবে না, যে চিনবে সে তখন উন্মাদ অবস্থায়। পাগল কিশোর যে তার স্বামী, সে কথাও সঠিকভাবে জানা নেই তার। সে দিনের হাঙ্গামার মধ্যে জানতে পেরেছিল কিশোরের গ্রামের নামটি কেবল। এ সম্বল নিয়েই তাকে যেতে হয়েছে স্বামীর ভিটায় বাস করতে। বাস্তবতার এ পটভূমিতে অনন্তর মায়ের জীবনাকাঙ্ক্ষা বলতে থাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। গোকণঘাটের নতুন বসতিতে কালোবরণের মা ও বাসন্তীর সহায়তায় সে কোনক্রমে টিকেও থাকে। সুতো কাটার কাজ শেখে সে বাসন্তীর কাছে। গ্রামের লোকদের কাছে সে পরিচিত হয় ধর্মভীরু মহিলা হিসেবে। পূজা-পার্বণে মন্দিরের পুরোহিতকে সে নানা ভাবে সাহায্য করে। গোকণঘাটে বাসন্তীকে আশ্রয় করেই অনন্তর মায়ের দিন কাটে । রূঢ় সমাজ বাস্তবতার মধ্যে বাসন্তীই যেন তার একমাত্র সহযাত্রী। কিশোরকে ভালোবেসেছিলো বাসন্তী, তা তাকে ভুলতে হয় চিরতরে, আবার অনন্তর মাকে ভালোবেসেছিলো কিশোর, সে পাগল হয়ে গেলে এ ভালোবাসাও হয় ব্যর্থ। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির আগের রাতে রামকেশবের বাড়িতে তিনজন নারী পিঠা তৈরির কাজ করছিলো। পিঠা তৈরির অনুকূল আলাপে মেতে ওঠে দুজনেই। সঙ্গে থাকা মঙ্গলার বউ নিদ্রাভিভূত। আলাপের মাধ্যমে বাসন্তী বুঝতে পারে অনন্তর মায়ের পরিচয়, অনন্তর মাও বুঝতে পারে কিশোর পাগলাকে ভালো করার জন্যে তার মনে বাসনার কথা। দোল-উৎসবের দিন নিষ্প্রাণ রাধামাধবকে আবির না দিয়ে অনন্তর মা তাই আবির ছুঁড়েছিল পাগল কিশোরের দিকে। তার অন্তরের অদম্য ইচ্ছার কথা গোপন করে সে বলেছিল, পাগলেরে কেউ রাঙালো না, সে যেন তাকে রাঙিয়েছে। এ প্রসঙ্গে নারীর জন্যে পুরুষ মানুষ দরকার বলে বাসন্তী অনন্তর মায়ের কাছে রসিকতা করলেও, তা আবার মিলিয়ে যায় অনন্তর প্রতি মাতৃত্বের প্রবল টানে। দুই নারীই মনে করে :

> পুরুষ মানুষ দিয়া কি হইব। তারা বৃষ্টির পানি-ফোঁটা, ঝরলেই শেষ। তারা জোয়ারের জল। তিলেক মাত্র সুখ দিয়া নদীর বুক শুইষ্যা নেয়। এই অনন্তই আমরার আশা-ভরসা।

৩১. ঐ, (ভূমিকা) পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

দুই জনে এরেই মানুষ কইরা তুলি চল। এ-একদিন আমরার দুঃখ ঘুচাইব।[৩২]

পাগলকে আবির মাখানোর মধ্য দিয়ে অনন্তর মা তার পূর্ব স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। সে জানে, প্রিয়জন হারানোর কারণে যে পাগল হয় সে প্রিয়জনকে ফিরে পেলে সুস্থ হয়ে ওঠে। এ কারণে অনন্তর মা পাগলকে সুস্থ করার জন্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে যা মনোবিজ্ঞান সম্মত। পরের বছরও দোল-উৎসবের দিন অনন্তর মা পাগলকে আবির মাখিয়ে পরিচর্যা করেছে ; ফলে সে প্রায় ফিরে এসেছিলো জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে। কিন্তু মানুষের হৃদয়হীনতার কারণেই তা ব্যর্থ হয়। কিশোরের মৃত্যুর পর অনন্তর মা-ও চারদিনের ব্যবধানে বরণ করে মৃত্যু। যেন এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা ছিল দুজনের জন্যে একই পরিণতি।

বিভিন্ন নামে যার পরিচিতি এ উপন্যাসে তার নাম খুশী। রমুর মা, ছাদিরের স্ত্রী, নিজামত মুহুরীর মেয়ে, কাদিরের পুত্রবধূ—এতগুলো তার পরিচয়। এ চরিত্রটি অদ্বৈত মল্লবর্মণের দেখা স্বচ্ছল মুসলমান গৃহবধূর। খুশীকে ঔপন্যাসিক যেন হঠাৎ আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন।

নিজামত মুহুরী যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে পারে নি বলে, সে গোপনে দেখতে আসে মেয়েকে। সে দিনই বেয়াই কাদির মিয়া সংবাদ পেলো যে তার নামে মাগন ঠাকুর মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। পিতা-পুত্র কাদির মিয়া ও ছাদির মিয়া সে বিষয়ে ঘরে বসে আলাপ করছিল। নিজামত মুহুরী ও মাগন ঠাকুর শিক্ষিত হলেও দুষ্ট প্রকৃতির। এ কারণে, কাদির মিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ঠিক করেছে যে, নাতি রমুকে স্কুলে পড়তে দেবে না। সে সময় উপস্থিত নিজামত মুহুরী কাদির মিয়াকে অযাচিত ভাবে এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার কথা কাদির মিয়া শুনতে নারাজ। পরে দু জনার মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। বাপের অপমানজনক অবস্থা দেখে খুশী বলে বসে :

> সাধে কি লোকে বলে পরের ঘর। পরের ঘরই ত। যে ঘরে আসিয়া বাপ হয় চোর, আর নিজে হয় বিষমুখী, সে-ঘর কি আপনা ঘর।[৩৩]

খুশীর আক্ষেপ শুনে কাদির মিয়া ভাবে, তার নিজের মেয়েও যদি স্বামীর বাড়িতে এমন অবস্থায় পড়ে তা হলে সেও একই রকম কষ্ট পাবে। খুশীর কথায় কাদির মিয়া যেন সংবিত ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করে নিজেকে। কি করে এ ঘর তার পরের ঘর। রাত পোহাতেই বিশটি গরুর গোয়াল সাফ

৩২. ঐ১. পৃ. ৭২
৩৩. ঐ, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

করা, খাবার খাওয়ানো, ঝাঁট দেয়া, উঠোন-বাড়ি পরিষ্কার করা, পানি তোলা, রান্না করা, সবার খাবার পরিবেশন করা, ধান শুকানো, ধান ভানা প্রভৃতি হাজারও কাজ করেও কিনা পরের বাড়ি, পরের বাড়ির মেয়ে। কাদির মিয়ার এ মনোভাব জানতে পেয়ে খুশী হয় আনন্দিত। আবেগে কেঁদে ফেলে সে। এ ভাবেই সে যেন এক ধরনের স্বীকৃতি পায় তার শ্বশুর বাড়িতে। দুই পরিবারের সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব মূলত দুই ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। কাদির মিয়ার উপলব্ধির মাধ্যমে তা যেন পৌঁছে যায় এক মীমাংসায়। স্পষ্টবাদী খুশীর অন্য রূপও লক্ষণীয়। এক দিন গোয়াল ঘর থেকে গোবর ফেলতে যাওয়ার সময় রমু ও অনন্তকে এক সঙ্গে খেলতে দেখে সে গাছ থেকে শসা পেড়ে তাদের দিয়েছিল। কর্তব্য পালনে ও সেবা প্রদানে একই মাত্রায় সতর্ক খুশী। একই সঙ্গে সে মাতৃস্বভাবা ও আত্মমর্যাদা সচেতনও। খুশী বাংলার চিরকালীন গৃহবধূর প্রতিনিধি যেন।

তিতাস নদীর তীরে বসবাসরত এক মুসলমান পরিবারের শান্ত স্বভাবের নারী জমিলা। উপন্যাসের প্রথম দিকেই দেখা যায় জমিলার উপস্থিতি। এক দিন সে তার স্বামীর সঙ্গে ভাড়া করা নৌকোয় বাপের বাড়ি থেকে আসছিলো। নৌকা থেকে নেমে সাপের ভয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে ভয় পাচ্ছিল জমিলা। জমিলার আশঙ্কার কথায় মাঝি ও তার স্বামী চুপ করে থাকে। কিন্তু তার স্বামী ছমির মিয়ার মনে আনন্দ। খুশিতে মাঝিকে সে নির্ধারিত ভাড়ার চারগুণ দেয়, যদিও সে হিসাবী লোক। এটা দেখে জমিলা ভাবে, বড় ভালো লোক তার স্বামী। বস্তুত, চরিত্রের সরলতাই জমিলার বৈশিষ্ট্য। সে নদীর ঘাটে অপরিচিত উদয়তারাকে দেখে মুগ্ধ হয়। এক দিন কাছে পেয়ে জমিলা তাকে আপন করে নেয়। আনন্দে আত্মহারা হয় জমিলা। সে তার ভাবীকে বলে, উদয়তারা যেন তার বহু জনমের চেনা। জমিলার এই সহজ-সরল জীবনভঙ্গি উদয়তারাকে আশ্চর্য করে। সরল স্বভাবের নারীদেরই এক প্রতিনিধি যেন জমিলা।

অনন্তবালার জীবনে বাল্য প্রেম সূচিত হয়েছিল অনন্তকে দেখে। কিন্তু অনন্তর কাছ থেকে সাড়া না মেলায় সে প্রেম আর পথ খুঁজে পায় নি। পেলে, হয়তো অনন্তবালাই হয়ে উঠতো 'তিতাস একটি নদীর নাম'- এর নায়িকা চরিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

নবীনগরের কাছে সাদকপুর গ্রামে মনসা পূজার দিন অনন্ত ও অনন্তবালার পরিচয় ঘটে। পূজার স্থানে মনসার মূর্তির দু পাশের অনেক শাপলা ফুল থেকে কিছু কুড়িয়ে নিয়ে অনন্তবালা মালা গেঁথেছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে অনন্তবালা এক সময় অনন্তর গলায় পরিয়ে দিয়েছে সে মালা। অনন্ত নিমেষে গলা থেকে খুলে নিয়ে সেটি জড়িয়ে দিয়েছে অনন্তবালার খোঁপায়। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া এ মালাবদলের কথা অনন্তবালা ভোলে নি কোন দিন। অনন্তবালার প্রেমানুভূতি অনন্তকে আশ্রয় করেই যেন সজীব থেকেছে সর্বক্ষণ।

অনন্তবালা ও অনন্তর মধ্যে পার্থক্য অনেক ; অনন্ত কথা বলে কম, সে পর্যবেক্ষক ও শ্রোতা। প্রতিটি মানুষকে সে যেন গভীর ভাবে অবলোকনের শক্তি রাখে। অন্য দিকে অনন্তবালা কথা বলে বেশি। অনন্তর কেউ নেই, মাসী ছাড়া। অনন্তবালার রয়েছে মা, বাবা, অনেক আত্মীয়। সকলেরই আদরের পাত্রী সে। অনন্তবালা অল্প বয়স থেকেই শ্লোক-ছড়া কাটতে শিখেছে। অনন্তবালা গভীর মুগ্ধতা নিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে অনন্তকে চলে যেতে বলেছে অন্যত্র। কিন্তু অনন্তর নেই চালচুলো। সুতরাং ঐ ধরনের প্রস্তাব বিবেচনার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য, অনন্তবালার ধারণা, মানুষ মানুষকে নিয়ে যায়। অবশেষে অনন্ত তাকে মেলায় নিয়ে যেতে রাজী হয়েছে। গামলায় চড়ে মানুষকে যেতে দেখে অনন্ত ভাবে ও রকম একটা গামলা হয়তো আনা যেতো। অনন্তর এ কথায় অনন্তবালা বলেছে :

> তুমি একলা পারতা নাকি, জিগাই? তুমি ঐ লোকটার মতন চালাক, না চতুর ? বৈঠা হাতে লইয়া চাইয়া থাকবা দৌড়ের নাওয়ের দিকে, আর কোন্ খানের কোন্ যাত্রিকের নাও দিব ধাক্কা। ঠুন্‌কা গামলা ভাঙ্গলে তখন কি হইব। তুমি আমি দুইজনে থাকলে কোন ডর নাই ; তুমি যখন একদিকে চাইয়া থাকবা, গামলারে আমি তখন সামলামু। আর গামলা যদি ভাইঙ্গা যায়, তখন তুমি আমারে সামলাইও, কেমুন ?[৩৪]

এ যেন কৈশোরের কাব্যিক নির্ভরতা। হয়তো কোন দিন এমনটি হওয়ার নয় ; তবু মধুময় এক স্বপ্ন দেখা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমও যেন এ ভাবেই সূচিত হয়েছিল। তবে, অনন্ত ও অনন্তবালার এ বাল্য প্রেমানুভূতি প্রতাপ-শৈবলিনীর মতো বিকশিত হয়ে তীব্রাকার ধারণ করে নি। অভিভাবকদের আগ্রহীনতার কারণে অনন্তবালার স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত থাকে নি।

---

৩৪. ঐ, পৃ. ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

শুধু এক ধরনের মুগ্ধতার মধ্যে সময় কেটেছে অনন্তবালার। কিন্তু, অনন্ত নিজে ধাবিত হয়েছে অন্যদিকে :

> তারপর আসিল যুক্তাক্ষর। এ গুলি কঠিন এবং জটিল। কিন্তু এই কঠিনতায় জটিলতায় যে একটা মোহ আছে, অনন্তকে তাহা পাইয়া বসিল। তারা নতুন নতুন রূপ নিয়া তার মানসলোকে আপনা থেকে আসিয়া ধরা দিতে লাগিল।[৩৫]

জীবন দৃষ্টির এই পার্থক্যই জীবনে তাদের স্থায়িভাবে একত্র হতে দেয় নি। একজন সমালোচক বলেছেন :

> প্রকৃতি আর সংস্কৃতি-এর দ্বন্দ্বটি অনন্তবালা-অনন্তর মধ্যে দেখানো যেত। অদ্বৈত সে দিকে বেশি হাঁটেন নি। তাই লিখছিলাম চরিত্রটির সম্ভাবনা সমস্তটুকু নিষ্কাশিত করেন নি লেখক।[৩৬]

অনন্তবালার আত্মীয়রাও চেয়েছিলো অনন্তর সঙ্গে তার বিয়ে দিতে। কিন্তু কোন ভাবেই তারা ধরে রাখতে পারে নি অনন্তকে। আসলে এ ধরনের একপক্ষীয় প্রেম কোন দিশা পায় না। অনন্তবালার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। তা সত্ত্বেও অনন্তবালা তার অনুভূতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে নি। কুমারী অনন্তবালা অনন্তর প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট থেকেই বাপের হাত ধরে চলে গেছে কলকাতায়। এর পর থেকে অনন্তবালার আর কোন খবর মেলে নি। তবে, তার জীবনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে থাকলে লেখক নিশ্চয়ই তার উল্লেখ করতেন।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাস নদীর তীরবর্তী । বহু সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ কাহিনীতে ভূমিকা পালনে কেউ মুখ্য, কেউ গৌণ, কেউ কেউ কিছু দূর পর্যন্ত থেকেছে উপন্যাসের প্রবাহের সঙ্গে ; কেউ কেউ আবার এক বার এসেই চলে গেছে চিরতরে। কিন্তু তাই বলে কোন চরিত্রকেই অহেতুক গণ্য করা যায় না। বিজয় নদীর তীরবাসীদের দুঃখের সাক্ষী গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মালো। পরবর্তীতে এ একই নামের দুই মালো-জেলের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল অনন্তর মা। ডাকাতের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিশোরের স্ত্রী সে দিন যদি ঐ দুই বৃদ্ধের কাছে আশ্রয় না পেতো, তা হলে উপন্যাসের কাহিনী হয়তো অন্য ধারায় প্রবাহিত হতো। করমালী ও বন্দালীর মতো কৃষক মজুরের জীবনচিত্র আমাদের ব্যথিত করে। নৌকা বাইচের উৎসব উপন্যাসকে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে জাগ্রত কিশোরের প্রেমের ভুবন ডাকাতের হাতে পড়ে ধ্বংস না হলে কিশোর-নির্ভর কাহিনীটি অন্য মাত্রায়

৩৫. ঐ, পৃ. ১৩৭
৩৬. ঐ, পৃ. ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বিকশিত হতে পারতো। বনমালী ও ধনঞ্জয় না থাকলে বাঁচতো না কৃষক কাদিরের আলুর নৌকা। অনন্ত বনমালীর মাধ্যমেই নবীনগরে উদয়তারার আশ্রয়ে পৌঁছাতে পেরেছিল। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় অনন্তবালার। তবে, সেখানে আটকে থাকে নি অনন্ত। সে উচ্চ শিক্ষার আশায় চলে যায় কুমিল্লা শহরে। মহাজন রশিদ মোড়ল, মাগন ঠাকুর, বিধুভূষণ পালের শোষণে মালোরা কি ভাবে নিঃস্ব হয়েছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। বাসন্তীর সঙ্গে মোহন যে পাড়ায়-মহল্লায় জনমত গড়ে তোলার কাজে অংশ নিয়েছে, তা এ উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট চিত্র। আরও অনেক ছোট খাট চরিত্র এ উপন্যাসে পালন করেছে নানা ভূমিকা। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাঁশিরাম মোড়ল, তিলক চাঁদ, মঙ্গলার বউ, কৃষ্ণচন্দ্র, দয়াল চাঁদ, ভারত, রামকেশব, কালোবরণ, গুরুদয়াল, শ্যামাসুন্দর, নন্দর মা, বিপিন, ময়না, রামদয়াল, রাধাচরণ মালো প্রমুখ।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাস তীরের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের মাধ্যমে মালোদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-বেদনা, মোট কথা তাদের ধ্বংসের বিস্ময়কর কাহিনীর সঙ্গে যে সব সফল চরিত্র উপস্থাপনা অদ্বৈত মল্লবর্মণ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান চরিত্র তিতাস নদী। তিতাস নদীকে এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায়। তিতাসকে কেন্দ্র করেই এ উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্র বিকাশ লাভ করেছে। বস্তুত, সাধারণভাবে তিতাস ছাড়া কোন চরিত্রই বিকশিত হয় নি। এর কারণ বিশেষ কোন চরিত্র সৃষ্টির জন্যে লেখকের এ লেখা নয়। তাঁর উদ্দেশ্য তিতাস তীরবর্তী মানুষের জীবনালেখ্য রচনা করা। সে জন্যেই কিশোর, বাসন্তী, অনন্তর মা, অনন্ত, অনন্ত বালা কেউ-ই উপন্যাসে সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নি। লেখক তাদের তিতাসের বহমান ধারার সঙ্গে একীভূত করে দেখতে চেয়েছেন। । যত দিন তিতাস নদী ছিল গতিশীল তত দিন তিতাস তীরের মানুষেরা ছিলো প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্দাম। এক সময় তিতাসের বুক চিরে জেগে ওঠে মাটির ঢিবি। প্রায় একই সময় তিতাস তীরের বাসিন্দারা হয়ে যায় উদাসীন, অন্যের সংকর সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি যায় ভুলে। তিতাস তীরের মানুষের জীবন তিতাস ছাড়া অচল বলেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাস নদী পালন করেছে উল্লেখযোগ্য চরিত্রের ভূমিকা।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর তীরবর্তী মালো-জেলেদের কর্ম-ধর্ম-স্বপ্ন-সংস্কৃতি ভিত্তিক জীবন নিয়ে রচিত। শুধু এ অঞ্চলের মানুষের কাহিনী এবং তার সীমার মধ্যেই সেটি আবদ্ধ থেকেছে। এমন কি কাহিনীটি নিকটস্থ কুমিল্লাতেও বিস্তৃত

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে নি। সে কারণে, উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে একটি অঞ্চল ভিত্তিক। সে দিক থেকে বলা যেতে পারে 'তিতাস একটি নদীর নাম' একটি ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ভর হয়ে সূচিত ও বিকশিত হয়েছে। ঐ অঞ্চলের অখণ্ডতা কাহিনীর কোন পর্যায়ে খণ্ডিত হয় নি। উক্ত অঞ্চলের বাইরের মানুষ ও প্রকৃতির ব্যাপক কোন খোঁজ খবরও উপস্থাপিত হয় নি এ রচনায়। উপন্যাসটির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে থেকে উপন্যাসের চরিত্রগুলো নিয়ত সংগ্রামশীল থেকেছে বেঁচে থাকার জন্যে। চলমান জীবনে তাদের দুঃখবহ পরিণতি রচনার কুশলতায় গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। এ সব বৈশিষ্ট্যের আলোকে 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে অনেকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় যে জীবনকে অঙ্কন করেছেন, সে জীবন নগর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত-মানসের অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত। তিতাস-বিধৌত জনপদের স্থানিক বর্ণিমার সঙ্গে সে অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত রূপায়ণসূত্রে এ উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস-সাহিত্যে এটি একটি কালজয়ী সংযোজন।[৩৭]

একটি আঞ্চলিক উপন্যাসে কাহিনীর একটি অঞ্চল-ভিত্তিক নির্ভরতা থাকে অপরিহার্যভাবে। এ বিষয়ে একজন সমালোচক বলেছেন :

> কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের অনুপুঙ্খ– সেই অঞ্চলের মানুষের পেশাগত বৈশিষ্ট্য আর ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের পরস্পরিত সম্পর্ক। আসলে ভৌগোলিক পরিবেশ আর মৌলিক বৃত্তির লোকায়ত মানুষ–এরই টানাপোড়েনে নিখুঁতভাবে বিন্যস্ত হয় আঞ্চলিক উপন্যাস।[৩৮]

আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও একজন সমালোচক জানিয়েছেন :

> A regional writer is one who concentrates much attention on a particular area and uses it and the people who inhabit it as the basis of his or her stories. Such a locale is likely to be rural and or provincial.[৩৯]

৩৭. গিয়াস শামীম, বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৬

৩৮. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

শুধু কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে কোন অঞ্চলের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে উপস্থাপন করা একজন লেখকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থানের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা যদি লেখকের কল্পনা ও অনুভূতির সঙ্গে সুসমন্বিত হয়, তা হলে জন্ম নিতে পারে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ক্ষেত্রে প্রায় এমনটি ঘটেছে বলা যেতে পারে। মালোর সন্তান অদ্বৈত তিতাস পাড়ের মালো জীবনের সঙ্গে আজন্ম সম্পর্কিত। মালোদের জীবনের বঞ্চনা ও যন্ত্রণার সঙ্গে সুপরিচিত বলেই অদ্বৈতের পক্ষে এ ধরনের একটি এ উপন্যাস লেখা সহজতর হয়েছে।

একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পটভূমির সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ সংশ্লিষ্টতা। তিতাস নদীর উৎসস্থল ও মোহনার মাঝামাঝি সাদকপুর থেকে নবীনগর, গোকর্ণঘাট, আমিনপুর, বিরামপুর, ভৈরববাজার, নয়াকান্দা, শুকদেবপুর, উজানীনগর পর্যন্ত বিস্তৃত নদীর প্রবাহ-পথই এ উপন্যাসের নির্বাচিত ভৌগোলিক অঞ্চল। পাশের মেঘনা ও বিজয় নদীও সংশ্লিষ্টতায় উল্লেখ্য। তিতাস নদীর ভৌগোলিক পরিবেশ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা আছে যে, 'ঝড়-তুফানের রাতেও'[৪০] তিতাসের বুকে মাছ ধরতে যাওয়া স্বামীপুত্রদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয় না স্ত্রীরা, মায়েরা। কারণ, তিতাস প্রকৃতিতে শান্ত।

এ ভৌগোলিক পরিসরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর জীবন তিতাস নদী ও তার আচরণের বাইরে খুব একটা যায় নি। এ উপন্যাসের কাহিনী গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রথাগত সাংগঠনিক কাঠামো অনুসৃত হয় নি বললেই চলে। তিতাস তীরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েই যেন উপন্যাসটি তৈরি করা হয়েছে। লেখক যেন প্রকৃতির মতো ভ্রূক্ষেপহীনভাবে তাঁর চিত্রগুলো সাজিয়ে গেছেন। তবে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার প্রতিবেশের সঙ্গে উপন্যাসের মূল সুরের রয়েছে সুগভীর ঐক্য।

---

৩৯. J.A. Cuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, London, 1992, p. 782

৪০. অচিন্ত্য বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসটির কাহিনী বা ঘটনার সূত্রপাত ঘটে পূজাব্রত কেন্দ্র করে ; দিননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তীর 'মাঘমণ্ডলের ব্রতে' চৌয়ারি বানানো এবং ভাসানো নিয়ে। এ পূজার মাধ্যমে কুমারী মালোর কন্যারা উপযুক্ত বর প্রার্থনা করে। কিশোর ও সুবলের মাধ্যমে তৈরি হয় বাসন্তীর চৌয়ারি। তা কেন্দ্র করেই দুরন্ত দুই বালকের অনুরাগ জন্মে বাসন্তীর প্রতি। কুমারী কন্যাদের জন্যে চৌয়ারি ব্যবস্থার মাধ্যমে বর প্রার্থনা জেলেদের রীতি। শত দুঃখবেদনার মধ্যেও তারা তাদের এ উৎসব-অনুষ্ঠান করে থাকে। এখানে এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির ঘটে স্বাভাবিক যোগাযোগ। এর মধ্য দিয়েই সূচিত হয় কিশোর, সুবল ও বাসন্তীর ভবিষ্যতের জীবনবোধ। কিশোরের প্রতি বাসন্তীর অনুরাগ প্রকাশ পায় তার কথায়। সুবলের মধ্যেও কিশোর ও বাসন্তীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সম্পর্কিত ধারণা বদ্ধমূল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বাসন্তী ও সুবলের বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণ করে কিশোর।

শুকদেবপুরে অবস্থান করার মধ্যে যেন কিশোরের জীবনবোধের পরিবর্তন ঘটে । সেখানে 'খলা' বাইতে যাওয়া-আসার পথের নদী-প্রকৃতির বহু বিচিত্র রূপ কিশোর-সুবলের জীবনের সঙ্গে যেন নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। নদী পথেই তারা সেখানে উপস্থিত হয়েছে। নদীকে অবলম্বন করেই যেন কিশোর লাভ করেছে সুন্দরী নর্তকী স্ত্রী। আবার নদী পথেই ডাকাত হরণ করেছে তার স্ত্রী ও অর্থ। নদী পথ অথবা নদী নির্ভর জীবন প্রায়ই ঝুঁকিপূর্ণ। মেঘনার যে মোহনায় তারা বিপদগ্রস্ত হলো সেটিও বিপদসঙ্কুল। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা আছে :

> মোহনাটি সত্যই ভয়ঙ্কর। এপার হইতে ওপারের কূল-কিনারা চোখে ঠাহর করা যায় না। হু হু করিয়া চলিতে চলিতে স্রোত এক একটা আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। দুই ধারের স্রোত মুখোমুখি হইয়া যে ঝাপটা খাইতেছে, তাহাতে প্রচণ্ড শব্দ করিয়া জল অনেক উপরে উঠিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।[৪১]

নদীই যেন বাসন্তীকে ভাসিয়ে এনেছে সুবলের কাছে। আবার সে নদীই কেড়ে নিয়েছে তার প্রাণ। নদীর উত্থান-পতনের ঢেউ-ই যেন সুখ দেয় নি বাসন্তীকে। স্বামীর মৃত্যুতে তাকে আজীবন থাকতে হয়েছে বিধবা। নদীই তার দুঃখের মূল।

---

৪১. ঐ, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

চার বছর পর কিশোরের স্ত্রীর অনন্তসহ গোকণঘাটে ফিরে আসা এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বাঁক। নদীই তার জীবনকে নিয়ে এসেছে এ পর্যন্ত। নদীর কারণেই তার সম্পর্ক ঘটে কিশোরের সঙ্গে। নদীর সঙ্গে এমন সাক্ষাৎ না ঘটলে গোকণঘাটের কঠিন বাস্তবতা তাকে করত না স্পর্শ। সুতো কাটার কাজ করে তাকে করতে হতো না জীবিকা নির্বাহ। উপন্যাসে আঞ্চলিকতা প্রসঙ্গে জীবন বাস্তবতার এ দৃষ্টান্ত অনেকটা যথার্থ। একই ভাবে বিবেচনাযোগ্য গোকণঘাটে অনন্তর মায়ের স্থায়ী বসতি হওয়া। এ বিষয়ে বলা আছে :

> অবশেষে উঠিল অনন্তর মার কথা। তার বুক দুরদুর করিতে লাগিল। এ কথাটাও ভারতকেই তুলিতে হইল, নতুন যে লোক আসিয়াছে, আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। তারে নিয়া কিভাবে সমাজ করিতে হইবে আপনারা বলিয়া যান। তারে কার সমাজে ভিড়াইবেন, কিষ্টকাকার, না দয়াল কাকার, না বাসন্তীর বাপ কাকার ...রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, 'কারে কারে লইয়া তোর সমাজ ?' 'সুবলার শ্বশুর আর কিশোরের বাপেরে লইয়া'। 'তা হইলে নতুন মানুষ লইয়া তোর সমাজ হইল চাইর ঘর'। 'হ কাকা'[৪২]।

শুধু মালোরাই নয়, তিতাস তীরের মুসলমানদের জীবনের সঙ্গেও নদী সংযুক্ত গভীরভাবে। তিতাসকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনও আবর্তিত। কাদির মিয়া-ছাদির মিয়ার মাধ্যমে সে নির্ভরশীলতার চিত্র ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য আলু বাজারে নেয়া হয় নদী পথেই। সে সময়ের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীর ছবি উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে বাস্তবভাবে। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের ক্ষেত্রে মালো-সমাজের নিয়ম-নীতি, ধর্মাচার, এমন কি মায়ের মৃত্যুর পর সন্তানের হবিষ্যি পালনের প্রথাও উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। শুধু গোকণঘাট নয়, নবীনগরের মানুষের জীবনাচারের নানা প্রসঙ্গও উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসের এ পর্যায়ে। একটি এলাকার নানাবিধ বিবরণ ও চিত্র থাকায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উপন্যাসের 'রাঙা নাও' পর্বে স্থানীয় পরিবেশ আরও ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। নৌকা বাইচ একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে জড়িত কাঠ-সংগ্রাহক, করাতি, মিস্ত্রী, নকশাকার প্রভৃতি। প্রতিযোগীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাউল-ভাটিয়ালি গায়কদের

৪২. ঐ, পৃ.৫১

Dhaka University Institutional Repository

আবেগময় উচ্ছ্বাস তিতাস তীরবাসীদের জীবনে আনন্দ সঞ্চারক। কাহিনীর এক পর্যায়ে নদীই কাছে এনে দিয়েছে অনন্ত ও অনন্তবালাকে, তৈরি করেছে রমু ও অনন্তর বন্ধুত্ব। অনন্ত -বালা গড়তে চেয়েছে অনন্তর সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক। অনন্তর জীবনে নদী এসেছে বার বার নদীর বাঁকের মতোই। অনন্ত নদী পথেই গোকন ঘাট এসেছিল। এখানে মা মারা যাওয়ার পর নদীর আশে-পাশে ঘুরে ফিরে অনন্ত সঙ্গী হয় উদয়তারা ও বনমালীর। তাদের সঙ্গে নদীপথে নবীনগর আসে সে। এখানে এসেই সে যেন পায় তার জীবনের সঠিক ঠিকানা। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর নাপতানির পরামর্শে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কুমিল্লা শহরে চলে যাওয়ার পেছনেও যেন নদী থেকেছে ক্রিয়াশীল। এ উপন্যাসে একমাত্র অনন্তই তিতাস পরিধির বাইরে গেছে, অন্য সব চরিত্র থেকেছে তিতাস নদীর আওতায়।

মালো সম্প্রদায় এতই প্রকৃতি-নির্ভর এবং সেই অর্থে অসহায় যে, তিতাসই যেন তাদের ঈশ্বর। তিতাসের বুকে চর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মাছ ধরার পথ বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায় তাদের অর্থ উপার্জনের উৎস। তাদের ক্ষুধা আছে, কিন্তু তা নিবৃত্তির বিকল্প কোন পথ নেই তিতাসে মাছ ধরা ছাড়া। ফলে দ্রুত তাদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। সঙ্গত কারণেই, এ উপন্যাসের কাহিনীতে 'তিতাস' নদী পালন করেছে বড়ো একটি ভূমিকা। এই ভূমিকাকে আশ্রয় করে প্রাধান্য লাভ করেছে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। এ কারণে একজন সমালোচক বলেছেন :

> ...আঞ্চলিক জীবনের সরল ও নিপুণ বিন্যাসে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অসাধারণত্বে ভাস্বর।[৪৩]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের একটি অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর ভাষা। আজন্ম পরিচিত জীবন ও পরিবেশের ঘটনাবলি যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তিতাসকেন্দ্রিক মালোদের নিত্য ব্যবহৃত ভাষা থেকে গৃহীত ও সুপ্রযুক্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে। গ্রন্থটি মূলত সাধু গদ্যে লিখিত হলেও সাধু রীতির সঙ্গে মাঝে মধ্যে চলিত রীতির গদ্যও লেখক ব্যবহার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি আঞ্চলিক ভাষারও আশ্রয় নিয়েছেন। ভাষা ব্যবহারে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে ঔপন্যাসিক পরিচয় দিয়েছেন বাস্তবতাবোধের। সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণের কারণে উপন্যাসে মেলে মিশ্র ভাষা রীতি। এর ফলে 'তাহাকে'-র স্থানে 'তাকে', 'কাহারও' স্থানে 'কারো' 'যাহাকে'-র স্থানে 'যাকে',

---

৪৩. গিয়াস শামীম, পূর্বোক্ত, পৃ.১১

Dhaka University Institutional Repository

'তাহার' স্থানে 'তার' দেখা যায় উপন্যাসটির প্রায় সবখানে। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি উদাহরণ থেকে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যাবে :

ক. এই কালকের থেকেই যেন আজ **তাকে** অনেকখানি বড় দেখাইতেছে।[৪৪]

খ. **যারা** মরিয়া গিয়াছে **তারা** রক্ষা পাইয়াছে। **যারা** বাঁচিয়া আছে **তারা** শুধু ভাবিতেছে, আর কতদূর।[৪৫]

গ. **এরা** যেদিন মাসীর মতই **তাকে** পর করিয়া দিবে সেদিন সে কোথায় যাইবে।[৪৬]

ঘ. বার বার ইচ্ছা করিল **তার** সাদা কাপড়ের আঁচল দিয়া **তাদের** গায়ে ছায়া দেয়।[৪৭]

ঙ. **যার** ঘরে নিত্য নিরানন্দ আনন্দাবসানের দুঃখের আঁধারে সে-ঘরে দুলিয়া উঠে না। [৪৮]

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বহু বাংলা উপন্যাসেই সাধু ও চলিত গদ্য রীতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। 'তিতাস'-এ এই মিশ্রণ হয়তো কিছুটা ব্যাপক।

অন্যান্য বাংলা উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসেও তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, আঞ্চলিক শব্দ-সহ পেশাগত ও তিতাস তীরের চাষীদের অনুষঙ্গগত নানা ধরনের শব্দের রয়েছে উপস্থাপনা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ যেন নিজের কথা বলতে গিয়েই সহজ-সরল ভঙ্গিতে নিজের চেনা জানা শব্দগুলোই ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। এ বিষয়টি পর্যালোচনাকালে দেখা যায়, সাধারণত প্রতি পৃষ্ঠায় আছে পাঁচ শ থেকে ছয় শ শব্দ। তাতে মেলে একাধিক তৎসম শব্দ। প্রতিটি অংশ থেকে কয়েকটি তৎসম শব্দের উদাহরণ দেয়া যায় :

১ম অংশ, পৃষ্ঠা ৪ নদী, প্রাণ, পণ্ডিত, পাহাড়।

২য় অংশ, পৃষ্ঠা ৩৮ দুঃখ, বিস্ময়, আনন্দ, দৃষ্টি।

৩য় অংশ, পৃষ্ঠা ৮১ ঋতু, সৃষ্টি, বুদ্ধি, আকাশ, জল, সন্ধ্যা।

৪র্থ অংশ, পৃষ্ঠা ১৩৩ বন্ধ, লজ্জা, মসৃণ, অত্যন্ত, ব্যথা ইত্যাদি।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ কখনও অপ্রচলিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন নি। এখানে ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি শব্দই বিভিন্ন বাংলা গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে বার বার ব্যবহৃত। ফলে তাঁর রচনা হয়েছে সাধারণভাবে সুখপাঠ্য ও সাবলীল। তাঁর উপন্যাসে বোধগম্য শব্দ ভাণ্ডারের সঙ্গে রয়েছে পেশাগত শব্দাবলীর উপস্থাপনা। তিতাস তীরের মুসলমান চাষীদের অনুষঙ্গে এসেছে নানা শব্দ। যেমন, আল্লার গজব, ফজর, কেরায়া, দেওয়ানা, বেহুদা, কিসিম ইত্যাদি। এ উপন্যাসের বহু সংলাপে আঞ্চলিক শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপকভাবে। আমাদের

৪৪. অচিন্ত্য বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
৪৫. ঐ, পৃ. ১৫৪
৪৬. ঐ, পৃ. ১১৩
৪৭. ঐ, পৃ. ৪১,
৪৮. ঐ, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত গ্রন্থটির চারটি পর্ব থেকে চারটি পৃষ্ঠা পর্যালোচনা করে কতগুলো আঞ্চলিক শব্দ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, জালুয়া >জেলে, ছাইলা > ছেলে, পসসাদ > প্রসাদ, ঢাইল্যা > ঢেলে, দিমু > দেবো, ভইন > বোন প্রভৃতি।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালোদের জীবন সংগ্রামকে রূপায়িত করতে গিয়ে সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের কারণে তা হয়েছে বাস্তবতা-নির্ভর। উপন্যাসের প্রথম পর্যায় থেকে শেষ অবধি ঘটনা বিন্যাসে ব্যবহৃত বহু আঞ্চলিক শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্ট বাক্যসমূহ সৃষ্টি করেছে নানা বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্য যেন ভারসাম্য রচনা করেছে তিতাসের জল ও জীবন প্রবাহের মধ্যে। তবে, লেখক পারতপক্ষে দুর্বোধ্য আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেন নি। এ উপন্যাসে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে সাধু ও চলিত মিশ্রিত রীতিতে তৈরী সংলাপ। এর মধ্য দিয়ে মালোদের ভাষা বৈশিষ্ট্য হয়েছে উপস্থাপিত। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষ সাধু-চলিত রীতি মিশ্রিত আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার করে থাকে। সাধু ও কথ্য তথা আঞ্চলিক রীতির মিশ্রণে সৃষ্ট কয়েকটি সংলাপের উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হলো :

ক. এমন টালাইন্যা গিরস্তি কতদিন চালাইবা। নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা! এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেন ? [৪৯]

খ. রাঁড়িরে শেষ খাওন খাওয়াইয়া দেই, আর ত কোনদিন খাইতে আইব না।[৫০]

গ. মাতবরের ছেলে, ডাক দিলে না, কোন্ সময়ে আসিয়াছ জানিলাম না। শীতে কষ্ট পাইলে।[৫১]

ঘ. ঠাকুর সকল, ঘরে নি আছ, আমার একখান কথা। ভারতের বাড়িতে আজ দশজনের সভা। তোমরার নিমন্ত্রণ। পান তামুক খাইবা, দশজনের কথা শুনবা। [৫২]

ঙ. আমারও দিদি সময় সময় মন অচল হইয়া পড়ে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা কইরা রাখছি, এই ভাবেই চালামু। [৫৩]

---

৪৯. ঐ, পৃ. ১৩
৫০. ঐ, পৃ. ৯১
৫১. ঐ, পৃ. ৫৫
৫২. ঐ, পৃ.৪৭
৫৩. ঐ, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে উপমা-চিত্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার মাধ্যমে বক্তব্যকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি সম্ভব হয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে রয়েছে অনেক সার্থক ও সঙ্গতিপূর্ণ উপমা। যেমন :

ক. তিতাস নদী এখানে ধনুর মত বাঁকিয়াছে। [৫৪]

খ. গুণটানা নৌকার মত বনমালী অনন্তর হাত ধরিয়া টানিয়া চলিয়াছে। [৫৫]

গ. মেয়েটার খোঁপা খুলিয়া গিয়া শাপের মত লম্বা চুল মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।[৫৬]

ঘ. এক মুহূর্ত আগেও তার নৌকা ময়ূরের মত বৈঠার পেখম উড়াইয়া সর্পের গতিতে চলিতেছিল।[৫৭]

ঙ. স্বপ্নের মত অভাবিত এই জল। [৫৮]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে অসংখ্য বাগধারা বা প্রবাদ-প্রবচন। এ গুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তিতাস তীরবর্তী মানুষের মনোভঙ্গি, বিশ্বাস-সংস্কার-উপলব্ধি ও তাদের জীবন-অভিজ্ঞতা। উপন্যাসে ব্যবহৃত এ সব প্রবাদ-প্রবচন ফুটিয়ে তুলেছে মালোদের লোকজ অভিজ্ঞতা ও বৈশিষ্ট্য। উপন্যাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যায় : *কাকের মুখে সিন্দুইরা আম; তবে ঘটে দেও বেলপাতা; মা মরলে বাপ তালই/ভাই বনের পশু; ধানের মধ্যে খামা/কুটুমের মধ্যে মামা; শিবের মতন চোখ; আ-ঘাটাতে চন্দ্র উদয়; চৌদ্দ-সানকির তলা* প্রভৃতি। এ সব বাগধারা বা প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা উপন্যাস সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

উপন্যাসটিতে ব্যবহৃত ভাষা লেখকের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহীত এবং সে ভাষা তিতাস তীরবর্তী জন-জীবন উপস্থাপনের তাগিদে ব্যবহৃত। শুধু সংলাপ নির্মাণের ক্ষেত্রেই নয়, উপন্যাসটির বর্ণনা অংশেও রয়েছে বহু লোকজ শব্দের উপস্থিতি। যেমন : চৌয়ারি, তকলি, টেকা, তাগা, চোপা, ছেউ, চরকি, খেউ, পুলা, খলা, বাওয়া ইত্যাদি।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে লেখক প্রয়োজন মতো অনুপ্রাস, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত ব্যবহার করেছেন। সে গুলোর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অর্থ ব্যঞ্জনা। সোঁ, সোঁ, হু হু,

---

৫৪. ঐ, পৃ. ৮০
৫৫. ঐ, পৃ. ৮৭
৫৬. ঐ, পৃ. ৭৮
৫৭. ঐ, পৃ. ১৩৫
৫৮. ঐ, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

থৈ থৈ, চিকচিক, ছম ছম, হিস্ হিস্ প্রভৃতির ব্যবহার এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। দিরুক্ত বা শব্দদ্বৈত ব্যবহার বাক্যের শ্রুতি বা ধ্বনি মাধুর্য এবং অর্থের গৌরব বৃদ্ধি করে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বহু যথোপযুক্ত শব্দদ্বৈত ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক বাক্যের ধ্বনি-মাধুর্য ও অর্থ-গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। যেমন, সুন্দর সুন্দর, ঝলকে ঝলকে, বনে বনে, মনে মনে, ক্ষণে ক্ষণে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে প্রভৃতি রচনাটির। এ ছাড়া বহু মনোহর অনুপ্রাস ব্যবহারেও তিনি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। এ সবের মাধ্যমে ভাষা অনেক স্থানে হয়েছে ঐশ্বর্যময়।

আগেই বলা হয়েছে যে, 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের ভাষা সাধু ও চলিত রীতি মিশ্রিত। বহু তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ও আঞ্চলিক শব্দে সমৃদ্ধ এ উপন্যাসের গদ্য শৈলী। এ ছাড়া উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, অনুপ্রাস, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, বিশেষণ, বচন-প্রবচন প্রভৃতি ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক এ গ্রন্থের ভাষায় শিল্পসম্মত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এ ক্ষেত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মণের বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত জীবনবোধ বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তাঁর রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আন্তরিকতার সঙ্গে নির্মোহ মানসিকতার সমন্বয়। এবং সে কারণেই এ উপন্যাসের ভাষা শৈলী লাভ করেছে উল্লেখযোগ্য শিল্পসম্মত রূপ। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> তিতাসের স্রোতের মতোই ভাষাতেও এসেছে একটা মৃদু সঙ্গীত—যা জীবনের মৃদু এবং মেদুর, সুখ এবং দুঃখ ধ্বনিত করেছে অসীম নীলাকাশের অঙ্কশায়ী নদীর অস্পষ্ট এবং চিরন্তন তরঙ্গ কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। [৫৯]

একজন লেখকের জীবন দর্শনের প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পড়ে তাঁর রচনায়। উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ ও বর্ণনা অংশে এ প্রভাব নানাভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে তাঁর জন্ম ও বিকাশ ঘটে, সাধারণত তার সঙ্গে সমন্বয় বা সংঘর্ষ ঘটে তাঁর অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের। লেখকের জীবনবোধ বা জীবনাদর্শ গড়ে ওঠে তাঁর পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার ভিত্তিতেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' রচনা করেছেন। ফলে, সেখানে তাঁর জীবন ভাবনার প্রভাব পড়েছে। তিতাস-তীরবর্তী নর-নারীদের পরিশ্রম ও সংগ্রাম, আশা-হতাশা সব কিছুরই ভাগীদার অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তাদের জীবনের নগ্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে আন্ত

৫৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ.৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

রিকভাবে ছিলেন তিনি পরিচিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যে লড়াই করতে বা তাদের সহায়তা করতে সম্মত ছিলেন না তিনি। কিছুটা অন্তর্মুখী এই মানুষটি এক রকম পালিয়ে যান কলকাতায়। বস্তুত, গণমানুষের নেতা হওয়ার গুণ বা আগ্রহ তাঁর মধ্যে জন্মায় নি। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> মালোরা যে অদ্বৈতকে চাঁদা তুলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পড়তে পাঠিয়েছিল তাতে ছিল তাদের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা। অদ্বৈত যদি লেখাপড়া শিখতে পারে তাহলে তমসুখের খত বা বেপারীর হিসাব লেখাতে তাদের আর কারো পা ধরতে হবে না। বেপারীর হিসাব বা তমসুখের খত এমনিতেই তাদের জীবনকে পঙ্গু ও বিপন্ন করে রেখেছে। তার ওপর যদি ঐ হিসাবের মধ্যে ভুল তথ্য বা গোঁজামিল থাকে তাহলে তাদের বাঁচার ন্যূনতম পথও বন্ধ হয়ে যায়। সে জন্য অদ্বৈতর লেখাপড়া করার মধ্যে গোকর্ণের মালোরা তাদের ন্যূনতম অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল।[৬০]

উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্ত কর্তৃক তাঁর পূর্ব পুরুষদের শোষণ-বঞ্চনার শিকার যেন লেখক নিজেও। তাঁর অঙ্কিত মালোদের শোষণ-বঞ্চনার চিত্রের মাধ্যমে সে সময়কার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, শৈক্ষিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পরিচয় মেলে। বাল্যকালেই লেখকের বাবা-মা মারা যান। তখন কোনভাবে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাকালে মানুষের কাছে তিনি অনাদর-অবহেলা পেয়েছেন। তবে, তিনি সব সময়ই সকল বৈরী পরিস্থিতিতে আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে নিজেকে সামলে নিতেন। এ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন একজন সমালোচক :

> বরং অদ্বৈত এ সময়ে যে অনাদর, অবহেলা ও অপমান পেয়েছেন তা থেকেই প্রত্যক্ষভাবে দৃঢ়তা ও তার পরিণতিতে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলেন।[৬১]

মেধাবী ছাত্র অদ্বৈত। মাইনর পাস করেন বৃত্তি নিয়ে। পরবর্তীতে অন্নদা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ১৯৩৩ সালে পাস করেন প্রথম বিভাগে। আর্থিক অনটনের জন্য আরও ভালভাবে পড়াশোনা করতে পারেন নি বলে তিনি পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার মতো নম্বর পেতে ব্যর্থ হন। প্রধানত মুসলমান ছাত্ররা পড়তো যে 'জর্জ স্কুলে' সে স্কুলের 'সবুজ' পত্রিকার সম্পাদক অদ্বৈতর সতীর্থ শাহ আফতাবউদ্দীন তাঁকে এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'তিতাস' নামের

৬০. শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ.১,২
৬১. শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, ঢাকা, পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাটি। সে সময়ের অদ্বৈত সম্পর্কে স্মৃতিচারণে 'সবুজ'-সম্পাদক শাহ আফতাবউদ্দীন বলেছেন :

> কবিতাটি মাইকেলের 'কপোতাক্ষ নদ'-এর আঙ্গিক ও প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দিলেও প্রবহমান তিতাস ও তার তীরের জনপদের যে বাস্তব বর্ণনা ঐ কবিতায় ছিল তাতে ঐ বয়সেই আমাদের মনে হয়েছিল 'অদ্বৈত আমাদের কবি'। কবিতাটি শুধু নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথাই বলে নি, বলেছে শোষিত মালোদেরও কথা। [৬২]

কৈশোর থেকেই অদ্বৈত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন এবং নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে হয়ে ওঠেন সচেতন। তখন তিনি জারিগান দলের 'গানদার' বা 'খলিফা' বলে পরিচিতি পেয়েছিলেন। এ গানের সুবাদে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আসা-যাওয়া করতেন। এর মাধ্যমেই অদ্বৈত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> ...এভাবেই অদ্বৈতের মনোজগতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া মানুষের সংস্কৃতির গাঢ় রং লাগিয়াছে। [৬৩]

অর্থ কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয় অদ্বৈতর মনে। প্রথম বর্ষে পড়ার সময় 'সন্ত ান' প্রেসের মালিক জিতু দত্তের পরামর্শে (১৯৩৪) কলকাতায় এসে 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় অদ্বৈত শুরু করেন কর্মজীবন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশ বছরের জীবনের (১৯১৪-১৯৩৪) অসংখ্য ঘটনার স্মৃতি বিচলিত করেছে কলকাতাবাসী অদ্বৈতকে। সে কালের সমাজ বাস্তবতায়, শোষণের জালে আবদ্ধ মালোদের জীবন সংগ্রাম ও জীবন যন্ত্রণাই যেন রচনা করেছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনবোধ। নিজ অস্তিত্বের সঙ্গে যেন জড়িয়ে ছিলো তাঁর পরিচিত মানুষগুলোর জীবনের দুঃখভরা গান। তাদের প্রতি তাঁর গভীর দরদ জাগ্রত ছিলো তাঁর মৃত্যু-অবধি। তিনি শোষিতদের মুক্তির কথা ভেবেছিলেন বৃহত্তর পটভূমিতে। এর প্রমাণ মেলে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত অদ্বৈতর লেখা কবিতায়। ব্রিটিশ বিরোধীদের সঙ্গে অদ্বৈতর সম্পর্ক হয় অনুশীলনী ক্লাশে। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রক্তনিশান' নামের চারটি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর এই মনোভাব। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ তথা ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের জন্যেই 'মোহাম্মদী' পত্রিকার চাকুরি হারাতে হয়েছিল তাঁকে। শৈশব

---

৬২. ঐ, পৃ. ৩
৬৩. অচিন্ত বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই দুঃখকষ্ট ছিল তাঁর জীবনের সঙ্গী। কিন্তু, সে কারণে তিনি কারও প্রতি নিষ্ঠুর হতে শেখেন নি। বরং অধিকতর কোমল ও মানবিক মন নিয়ে আরও ব্যাকুল হয়েছেন নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের দুঃখ-দুর্দশায়। এবং সে কারণেই অকৃত্রিম দরদে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। মালোদের জীবন তিতাস-নির্ভর। এবং সে বাস্তবতা অনুধাবন করেই তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খণ্ড খণ্ড ছবির সমন্বয়ে তিতাস তীরবর্তী জনমানুষের জীবনচিত্র লেখক তুলে ধরেছেন নিজ দক্ষতায়।

এ উপন্যাসে উপস্থাপিত প্রধান পাত্র-পাত্রীরা নিম্নবর্গের হিন্দু। এ ছাড়া রয়েছে অবস্থাপন্ন মুসলমান পরিবারের কথা। তিতাস পাড়ের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত পার্থক্য যতই থাক, মনের দিক থেকে তারা ছিল একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। পক্ষান্তরে, উচ্চবর্গের হিন্দুরা নিম্নবর্গের হিন্দুদের মনের প্রান্তে ঠাঁই দেয় নি, শুধু তাদের শোষণই করেছে। লেখকের মন থেকে সমবেদনা উৎসারিত হয়েছে এ সব বিত্তহীন নিম্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি। নদীকে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি-সমবেদনার মিলন মেলা হিসেবে। এবং এটি দেখা যায় নানা ঘটনার মাধ্যমে, বিশেষ করে বনমালী ও ধনঞ্জয়ের কাদিরের প্রায় ডুবে যাওয়া আলুর নৌকা উদ্ধারের চিত্রের মধ্য দিয়ে।

নদীকে তিতাস তীরবাসীদের শুধু মিলনস্থান ও জীবিকা অর্জনের মাধ্যম বলেই রূপায়িত করেন নি লেখক। নদীর মাধ্যমে এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোর জীবন উপলব্ধিও ঘটেছে। কিশোর, সুবল, বাসন্তী, অনন্তর মা সকলেরই জীবনের গতি যেন নিয়ন্ত্রণ করেছে নদী। কিশোর, সুবল, বাসন্তী তিন জনের মধ্যে একমাত্র বাসন্তী উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত থেকেছে ক্রিয়াশীল, প্রত্যক্ষ করেছে সে মালোদের প্রায় ধ্বংসের শেষ পর্যায়। কিশোরের জীবন উপলব্ধির ক্ষেত্রেও নদী সক্রিয়, তেমনি কিশোরের পাগল হওয়ার কারণও যেন নদী। সুবল মারা গেছে নদীতে সংঘটিত এক দুর্ঘটনায়। সুবলের অপমৃত্যু বাসন্তীকে করেছে বিধবা। বাসন্তীর দুঃখের কারণও তাই নদী। অনন্তর মায়ের জীবনের অপরিসীম দুঃখের মূলেও রয়েছে নদীর ভূমিকা। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলোও কম বেশি নিয়ন্ত্রিত নদী দ্বারা। তিতাস ইতোপূর্বে কখনও এমন সর্বগ্রাসী ছিল না, সে সকলকে দিয়েছে নির্ভরতা, প্রশান্তির আশ্রয়। তার ভিত্তিতেই তার তীরে টিকে ছিলো একটি জনগোষ্ঠী নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ করেই পরিবর্তন ঘটে তিতাসের স্রোতোধারায় ; ফলে

Dhaka University Institutional Repository

মালোদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। অর্থ সংকটে, তীব্র অভাবের মুখে মালোদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। তাদের এ ধ্বংসকে আরও ত্বরান্বিত করে সংস্কৃতির পরিবর্তন। মালোদের একাংশ নিজস্ব সংস্কৃতিতে প্রকাশ করতে থাকে অনীহা, তারা বাইরের চটুল অপসংস্কৃতিতে হয় মোহাচ্ছন্ন। ফলে মালোদের সংহতিতে ধরে ফাটল এবং তখনই যেন চূড়ান্ত হয় তাদের ধ্বংস। লেখক এ গ্রন্থে তাঁর চারপাশের মানুষের বিপর্যস্ত-যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের চিত্রই করেছেন বাণীবদ্ধ। বলা যায়, ' যাপিত জীবনের কোন লেখক-শিল্পী যখন তাঁর নিজ জীবন বা তাঁর জনগোষ্ঠীর জীবনের চিত্র আঁকেন, তখন তা হয়–অনবদ্য, অনন্য।[৬৪]' তা ছাড়াও, '...মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা ও মৌল প্রেরণার মূর্ত-রূপ।' [৬৫]

বস্তুত, মানব-দরদের মোড়কেই যেন সাজানো অদ্বৈতর মানসলোক, গভীর মানব কল্যাণের আকাঙ্ক্ষায় গঠিত অদ্বৈত মল্লবমর্ণের জীবনবোধ। সে জীবনবোধ থেকে উৎসারিত বহু ঘটনা চিত্রের সমন্বয়ে রচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রকৃত অর্থে মানুষের প্রতি তাঁর নিঃশর্ত ভালোবাসার প্রতীক। ফলে, উপন্যাসটির শিল্পরূপও পেয়েছে সৃষ্টি-সফলতা।

৬৪. তিতাশ চৌধুরী, অদ্বৈত বল্লবর্মণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৭
৬৫. শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাঙালীর জীবনে নদীর প্রভাবের কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। বাঙালীর জীবন যেন বাঁধা আছে নদীর সঙ্গে। নদীর জল মানুষের নিত্যদিনের অবলম্বন যেমন, তেমনই এই জলের মেজাজী প্রবাহ যখন জলোচ্ছ্বাসে রূপ নেয় তখন মানুষের ঘর-বাড়ি যায় ভেসে। অপূরণীয় ক্ষতির মধ্যে পড়ে মানুষ। বাঙালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য মাছের বাস নদীতেই। মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল জেলেদের জীবনে নদীর ভূমকির কথা বলাই বাহুল্য। শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশেও রয়েছে বড় বড় নদী। এবং সে সব নদীর প্রভাব পড়ে তার তীরবাসীদের জীবনে অনিবার্যভাবেই। হোয়াংহো, তাইগ্রীস, ফোরাত, টেমস প্রভৃতি নদীর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে।

মানুষের জীবনে নদী এমন ঘনিষ্টভাবে প্রভাব ফেললেও নদী পারে না মানুষের জীবনকে আমূল অধিকার করতে। মানুষ স্বাধীন, তার স্বকীয়তা-সৃষ্টিধর্মিতা প্রতিনিয়তই তাকে উদ্বুদ্ধ করে সংগ্রামে। নদী ও প্রকৃতির বৈরী আচরণের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তাই সদা সচেষ্ট। ফলে সমূহ বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষ রক্ষা করতে পারে তার অস্তিত্ব। প্রায়ই মানুষ নিজ মেধা ও বুদ্ধির বলে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয় প্রাকৃতিক অনেক বিপদ। মানুষ এই বৈশিষ্ট্যের বলেই ক্রমে অধিকার করে নেয় প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ অবস্থাকে।

'বাংলাদেশের নদীভিত্তিক উপন্যাস' সম্পর্কিত আলোচনার শুরুতে বিভিন্ন চর্যাপদে নদীর সরব উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। গঙ্গা-যমুনা নদীর উল্লেখসহ, নদীভিত্তিক জনজীবনের উল্লেখও সেখানে করা হয়েছে। এর পর মঙ্গলকাব্যসমূহে নদীর উপস্থিতির কথা বলা আছে। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদেরও নদী ছাড়া যেন চলে না। বৈষ্ণবপদাবলী-শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে নদীর ব্যাপক উপস্থিতি। রাধা-কৃষ্ণের জীবনের নানা ঘটনা যমুনা নদীর তীরেই ঘটেছে। ময়মনসিংহগীতিকার 'মহুয়া' 'মলুয়া' 'কাজলরেখা' প্রভৃতি পালাগানেও নদীর উপস্থিতি আছে অনিবার্যভাবেই। সংসারের সব কাজই তারা করে নদীর ঘাটে। নদীর ঘাটে নিত্য যাওয়া-আসার মধ্য দিয়ে তাদের জীবনে ঘটেছে অনেক ঘটনাই। অন্য দিকে প্রথম বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে

Dhaka University Institutional Repository

'নদীবক্ষে' পর্যন্ত বহু উপন্যাসের মধ্যেই লক্ষ্যযোগ্য নদীর উপস্থিতি ও ভূমিকা। গ্রামীণ জীবনচিত্র উপস্থাপনের পটভূমিতে গ্রামীণ নর-নারীর নিত্য দিনের কাজ-কর্মের সঙ্গে নদীর সম্পর্কও উপস্থাপিত হয়েছে। নদীর প্রভাবে কখন কখনও কোন কোন জীবন হয়েছে উন্মূলিত, আবার কখনও কখনও সেই নদীরই প্রভাবে জীবন হয়েছে শান্তি ও স্বস্তিময়।

আলোচ্য তিনটি উপন্যাসে পদ্মানদীর মাঝি, নদী ও নারী এবং তিতাস একটি নদীর নাম– মানবজীবন ও নদী কিভাবে পরস্পর সম্পর্কিত, সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

'পদ্মানদীর মাঝি'তে লক্ষ্য করা যায় পদ্মার অনুকূল ও ভয়াল রূপ। বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেতুপুরের সংগ্রামী কুবের ও গণেশরা যেন মৃত্যুকে উপেক্ষা করে নদীতে মাছ ধরে জীবন নির্বাহ করে। পুরুষানুক্রমে চলছে তাদের এই জীবন সংগ্রাম। নদী ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী এই জনগোষ্ঠীর বাসভূমিতেও রয়েছে প্রতিকূল পরিবেশ। কেতুপুরের জেলেপল্লী অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের নিত্য বসবাস। এ পাড়ার বাইরের খোলা জায়গায় ঘর তোলার অধিকার তাদের নেই। সামন্ত মেজকর্তাদের অনুমতি ছাড়া এ জমি পায় না ভূমিহীন জেলেরা। জলে ও ডাঙায় তাদের বিরুদ্ধ পরিবেশ। জীবন সংগ্রামের এই অবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে যেন আর এক সামন্ত প্রতিনিধি হোসেন মিয়া। সে তার সাম্রাজ্য ময়নাদ্বীপ গড়ার অভিপ্রায়ে কেতুপুরবাসী জেলেদের বন্ধু সেজেছে। সামন্ত মহাজন-জোতদার প্রমুখ প্রভাবশালী মাত্রই শোষণ করে কুবেরদের। এ শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তির পথ না পেয়ে কুবের একদিন বাধ্য হয়ে যাত্রা করে ময়নাদ্বীপ। 'পদ্মানদীর মাঝি'র জেলেদের জীবনের সঙ্গে পদ্মার সম্পর্ক গভীর। জেলেদের জীবনে পদ্মা যেন নিয়ন্তা। পদ্মার জল প্রবাহে আছে জীবিকা নির্বাহের আশ্বাস ; অন্য দিকে বন্যার জলের তোড়ে ভেসে যায় তাদের অতি যত্নে গড়া জীবন ব্যবস্থা। এ সব বরণ করেই পদ্মাতীরবাসী এ জেলেদের জীবন নির্বাহ করতে হয়।

'নদী ও নারী' উপন্যাসটিতেও রয়েছে পদ্মার ভয়াল রূপের উপস্থাপনা। পদ্মার ভাঙা-গড়া, জল-জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে এর তীরবাসীদের জীবন জড়িত অন্তরঙ্গভাবে। 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের মতো 'নদী ও নারী'তে প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত নেই কোন নির্দিষ্ট পেশার মানুষ। 'নদী ও নারী'তে ভূমিহীন একদল মানুষের জীবন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নজুমিয়া, আসগার একের পর এক চরে গিয়ে আবাস গড়ে তোলে। আবার জলোচ্ছ্বাস তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনেক সংগ্রামে-স্বপ্নে গড়া ঠিকানা হঠাৎ ভেসে যাওয়ায় দারুণভাবে বিপন্ন-বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। তাদের সে জীবন যন্ত্রণার ছবি 'নূরু ও মালেক' অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ উপন্যাসে গতরসর্বস্ব-মুসলমান কৃষি শ্রমিকদের আশা-সংগ্রামের কাহিনী কিছুটা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। দেখা যাচ্ছে, পরিত্যাক্ত চরের জমি চাষ উপযোগী করে গড়ে তোলে তারা। উৎপাদিত ফসলই তাদের আয়ের একমাত্র উৎস। দুফলা জমি তারা আবাদ করে অধিক ফলন ফলায় এবং আর্থিক উন্নতি ঘটায় নিজেদের। ভাঙা-গড়ার মধ্যেই তাদের জীবন ও জীবনের স্বপ্ন ও সাধ নিহিত যেন। নদী ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামশীল এই জনগোষ্ঠীর জীবনে নদীর প্রভাব এতো বেশি যে, নদী ছাড়া তাদের জীবন যেন চলে না।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিতে রয়েছে তিতাস নদীর এক সামগ্রিক উপস্থিতি। নিত্য সমস্যায় জর্জরিত তিতাস তীরের দরিদ্র মালোরা মাছ ধরে জীবন কাটাচ্ছিল কোনক্রমে। যেন তিতাসেরই উদারতায় সারা বছরই তারা সেখানে মাছ পেত। এবং সে মাছ বিক্রি করে তাদের জীবনও চলতো। শুধু জেলে নয়, তিতাস তীরের কৃষিজীবী কাদির-ছাদিরের ব্যবসাও তিতাসবাসীদের ব্যাপক জীবনের সঙ্গে জড়িত। লেখক নিজেও একজন মালো বলেই হয়ত তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে মালোদের সমাজ গভীরে প্রবেশ করা। তাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গও উপন্যাসে এসেছে বাস্তবভাবে। প্রচন্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কোন ভাবে টিকে থাকা তিতাস পাড়ের এই মালোদের উদ্ধারকর্তা হতে পারতো অনন্ত। মালোরা সেরকম স্বপ্নই দেখেছিলো। তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হয় নি। সময়ের পরিবর্তনে তিতাসের জল কমে গেলে, মাছও গেল কমে। ক্রমে উপার্জনের উৎস বন্ধ হয়ে যায় মালোদের। এ সময় বহিরাগত সংস্কৃতির চাপও পড়ে মালো সমাজে। মালোর ছেলে-মেয়েরা বাইরের চটুল সংস্কৃতিতে হয়ে পড়ে মুগ্ধ। সংস্কৃতির এই দ্বন্দ্ব যখন চরমে পৌঁছায়, তখন মালোদের জীবনে আসে আর এক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারকারী বিধুভূষণ পাল। তার দেওয়া ঋণের খপ্পরে পড়ে মালোরা হয় স্বর্বস্বান্ত। বাসন্তীর সঙ্গে বামন-কায়েতদের দ্বন্দ্বেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ সময়। ঠিক এ সময়ই এক রকম বন্ধই হয়ে যায় তাদের আয়ের উৎস তিতাস। ফলে অনাহারে-

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধাহারে থেকে চরের জমিতেও দখল না পেয়ে মালোরা চলে যায় গ্রাম ছেড়ে, পেশা ছেড়ে অন্যত্র। তিতাস-নির্ভর এই জনগোষ্ঠীর জীবনে নদীর ভূমিকা এমনই অনিবার্য যে, নদীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মালো জেলেদের জীবনেরও যেন হয়েছে অবসান। এ কথা হয়তো বলা যাবে না যে, নদীর প্রভাব বাঙালী জাতির জীবনে সর্বগ্রাসী। তবে, সেই অজানা কাল থেকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষ ও নদী একে অন্যের পরিপূরক হয়েই যেন তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। বহু সংখ্যক নদ-নদী জীবিকার সঙ্গে তাদের নিরাপত্তাও দিয়েছে। বাঙালী জাতির মন মানসিকতা তৈরিতেও রেখেছে বড় এক ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী :

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, কলকাতা, ১৩৬০

২. অচিন্ত্য বিশ্বাস, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম, কলকাতা, ১৯৮৮

৩. অর্চনা মজুমদার, রবীন্দ্র-উপন্যাস-উপক্রমা, কলকাতা, ১৯৭০

৪. অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী, ঢাকা, ১৯৭৭

৫. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, কলকাতা, ১৯৭৩

৬. অরুণ কুমার মখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, কলকাতা, ১৯৭৪

৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিচার, কলকাতা, ১৯৮৮

৮. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সন্ধান, কলকাতা, ১৯৮৮

৯. অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, আঞ্চলিকতা : বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮৭

১০.অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮৮

১১.অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৯৫৯

১২. আনিসুজ্জামান, স্বরূপের সন্ধানে, ঢাকা, ১৯৯২

১৩.আবুল খায়ের মোঃ আশরাফ উদ্দিন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সমাজ ও মানুষ,ঢাকা, ১৯৯০

১৪. আশিস কুমার দে, উপন্যাসের শৈলী, কলকাতা, ১৯৮৩

১৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৫

১৬. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, তারাশঙ্কর: দেশ কাল সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৭৮

১৭. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৭৪

১৮. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, কলকাতা, ১৯৭০

১৯. ক্ষেত্রগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯৮

২০. গিয়াস শামীম, বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস, ঢাকা, ২০০২

২১. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, বাংলা কথা সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯১

২২. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, বাংলা কথা সাহিত্য প্রসঙ্গে, কলকাতা, ১৯৮৭

২৩. জগদীশ ভট্টাচার্য, আমার কালের কয়েকজন কথা শিল্পী, কলকাতা, ১৯৯৪

২৪. জীবন্দ্রেসিংহ রায়, কল্লোলের কাল, কলকাতা, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

২৫. তপোধীর ভট্টাচার্য, বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা, ১৯৯৬

২৬. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কলকাতা, ১৯৭৯

২৭. তিতাশ চৌধুরী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা , ২০০১

২৮. দীনেশচন্দ্র সেন, ময়মনসিংহ গীতিকা কলকাতা, ১৯৭৩

২৯. দেবীপদ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের কথা, কলকাতা, ১৯৬২

৩০. দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, কলকাতা, ১৯৯১

৩১. নরেশচন্দ্র জানা, গাঁথাসপ্তশতী ও বৈষ্ণব পদাবলী, কলকাতা, ১৯৮৬

৩২. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮০

৩৩. নারায়ণ চৌধুরী, উত্তর শরৎ বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮০

৩৪. নারায়ণ চৌধুরী, মানিক সাহিত্য সমীক্ষা, কলকাতা, ১৯৮১

৩৫. নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৬৮

৩৬. নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা,কলকাতা, ১৯৮৭

৩৭. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলকাতা, ১৪০০

৩৮. নূরুল আমিন, কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, ঢাকা, ১৯৯২

৩৯. প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, বাঙালী,কলকাতা, ১৯৬৩,

৪০. প্রমথনাথ বিশী এবং বীথিকা চক্রবর্তী, বঙ্কিম সাহিত্য বিচার, কলকাতা, ১৩৭৭

৪১. বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খন্ড, কলকাতা, ১৩৬০

৪২. বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কলকাতা, ১৩৬৮

৪৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯১

৪৪. বিশ্বনাথ দে, মানিক বিচিত্রা, কলকাতা, ১৯৭১

৪৫. বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোট গল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, কলকাতা, ১৯৮৯

৪৬. বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, কলকাতা, ১৯৫৯

৪৭. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে এবং অন্ত্যজ সংস্কৃতি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ সাহিত্য ও রাজনীতিতে, ঢাকা, ১৯৮৭

৪৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, কলকাতা, ১৩৫০

৪৯. ভূইয়া ইকবাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা, ১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৫০. মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য ও শিল্প ভাবনা, কলকাতা, ১৯৮৬

৫১. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন-পাঠন, ঢাকা, ১৯৭৪

৫২. মহীতোষ বিশ্বাস, বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গ: আঞ্চলিক, কলকাতা, ১৯৮৪

৫৩. মানিক গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, আলোচনা ও গ্রন্থ পরিচয়, মন ও শিল্প : রথীন্দ্রনাথ রায়, কলকাতা, ১৩৭০

৫৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, কলকাতা, ১৯৭০

৫৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক গ্রন্থাবলী, কলকাতা, ১৯৭৫

৫৬. মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আনোয়ার পাশা, চর্যাগীতিকা, ঢাকা, ১৩৭৫

৫৭. মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আহমদ শরীফ, মধ্য যুগের বাংলা গীতি কবিতা, ঢাকা, ১৩৭৫

৫৮. মুহম্মদ ইদরিস আলী, বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ঢাকা, ১৯৮৫

৫৯. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, পদ্মাপুরাণ, ঢাকা, ১৯৯৩

৬০. মেজবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ঢাকা, ১৯৮২

৬১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ঢাকা, ১৯৬৮

৬২. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, ঢাকা, ১৯৯৭

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৌকাডুবি, ঢাকা, ১৯৮২

৬৪. রমেশচন্দ্র দত্ত, রমেশ রচনাবলী, কলকাতা, ১৩৬০

৬৫. রশীদ আল ফারুকী, বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, কলকাতা, ১৯৮৪,

৬৬. রামেশ্বর 'শ, আধুনিক বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮২

৬৭. শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন, সাহিত্য ও অন্যান্য, ঢাকা, ১৯৯৮

৬৮. শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, ঢাকা, ১৯৮৭

৬৯. শাহরিয়ার ইকবাল, হুমায়ুন কবির, ঢাকা, ১৯৮৮

৭০. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, কলকাতা, ১৯৪৬

৭১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৩৭২

৭২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, কলকাতা, ১৯৯৫

৭৩. সরোজ মোহন মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৭৭

৭৪. সালিম সাবরিন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্যে ব্রাত্যজীবন, ঢাকা, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. সুকামার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী, কলকাতা, ১৯৯৫

৭৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯৫

৭৭. সুকুমার সেন, সুলভ শরৎ সমগ্র, কলকাতা, ১৯৯৩

৭৮. সুবোধ চৌধুরী, সাহিত্য-শিল্প ও নন্দন তত্ত্ব, কলকাতা, ১৯৯৯

৭৯. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ : বাংলা কথা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯৭

৮০. সৈয়দ আকরম হোসেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, ঢাকা, ১৯৭৭

৮১. সৈয়দ মাজহারুল হক, বাংলাদেশের নদী, ঢাকা, ১৯৮৫

৮২. সৌরেন বিশ্বাস, বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০

৮৩. স্বপন দাসাধিকারী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৭৭

৮৪. হুমায়ুন কবির, নদী ও নারী, ঢাকা ও কলকাতা, ১৯৪৫

৮৫. হুমায়ুন কবির, বাঙলার কাব্য, ঢাকা, ১৯৯২,

প্রবন্ধ :

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প, উত্তরাধিকার, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৭

২. আবুল হাসনাত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প, বাংলা একাডেমী, ১ম সংখ্যা, ১৪০৭

৩. আ.স.ম. আশরাফ উদ্দিন, উপন্যাসে বাংলাদেশের নদী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৮

৪. এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৮৪

৫. গীতারাণী কর্মকার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে গণচেতনা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৩৮ বর্ষ, ১৪০১

৬. নাসিম মাহমুদ, মানিক ও তাঁর খণ্ড, বিখণ্ড মানুষ, উত্তরাধিকার, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৮

৭. মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, তিতাস একটি নদীর নাম : আঞ্চলিক জীবনের রূপায়ন, সাহিত্য পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী, ২০০১

৮. রফিকুল ইসলাম, হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অনাদৃত রত্ন, উত্তরাধিকার, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৯. শহীদুল্লাহ্ মৃধা, বাংলাদেশের প্রাচীনকালের নদনদী, ধান শালিকের দেশ, বাংলা একাডেমী, নদীসংখ্যা, ১৯৯৭

১০.শান্তনু কায়সার, তিতাস একটি নদীর নাম: রূপান্তরের উদাহরণ, প্রক্রিয়া ও প্রবণতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৮৩

১১. সরোষিত সরকার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্যে নিম্ন শ্রেণী চরিত্র, বাংলা একাডেমী, ৩,৪ সংখ্যা, ১৩৯৩

১২. সুবোধ ঘোষ, কথা সাহিত্যের বিষয় ও রীতি, শৈলী, ১ এপ্রিল, ২০০০

১৩. সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের স্বরূপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, নভেম্বর, ১৯৯৮

ইংরেজী বই:

1. Alamgir Kabir, Film in Bangladesh, Dhaka; 1979.
2. EM Forster, Aspects of the Novel, England, 1968
3. Humayun Kabir, The Bengali Novel, Calcutta, 1968
4. J.A. Cuddon, The Penguin Dictionery of Literary Terms and Literary Theory, London, 1992
5. James Henry; The Art of Novel, New York, 1962
6. Muhammad Shahidullah, Buddhist Mystic Songs, Dhaka, 1960
7. Percy Lubbock, The Craft of Fiction, London, 1968
8. Storm Jameson, The Novel is Contemporary Life, U.S.A, 1938
9. Suniti Kumar Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta, 1975